বঙ্গদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

চতুর্থ খণ্ড।

১২৮২ শাল।

কাঁটালপাড়া;

বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ৩, টাকা।

ডাকমাশুল সমেত ৩।৹ টাকা।

সূচীপত্র।

বঙ্গদর্শন

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

৪র্থ খণ্ড। বৈশাখ ১২৮২। [১ম সংখ্যা।

শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা।

প্রথম, শকুন্তলা ও মিরন্দা।

উভয়েই ঋষিকন্যা; প্রস্পেরো ও বিশ্বামিত্র উভয়েই রাজর্ষি। উভয়েই ঋষিকন্যা বলিয়া, অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্ত। মিরন্দা এরিয়লরক্ষিতা, শকুন্তলা অপ্সরোরক্ষিতা।

উভয়েই ঋষিপালিতা। দুইটিই বনলতা—দুইটিরই সৌন্দর্য্যে উদ্যানলতা পরাভূতা। শকুন্তলাকে দেখিয়া, রাজাবরোধবাসিনী গণের ম্লানীভূত রূপ লাবণ্য দুষ্মন্তের স্মরণ পথে আসিল;

শুদ্ধান্তদুর্লভমিদংবপু রাশ্রমবাসিনো
যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈ রুদ্যানলতা বন
লতাভিঃ॥

ফর্দিনন্দও মিরন্দাকে দেখিয়া সেইরূপ ভাবিলেন,

Full many a lady
I have eyed with best regard,—
and many a time
The harmony of their tongues
hath into bondage

Brought my too diligent ear: for several virtues
Have I liked several women;
———————but you, O you
So perfect and so peerless, are created
Of every creature's best!

উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা; সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই তাহাতে সিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া, সুন্দর সরল, বিশুদ্ধ রমণী-প্রকৃতি, বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়—কে আমায় ভাল বাসিবে, কে আমায় সুন্দর বলিবে, কেমন করিয়া পুরুষ জয় করিব, এই সকল কামনায়, নানা বিলাস বিভ্রমাদিতে, মেঘবিলুপ্ত চন্দ্রমাবৎ, তাহার মাধুর্য্য কালিমাপ্রাপ্ত হয়। শকুন্তলা এবং মিরন্দায় এই কালিমা নাই, কেননা তাঁহারা লোকালয়ে প্রতিপালিতা নহেন। শকুন্তলা, বল্কল পরিধান করিয়া, ক্ষুদ্র কলসী হস্তে, আলবালে জলসিঞ্চন করিয়া দিনপাত করিয়াছেন—সিঞ্চিত জলকণা-বিধৌত নব মল্লিকার মত নিজেও, শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক, প্রফুল্ল, দিগন্তসুগন্ধবিকীর্ণ কারিণী। তাঁহার ভগিনীস্নেহ, নব-মল্লিকার উপর; ভ্রাতৃস্নেহ সহকারের উপর; পুত্রস্নেহ মাতৃহীন হরিণশিশুর উপর; পতিগৃহ গমন কালে ইহাদিগের কাছে বিদায় হইতে গিয়া, শকুন্তলা অশ্রু-মুখী, কাতরা, বিবশা। শকুন্তলার কথোপকথন তাহাদিগের সঙ্গে; কোন বৃক্ষের সঙ্গে ব্যঙ্গ, কোন বৃক্ষকে আদর, কোন লতার পরিণয় সম্পাদন করিয়া শকুন্তলা সুখী। কিন্তু শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন; তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন, তাঁহার লজ্জা। লজ্জা তাঁহার চরিত্রে বড় প্রবলা; তিনি কথায় কথায় দুষ্মন্তের সম্মুখে লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন—লজ্জার অনুরোধে আপনার হৃদ্গত প্রণয় সখীদের সম্মুখেও সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন না। মিরন্দার সে রূপ নহে। মিরন্দা এত সরলা যে, তাহার লজ্জাও নাই। কোথা হইতে লজ্জা হইবে? তাহার জনক ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন দেখেই নাই। প্রথম ফর্দিনন্দকে দেখিয়া মিরন্দা বুঝিতেই পারিল না যে, কি এ?

Lord! how it looks about! Believe me Sir,
It carries a brave form;—but 'tis a spirit.

সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আছে, মিরন্দার তাহা কিছুই নাই। পিতার সম্মুখে ফর্দিনন্দের রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই—অন্যে যেমন কোন চিত্রাদির প্রশংসা করে, এ তেমনি প্রশংসা;

I might call him
A thing divine, for nothing natural
I ever saw so noble.

অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রীচরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরন্দায় অভাব নাই, এজন্য শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য্য অধিক। যখন পিতাকে

ফর্দিনন্দের পীড়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া, মিরন্দা বলিতেছে,

O dear father
Make not too rash a trial of him, for
He's gentle, and not fearful.

যখন পিতৃমুখে ফর্দিনন্দের রূপের নিন্দা শুনিয়া মিরন্দা বলিল,

My affections
Are then most humble; I have no ambitions
To see a goodlier man.

তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, মিরন্দা সংস্কারবিহীনা, কিন্তু মিরন্দা পরদুঃখকাতরা, মিরন্দা স্নেহশালিনী; মিরন্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা, তাহা আছে।

যখন রাজপুত্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাঁহার হৃদয় প্রণয়সংস্পর্শশূন্য ছিল; কেননা শৈশবের পর পিতা ও কালিবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তিনি কখন দেখেন নাই। শকুন্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শূন্যহৃদয়, ঋষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই। উভয়েই তপোবন মধ্যে—এক স্থানে কণ্বের তপোবন—অপর স্থানে প্রস্পেরোর তপোবন,—অনুরূপ নায়ককে দেখিবামাত্র প্রণয়শালিনী হইলেন। কিন্তু কবিদিগের আশ্চর্য্য কৌশল দেখ; তাঁহারা পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, অথচ একজনে দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যে রূপ হইত, ঠিক সেই রূপ হইয়াছে। যদি একজনে দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি শকুন্তলার প্রণয় লক্ষণে ও মিরন্দার প্রণয়লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন? তিনি বুঝিতেন যে, শকুন্তলা, সমাজপ্রদত্ত সংস্কারসম্পন্না, লজ্জাশীলা, অতএব, তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে; কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি তাহা জানেনা, অতএব তাহার প্রণয় লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। পৃথক্ পৃথক্ কবিপ্রণীত চিত্রদ্বয়ে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। দুষ্মন্তকে দেখিয়াই শকুন্তলা প্রণয়াসক্তা; কিন্তু দুষ্মন্তের কথা দূরে থাক্, সখীদ্বয় যত দিন না তাঁহাকে ক্লিষ্টা দেখিয়া, সকল কথা অনুভবে বুঝিয়া, পীড়াপীড়ি করিয়া কথা বাহির করিয়া লইল, ততদিন তাহাদের সম্মুখেও শকুন্তলা এই নূতন বিকারের একটি কথাও বলেন নাই, কেবল লক্ষণেই সে ভাব ব্যক্ত—

স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোপি নয়নে যৎ প্রেরয়ন্ত্যা তয়া,
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।
মাগা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি তৎ সাসূয়মুক্তা সখী,
সর্ব্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো! কামঃ স্বতাং পশ্যতি॥

শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ছাড়িয়া যাইতে গেলে গাছে তাঁহার বল্কল বাঁধিয়া যায়,

পদে কুশাঙ্কুর বিঁধে। কিন্তু মিরন্দার সে সকলের প্রয়োজন নাই—মিরন্দা সে সকল জানে না; প্রথম সন্দর্শন কালে মিরন্দা অসঙ্কুচিত চিত্তে পিতৃসমক্ষে আপন প্রণয় ব্যক্ত করিলেন,

This
Is the third man I e'er saw; the first
That e'er I sighed for.

এবং পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে উদ্যত দেখিয়া, ফর্দিনন্দকে আপনার প্রিয়জন বলিয়া, পিতাব দয়াব উদ্রেকেব যত্ন করিলেন। প্রথম অবসবেই ফর্দিনন্দকে আত্মসমর্পণ কবিলেন।

দুষ্মন্তেব সঙ্গে শকুন্তলাব প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ, এক প্রকার লুকাচুবি খেলা। "সখি, রাজাকে ধরিয়া রাখিস্ কেন?"—"তবে, আমি উঠিয়া যাই"—"আমি এই গাছেব আড়ালে লুকাই"—শকুন্তলার এ সকল "বাহানা" আছে; মিবন্দার সে সকল নাই। এ সকল লজ্জাশীলা কুলবালাব বিহিত, কিন্তু মিরন্দা লজ্জাশীলা কুলবালা নহে---মিরন্দা বনের পাখী—প্রভাতারুণোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না; বৃক্ষের ফুল, সন্ধ্যার বাতাস পাইলে মুখ ফুটিয়া, ফুটিয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না। নায়ককে পাইয়াই, মিরন্দার বলিতে লজ্জা করে না যে—

By my modesty,
The jewel in my dower—I would not wish
Any companion in the world but you;
Nor can imagination form a shape
Besides yourself, to like of.

পুনশ্চঃ

Hence bashful cunning!
—And prompt me, plain and holy innocence.
I am your wife, if you will marry me.
—If not, I die your maid; to be your fellow
You may deny me, but I will be your servant
Whether you will or no.

আমাদিগেব ইচ্ছা ছিল, যে মিরন্দা ফর্দিনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ, সমুদায় উদ্ধৃত কবি, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। সকলেরই ঘরে সেক্ষপীয়র আছে, সকলেই মূলগ্রন্থ খুলিয়া পড়িতে পাবিবেন। দেখিবেন উদ্যানমধ্যে বোমিও জুলিয়েটের যে প্রণয়-সম্ভাষণ জগতে বিখ্যাত, এবং পূর্ব্বতন কালেজের ছাত্র মাত্রের কণ্ঠস্থ, ইহা কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যূনকল্প নহে। যে ভাবে জুলিয়েট বলিয়াছিলেন, যে "আমার দান সাগরতুল্য অসীম, আমার ভালবাসা সেই সাগরতুল্য গভীর," মিরন্দাও এই স্থলে সেই মহান্ চিত্তভাবে পরিপ্লুত। ইহার অনুরূপ অবস্থায়, লতামণ্ডপতলে, দুষ্মন্ত শকুন্তলায় যে আলাপ,—যে আলাপে শকুন্তলা চিরবদ্ধ হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত সূর্য্য সমীপে

ফুটাইয়া হাসিল—সে আলাপে তত গৌরব নাই—মানবচরিত্রের কূলপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রঘাতী সেরূপ টল টল চঞ্চল বীচিমালা তাহার হৃদয়মধ্যে লক্ষিত হয় না। যাহা বলিয়াছি, তাই—কেবল, ছি ছি, কেবল যাই যাই, কেবল লুকাচুরি—একটু একটু চাতুরী আছে—যথা "অদ্ধপধে স্থমরিঅ এদস্স হথত্তংসিণো মিণাল বলঅস্স কদে পড়িণিবুত্তহ্মি।" ইত্যাদি। একটু অগ্রগামিণীত্ব আছে, যথা দুষ্মন্তের মুখে

"নম্ন কমলস্য মধুকরঃ সন্তুষ্যতি গন্ধমাত্রেণ।" এই কথা শুনিয়া শকুন্তলার জিজ্ঞাসা, "অসন্তোসে উণ কিং করেদি?" —এই সকল ছাড়া আর বড় কিছুই নাই। ইহা কবির দোষ নহে—বরং কবির গুণ। দুষ্মন্তের চরিত্র গৌরবে ক্ষুদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ফর্দ্দিনন্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য, অকৃতকীর্ত্তি—অপ্রথিতযশাঃ; কিন্তু সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসখ দুষ্মন্তের কাছে শকুন্তলা কে? দুষ্মন্ত মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকুন্তলা কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—সে ভাল করিয়া মুখ তুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। এ প্রণয় সম্ভাষণ প্রণয় সম্ভাষণ নহে—রাজক্রীড়া, পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ করিয়া প্রেমকরা রূপ খেলা খেলিতে বসিয়াছেন; মত্তমাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিনীকোরককে শুণ্ডে তুলিয়া, বনক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী তাতে ফুটিবে কি?

যিনি এ কথাগুলি স্মরণ না রাখিবেন তিনি শকুন্তলা' চরিত্র বুঝিতে পারিবেন না; যে জলনিষেকে মিরন্দা ও জুলিয়েট ফুটিল, সে জলনিষেকে শকুন্তলা ফুটিল না; প্রণয়াসক্তা শকুন্তলায় বালিকার চাঞ্চল্য বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দেখিলাম; কিন্তু রমনীর গাম্ভীর্য্য, রমণীর স্নেহ কই? ইহার কারণ কেহ কেহ বলিবেন, লোকাচারের ভিন্নতা; দেশভেদ। বস্তুতঃ তাহা নহে। দেশী কুলবধূ বলিয়া শকুন্তলা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল,—আর মিরন্দা বা জুলিয়েট বেহায়া বিলাতী মেয়ে বলিয়া মনের গ্রন্থি খুলিয়া দিল, এমত নহে। ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝেন না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র; মনুষ্য হৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহৃদয়ই থাকে। বরং বলিতে গেলে—তিন জনের মধ্যে শকুন্তলাকেই বেহায়া বলিতে হয় "অসন্তোসে উণ কিং করেদি?" তাহার প্রমাণ। যে শকুন্তলা, ইহার কয় মাস পরে, পৌরবের সভাতলে দাঁড়াইয়া দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল "অনার্য্য! আপন হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখ?"—সে শকুন্তলা যে, লতামণ্ডপে বালিকাই রহিল, তাহার কারণ কুলকন্যাসুলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ—দুষ্মন্তের চরিত্রের বিস্তার। যখন শকুন্তলা সভাতলে পরিত্যক্তা, তখন শকুন্তলা

পত্নী, রাজমহিষী, মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা, সুতরাং তখন শকুন্তলা রমণী; এখানে তপোবনে,—তপস্বিকন্যা, রাজপ্রসাদের অনুচিত অভিলাষিণী,—এখানে শকুন্তলা কে? করিশুণ্ডে পদ্মমাত্র। শকুন্তলার কবি যে টেম্পেষ্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এস্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম।

শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনা করা গেল—কিন্তু ইহাও দেখান গিয়াছে, যে শকুন্তলা ঠিক্ মিরন্দা নহে। কিন্তু মিরন্দার সহিত তুলনা করিলে শকুন্তলা চরিত্রের এক ভাগ বুঝা যায়। শকুন্তলা চরিত্রের আর একভাগ বুঝিতে বাঁকি আছে। দেসদিমোনার সঙ্গে তুলনা করিয়া সেভাগ বুঝাইব ইচ্ছা আছে।

শকুন্তলা এবং দেসদিমোনা, দুই জনে পরস্পর তুলনীয়া, এবং অতুলনীয়া। তুলনীয়া কেননা উভয়েই গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। গোতমী শকুন্তলা সম্বন্ধে দুষ্মন্তকে যাহা বলিয়াছিলেন, ওথেলোকে লক্ষ্য করিয়া দেসদিমোনা সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে—

ণাবেক্খিদো গুরুঅণো ইমিএ ণ তুএবি
পুচ্ছিদো বন্ধু।
একক্কং এব্ব চরিএ কিং ভণদু একং একস্স॥

তুলনীয়া, কেননা উভয়েই বীরপুরুষ দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন—উভয়েরই "দুরারোহিণী আশালতা" মহামহীরুহ অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বীরমন্ত্রের যে মোহ, তাহা দেসদিমোনায় যাদৃশ পরিস্ফুট, শকুন্তলায় তাদৃশ নহে। ওথেলো কৃষ্ণকায়, সুতরাং সুপুরুষ বলিয়া ইতালীয় বালার কাছে বিচার্য্য নহে, কিন্তু রূপের মোহ হইতে বীর্য্যের মোহ নারীহৃদয়ের উপর প্রগাঢ়তর। যে মহাকবি, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকে অর্জ্জুনে অধিকতম অনুরক্তা করিয়া, তাঁহার স্বশরীরে স্বর্গারোহণ পথ রোধ করিয়াছিলেন তিনি এতত্ত্ব জানিতেন, এবং যিনি দেসদিমোনার সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি ইহার গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

তুলনীয়া, কেননা দুই নায়িকারই "দুরারোহিণী আশালতা" পরিশেষে ভগ্না হইয়াছিল—উভয়েই স্বামীকর্ত্তৃক বিসর্জ্জিতা হইয়াছিলেন। সংসার অনাদর, অত্যাচার পরিপূর্ণ। কিন্তু ইহাই অনেক সময়ে ঘটে যে, সংসারে যে আদরের যোগ্য, সেই বিশেষ প্রকারে অনাদর অত্যাচারে প্রপীড়িতা হয়। ইহা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত অশুভ নহে, কেননা মনুষ্যপ্রকৃতিতে যেসকল উচ্চাশয় মনোবৃত্তি আছে, এই সকল অবস্থাতেই তাহা সম্যক্ প্রকারে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহা মনুষ্যলোকে সুশিক্ষার বীজ—কাব্যের প্রধান উপকরণ। দেসদিমোনার অদৃষ্টদোষে বা গুণে সে সকল মনোবৃত্তির স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবার অবস্থা তাহার ঘটিয়াছিল। শকুন্তলারও তাহাই ঘটিয়াছিল। অতএব দুইটি চরিত্র যে

পরস্পর তুলনীয়া হইবে, ইহার সকল আয়োজন আছে।

এবং দুইজনে তুলনীয়া, কেননা উভয়েই পরম স্নেহশালিনী—উভয়েই সতী। স্নেহশালিনী, এবং সতী, ত যে সে। আজ কাল রাম, শ্যাম, নিধু, বিধু, যাদু, মাধু যে সকল নাটক উপন্যাস নবন্যাস প্রেতন্যাস লিখিতেছেন, তাহার নায়িকা মাত্রেই স্নেহশালিনী সতী। কিন্তু এই সকল সতীদিগের কাছে একটা পোষা বিড়াল আসিলে, তাঁহারা স্বামীকে ভুলিয়া যান, আর পতিচিন্তামগ্না শকুন্তলা দুর্ব্বাসার ভয়ঙ্কর "অয়মহং ভোঃ" শুনিতে পান নাই। সকলেই সতী, কিন্তু জগৎসংসারে অসতী নাই বলিয়া, স্ত্রীলোকে অসতী হইতেই পারে না বলিয়া, দেসদিমোনার যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মর্ম্মের ভিতর কে প্রবেশ করিবে? যদি স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তি; প্রহারে, অত্যাচারে, বিসর্জ্জনে, কলঙ্কেও যে ভক্তি অবিচলিত, তাহাই যদি সতীত্ব হয়, তবে শকুন্তলা অপেক্ষা দেসদিমোনা গরীয়সী। স্বামী-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে শকুন্তলা দলিতফণা সর্পের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া স্বামীকে ভৎসনা করিয়াছিলেন। যখন রাজা শকুন্তলাকে অশিক্ষা সত্ত্বেও চাতুর্য্যপটু বলিয়া উপহাস করিলেন, তখন শকুন্তলা ক্রোধে, দম্ভে, পূর্ব্বের বিনীত, লজ্জিত, দুঃখিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "অনার্য্য, আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ?" যখন তদুত্তরে রাজা, রাজার মত, বলিলেন, "ভদ্রে! দুষ্মন্তের চরিত্র সবাই জানে," তখন শকুন্তলা ঘোর ব্যঙ্গে বলিলেন,

তুম্হে জ্জেব পমাণং জাণধ ধম্মথিদিঞ্চ
লোঅস্স।
লজ্জাবিণিজ্জিদাও জাণন্তি ণ কিম্পি
মহিলাও॥

এ রাগ, এ অভিমান, এ ব্যঙ্গ দেসদিমোনায় নাই। যখন ওথেলো দেসদিমোনাকে সর্ব্বসমক্ষে প্রহার করিয়া দূরীকৃত করিলেন, তখন দেসদিমোনা কেবল বলিলেন, "আমি দাঁড়াইয়া আপনাকে আর বিরক্ত করিব না।" বলিয়া যাইতেছিলেন, আবার ডাকিতেই "প্রভু!" বলিয়া নিকটে আসিলেন। যখন ওথেলো অকৃতাপরাধে তাহাকে কুলটা বলিয়া অপমানের একশেষ করিয়াছিলেন, তখনও দেসদিমোনা "আমি নিরপরাধিনী, ঈশ্বর জানেন।" ঈদৃশ উক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। তাহার পরেও, পতিস্নেহে বঞ্চিত হইয়া, পৃথিবী শূন্য দেখিয়া, ইয়াগোকে ডাকিয়া বলিয়াছেন

Alas, Iago!
What shall I do to win my lord again?
Good friend, go to him; for, by this light of heaven
I know not how I lost him; here I kneel;—

ইত্যাদি। যখন ওথেলো ভীষণ রাক্ষসের ন্যায় নিশীথ শয্যাশায়িনী সুপ্তা

সুন্দরীর সম্মুখে, "বধ করিব!" বলিয়া দাঁড়াইলেন, তখনও রাগ নাই—অভিমান নাই—অবিনয় বা অস্নেহ নাই—দেস্‌দিমোনা কেবল বলিলেন, "তবে, ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন্!" যখন দেস্‌দিমোনা, মরণ ভয়ে নিতান্ত ভীতা হইয়া, এক দিনের জন্য,এক রাত্রির জন্য, এক মুহূর্ত্ত জন্য জীবন ভিক্ষা চাহিলেন, মূঢ় তাহাও শুনিল না, তখনও রাগ নাই, অভিমান নাই, অবিনয় নাই, অস্নেহ নাই। মৃত্যুকালেও, যখন ইমিলিয়া আসিয়া তাঁহাকে মুমূর্ষু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার্য্য কে করিল?" তখনও দেসদিমোনা বলিলেন, "কেহ না, আমি নিজে। চলিলাম! আমার প্রভুকে আমার প্রণাম জানাইও। আমি চলিলাম!" তখনও দেসদিমোনা লোকের কাছে প্রকাশ করিল না যে, আমার স্বামী আমাকে বিনাপরাধে বধ করিয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম যে শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুলনীয়াএবং তুলনীয়াও নহে। তুলনীয়া নহে, কেন না ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে তুলনা হয় না। সেক্ষপীয়রের এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকানন তুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুরব, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর, তাহাই এই নন্দনকাননে অপর্য্যাপ্ত, স্তূপাকৃত, রাশি রাশি, অপরিমেয়। আর যাহা গভীর, দুস্তর, চঞ্চল, ভীমনাদী, তাহাই এই সাগরে। সাগরবৎ সেক্ষপীয়রের এই অনুপম নাটক, হৃদয়োদ্ধত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ; দুরন্ত রাগ দ্বেষ ঈর্ষ্যাদি ব্যাত্যায় সন্তাড়িত; ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, বিলোল ঊর্ম্মিলীলা,—আবার ইহার মধুরনীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণ প্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার রত্নরাজি, ইহার মৃদু গীতি—সাহিত্যসংসারে দুর্লভ।

তাই বলি, দেসদিমোনা শকুন্তলায় তুলনীয়া নহে। ভিন্ন জাতীয়ে ভিন্ন জাতীয়ে তুলনীয়া নহে। ভিন্ন জাতীয় কেন বলিতেছি, তাহার কারণ আছে।

ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু অধিক বুঝেন। তাঁহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে—যাহা দৃশ্য কাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে। নাটক নহে বলিয়া যে এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে এমত নহে—তন্মধ্যে অনেক গুলি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, যথা গেটে প্রণীত ফষ্ট এবং বাইরণ প্রণীত মানফ্রেড্—কিন্তু উৎকৃষ্ট হউক নিকৃষ্ট হউক—ঐ সকল কাব্য,নাটক নহে। সেক্ষপীয়রের টেম্পেষ্ট এবং কালিদাসকৃত শকুন্তলা,সেই শ্রেণীর কাব্য, নাটকাকারে অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান কাব্য; কিন্তু নাটক নহে। নাটক নহে, বলিলে এতদুভয়ের নিন্দা হইল না, কেন

না এরূপ উপাখ্যান কাব্য পৃথিবীতে অতি বিরল—অতুল্য বলিলে হয়। আমরা ভারতবর্ষে উভয়কেই নাটক বলিতে পারি, কেন না ভারতীয় আলঙ্কারিক দিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, তাহা সকলই এই দুই কাব্যে আছে। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ,এই দুই নাটকে তাহা নাই। ওথেলো নাটকে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। ওথেলো নাটক—শকুন্তলা এ হিসাবে উপাখ্যান কাব্য। ইহার ফল এই ঘটিয়াছে যে দেস্‌দিমোনার চরিত্র যত পরিস্ফুট হইয়াছে—মিরন্দা বা শকুন্তলা তেমন হয় নাই। দেস্‌দিমোনা জীবন্ত, শকুন্তলা ও মিরন্দা ধ্যানপ্রাপ্য। দেস্‌দিমোনার বাক্যেই তাহার কাতর, বিকৃত কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাই, চক্ষের জল ফোঁটা ফোঁটা গণ্ড বহিয়া বক্ষে পড়িতেছে দেখিতে পাই—ভূলগ্নজানু সুন্দরীর স্পন্দিততার লোচনের ঊর্দ্ধ দৃষ্টি আমাদিগের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করে। শকুন্তলার আলোহিত চক্ষুরাদি আমরা দুষ্মন্তের মুখে না শুনিলে বুঝিতে পারি না —যথা

ন তির্য্যগবলোকিতং, ভবতি চক্ষুরালোহিতং,
বচোপি পরুষাক্ষরং নচ পদেষু সংগচ্ছতে।
হিমার্ত্তইব বেপতে সকলইব বিম্বাধরঃ
প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদংগতে।

শকুন্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে পাই না; সে সকল দেস্‌দিমোনায় অত্যন্ত পরিস্ফুট। শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র; দেস্‌দিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীব প্রায় গঠন। দেস্‌দিমোনার হৃদয় আমাদিগের সম্মুখে, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত; শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত।

সুতরাং দেস্‌দিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জ্বল বলিয়া দেস্‌দিমোনার কাছে শকুন্তলা দাঁড়াইতে পারে না। নতুবা, ভিতরে দুই এক। শকুন্তলা অর্দ্ধেক মিরন্দা, অর্দ্ধেক দেস্‌দিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার অনুরূপিণী —অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিণী।

সমালোচন সমাপনান্তে আমরা যদি একবার বঙ্গদর্শনের পূর্ব্বতন বন্ধু ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয়কে স্মরণ করি, ভরসা করি পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন। প্রাগুক্ত আচার্য্যের মত এই যে, এই সাদৃশ্য দ্বারা প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, কালিদাস সেক্ষপীয়রের পরবর্ত্তী; এবং ইংরেজিতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এবং মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনার অনুকরণ করিয়াই শকুন্তলা প্রণয়ন করিয়াছেন।

কমলাকান্তের দপ্তর।

১৪ সংখ্যা।

মশক।

আ বাম! বড় বিরক্তই করিল যে! এই ঘরের কোণের মশা গুলা, আর এই সংসারের কোণের মশা গুলা। আজি কোথা মনে করিলাম, যে একটু মাত্রা চড়াইয়া একবার Freedom এবং Free-will (অদৃষ্ট ও পৌরুষের) তর্কটা মীমাংসা করিব, না কোথা হইতে দুই কাহন ক্ষুদ্র পতঙ্গ আসিয়া শরীরের সমস্ত রক্ত শোষণ করিয়া ডবল মাত্রার নেশাটা একবারে নির্মাত্র করিল!

সংসারের ক্ষুদ্র মশক গুলা আরও বিরক্তকর। কোন একটি বিষয় কার্য্যের একটু সূত্রপাত করিয়া কেহ বসিল যদি, অমনি জঙ্গল কর্দ্দম অন্ধকার হইতে পালে পালে পতঙ্গ উড্ডীন হইতে আরম্ভ হইল। মৃদু গুন্ গুন্, মৃদু গুন গুন্, ক্রমে দংশন ও শোণিতশোষণ।

পুঁথিতে পড়িলাম, যে অতি অপরিষ্কার জল হইতে মশার উৎপত্তি হয়। বারাণসীস্থ জ্ঞানবাপীর অপূর্ব্ব পয়োরাশির আস্বাদ ও আঘ্রাণের কথা তখন আমার স্মরণ হইল। হিন্দুধর্ম্মের কল্যাণে ও আমার পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে, সেই উদক এক গণ্ডূষ আমি উদরস্থ করিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণ হইল। মনে হইল সেই জ্ঞানবাপীর এক গণ্ডূষ জল আনিয়া এই জীব তত্ত্বের রহস্য পরীক্ষা করিব। কিন্তু জ্ঞানবাপী কাশীধামে,—আর আমি অজ্ঞান পাপী নশীধামে। সুতরাং সে জল আমার অতীব দুষ্প্রাপ্য। তখন মনে হইল, যে বোধ হয় কালা পাহাড়ের ভয়ে বিশ্বেশ্বর সেই পথে পলায়ন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার জল ঐরূপ সমল ও দুর্গন্ধ হইয়াছে। মানবই হউন আর দেবতাই হউন, পলায়নের পথে সৌরভ ছুটিবে কেন? সেই পথ অবশ্য আলোকহীন হইবে, তাহার বায়ু দূষিত হইবে, গন্ধ দুর্গন্ধ হইবে, ও জল পঙ্কিল হইবে। তবে আমার স্বদেশে এমন জল বিস্তর পাইব; যে পথে নবদ্বীপ হইতে লাক্ষণেয় পলায়ন করেন তাহাই আমার বঙ্গের জ্ঞানবাপী, সেই জল হইলেই আমার জীবতত্ত্বের পরীক্ষা হইবে। কিন্তু তাহার ত চিহ্ন দেখি না। সেই পথ থাকিলে আমি সেইখানে একটী মেলা বসাইতাম। নব্য বঙ্গ সন্তানগণকে একবার সেই ধূলা মাখাইয়া দিয়া বলিতাম, "যাও বাছা, শ্রীক্ষেত্রে যাও, যে পথে তোমার ধার্ম্মিক রাজা গমন করিয়াছেন, সেই পথে যাও।" তা—তাহারও কোন চিহ্ন নাই! বিশ্বেশ্বরের পথের জল আনিতে আমি যাইতে পারিলাম না, বঙ্গেশ্বরের পথের সন্ধান নাই। তবে এখন প্রসন্নর গোশালায় আশ্রয় লইতে হইল। স্বয়ং কমলাকান্ত অনেক বার সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছেন। সেই জলেও কার্য্য হইতে

পারে। অমনি আমার চিরেতার শিশিটি ধুইয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম। প্রসন্ন আসিলে বলিলাম, 'প্রসন্ন! তুমি সে দিন তোমার সেই পাড়া বেড়ান পঞ্চরসের সেই যে এক গণ্ডূষ দিয়াছিলে, মনেআছে ত?' প্রসন্ন যেনএকটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, 'ঠাকুর মহাশয় আমি ত আপনাকে বলিয়াছিলাম, যে আমার সে দুধ আপনাদের ঠাকুর দেবতাদের জন্য নহে। আপনার কি মন হইল, কিছুতেই ছাড়িলেন না তাহাতেই সে দুধ আপনাকে একটু দিয়াছিলাম।' প্রসন্নকে অপ্রতিভ হইতে দেখিয়া আমি বলিলাম, "আমি সেজন্য তোমাকে অনুযোগ করিতেছি না; তুমি যে জল দিয়া সেই পঞ্চরস প্রস্তুত কর, তাহা আমাকে এই শিশিটির এক শিশি দিতে হইবে।" প্রসন্ন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ঠাকুর মহাশয়! 'আমরা কি দুধে জল দি?' আমি বলিলাম 'তা যাই হৌক সেই জল একটু দিতে হইবে।' আমি শুনিয়াছিলাম, (বোধ হয় দেখিয়াও থাকিব) প্রসন্নর গোশালার নিভৃত কোণে মৃৎপাত্রে জল থাকিত, যাহারা দূর জ্ঞাতি-কুটুম্বগণকে দুধে বড়ি খাওয়াইবার জন্য সুলভ মূল্যে নির্জল দুগ্ধ লইত, প্রসন্ন তাহাদিগকে সেই গোশালার বাহিরে দাঁড় করাইয়া গাভী দোহন করিত। গোশালায় কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিত না। তাহা হইলে কাঁচা গাই চমকিয়া উঠে। যাহা হউক প্রসন্ন আমাকে সেই অমৃত কুণ্ডের জল প্রদান করিয়াছিল। শিশিটি আমি যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলাম। সূত্রবৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট তাহার মধ্যে অনবরত উণ্টিয়া পাণ্টিয়া খেলা করিতে লাগিল। তল হইতে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, ঊর্দ্ধ হইতে তলে নামিতেছে; উঠিবার সময় যেমন ক্রীড়া, নামিবার সময়ও তেমনিই ক্রীড়া। ক্ষুদ্র জীবের উত্থান পতন জ্ঞান নাই। সূক্ষ্ম সূত্র কীট উঠিতে পড়িতে লাগিল। আমি বসিয়া থাকি।

ক্রমে সেই সূত্রগুলি স্ফীত হইতে লাগিল। একদিক কিছু স্থূলতর হইল। তখন সেই দিক মুখ বলিলে বলা যায়। পূর্ব্বে সূত্রকীটগুলি নিমেষ কাল স্থির থাকিতে পারে নাই; এখন, বয়ঃপ্রাপ্তে কথঞ্চিৎ স্থির হইল, আর জলের উপরি মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া বেড়ায়। দুই একদিন পরে একটি মৃতবৎ ভাসিয়া রহিল; কচিৎ কিঞ্চিৎ চেতনা যুক্ত বোধ হয়; কখনও বা একেবারে জড়বৎ। আমার শয্যা হইতে উঠিতে কিছু বিলম্ব হয়, পর দিন উঠিয়া দেখি, একটি মশক শিশি মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতেছে, আর জলোপরি একটি ক্ষুদ্র কীটনির্ম্মোক ভাসিতেছে। একটি, দুটি, তিন চারিটি করিয়া ক্রমে আমার এক শিশি মশা হইল। আমার বিজ্ঞানপরীক্ষার সার্থকতা অবলোকনে আমি পরিতুষ্ট হইলাম। একদিন নশীবাবুর গৃহিণীর স্বহস্তপ্রস্তুতীকৃত পায়স পিষ্টক সেবনে চিত্তের কিছু প্রশস্ততা লাভ করিলাম। সুন্দর উদর পূর্ত্তি না হইলে মানবের উদারতা হয় না। সেদিন সন্ধ্যার পর উদার মনে একে একে ছিপি খুলিয়া সেই পতঙ্গগুলিকে বিপুল বিশ্বে বিচরণ করিতে দিলাম। শিশিটি সরকারদের ছাদের উপর ফেলিয়া দিলাম, চূর্ণীকৃত হইয়াগেল। জীবরহস্যোদ্ভেদ হইল। এই রূপে জন্ম যে জীবের, সেই

জীব আমাকে আজি বিরক্ত করিল, আমার নেশা দূর করিয়া আমাকে লেখকের আসনে বসাইল। একেই বলে মানব অহঙ্কার। But man is the Lord of Creation.—but না—yet!*

বাস্তবিক মনুষ্যের অই অহঙ্কারের কথাটি মনে হইলে এত মশার কামড়েও হাস্য পায়। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস স্বকলমে কলমবন্দী করিলেন, যে, "ব্যাসস্তু নারায়ণঃ স্বয়ং।" "ইংলণ্ডের অন্ধকবি লিখিয়াছেন, যে,—

"গদ্যে পদ্যে অচেষ্টিত সাধন সাধিব।"

আমাদের বাঙ্গালির সাহিত্য বিপাক বিপত্তে মধুসূদন শ্রীমধুসূদন লিখিয়াছেন, যে,

————————রচিব মধুচক্র
গৌড়জনগণ যাহে আনন্দে করিবে
পান, সুধা নিরবধি;——

মানবাবতার মহাপ্রভু হর্শেল লিখিলেন, যে, 'মানব—সৃষ্টির মহাপ্রভু।' আমি কমলাকান্তও মধ্যে মধ্যে উত্তম পুরুষের গৌরব গান করিয়া থাকি! এ সকল কি হাস্যকর নহে? সত্যসত্যই কি মনুষ্য সৃষ্টিকাণ্ডে একেশ্বর প্রভু? এই যে, ভারতবর্ষে বৎসর বৎসর সহস্র সহস্র প্রাণী আশীবিষ বিষে তাড়িত গতিতে শমনসদনে রপ্তানি হইতেছে, yet man is the Lord of Creation! এই যে কোথাও একটি ক্ষিপ্ত শৃগালের দৌরাত্ম্য হইলে অমনি শত শত ভগ্ন পাইক সাপ্তাহিক পত্রে পোলিশের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকটিত হইতে থাকে,—yet man is the Lord of Creation! এই যে, বীড়ন সাহেবের বেলবিডিয়র বাসে চিত্র প্রদর্শনের প্রথম দিনে, একটি শার্দ্দূলের পিঞ্জরদ্বার অবদ্ধ ছিল বলিয়া শত শত শ্বেত পুরুষ উর্দ্ধশ্বাসে পলায়নপর হইলেন, বিবিদের ত কথাই নাই! yet man is the Lord of Creation! যে মানব বাতবৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য অনবরত গুহা রচনা করিতেছে, কীট পতঙ্গ বিনাশের জন্য দিবারাত্রি যন্ত্র সৃষ্টি করিতেছে, তাহার এরূপ আত্মগরিমা ভাল দেখায় না। সাগরের জলবুদ্‌বুদ্ সাগর শাসক নাম ধারণ করিলে ভাল দেখায় না। ভীষণ মারীভয়ে, গ্রাম, নগর, দেশ অঞ্চল নির্মানব হইতেছে, তবু বলিবে মানব সৃষ্টির একেশ্বর! ব্যোম দেবের নিশ্বাস প্রশ্বাসে চীন হইতে পীরু উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে, তবু বলিবে মানব বিশ্বসংসারের একেশ্বর! দেবী ধরণীর হৃদয়াবর্ত্তভরে, উদ্গীরিত বহ্নি রাশি জীব কাকল পরিপূরিত জনপদ জলন্ত কবরে প্রোথিত করিতেছে, তবু কি বলিতে হইবে—যে মানব বিশ্বরাজ্যের রাজা! আর এই মৃদু মধুর তারস্বরানুকরণ কারী অণুপতঙ্গে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে,—তথাপি আমাকে বলিতে হইবে যে আমি ও আমার সজাতিগণ প্রকৃত ধরাধিপ! এ অনৃত বাদে কোন প্রয়োজন নাই। আমি সর্ব্বেশ্বর বলিলেই যদি এই দুর্বৃত্তগণ দূরীভূত

* শুনিয়াছি এই ইংরেজি কথা কয়টিতে ব্যাকরণের তর্ক আছে। দুইটি ইংরেজি অব্যয়ের তর্ক আছে। অব্যয় লইয়া এত বাক্যব্যয় করিতে কমলাকান্তের মত নব্যয় পারে, ভব্যয় পারে না। বাতুল জ্ঞানবাপীর জল আনিয়া মশা করিতে যায়। সেই জল স্পর্শ করিলেই যে জীব মুক্ত হয় তাহা জানে না। আর নবদ্বীপের শ্রীমহাপ্রভুর মেলায় যে কিরূপ বিদ্রূপ করিয়াছে, তাহা ত বুঝিতেই পারিলাম না।

শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীশ।

হইত, তাহা হইলে আমি স্বয়ং মশাবিষয়িনী গাথা প্রকটন না করিয়া, কমলাকান্তের স্তব রচনা করিতাম। কিন্তু এই দুর্বৃত্তগণ হর্শেলের ন্যায়শাস্ত্রের বলবত্তা বুঝিতে পারে না। অতএব আজি আমি বাঙ্গালির ন্যায়শাস্ত্রের সহায় গ্রহণ করিয়া ইহাদিগকে দূরীভূত করিব। বাঙ্গালির ন্যায়শাস্ত্রের অর্থ 'গালাগালি।' বড় ছোটকে গালি দিবে, ছোট বড়কে গালি দিবে, সমান সমানে গালাগালি চলিবে, ইহার নাম Argument বা যুক্তি। আমি এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া আজি কলির মশামেধ যজ্ঞে এই পূর্ণাহুতি প্রদান করিলাম।

রে কীটপ্রসূত ক্ষুদ্র পতঙ্গ! অভিমানী মানবের তুই চির শত্রু; কমলাকান্তকে আর জ্বালাতন করিস্ না। কমলাকান্ত সন্ন্যাসী, অভিমানের সঙ্গে ইহার চিরশত্রুতা। দূর হ রে! পতঙ্গ মশক। আর দূর হ রে! মানব মশক।

ক্ষুদ্রকীট তোর গুণ্ গুণ্ মধুর সমালোচন, তোর অকারণ পৃষ্ঠ দংশন, নীরবে শোণিতশোষণ—আর আমার সহ্য হয় না। তামস-প্রিয়! তুই অদ্য হইতে আর আলোকে দেখা দিস্ না। কোণ প্রিয়! সমাজে যেন তোকে আর দেখিতে না হয়। সন্ধ্যামোদি! দিনদেবের রাজত্বকালে তুই আর কদাপি নির্গত হইস্ না। কর্দ্দমে, জঙ্গলে, বনে, পূতিগন্ধে, পয়োনালীতে তোর জন্ম—অন্ধকারে, নিভৃত লূতানিকেতনে, শয়নতলে, তোর আবাস—পৃষ্ঠ দংশনে আর শোণিত শোষণে তোর আমোদ—পক্ষ হেলনে, পক্ষকম্পনে মৃদু গুণ্ গুণ্ রব, তোর তোষামোদ গান। কিন্তু কে তোর এ রবে মোহিত হইবে? যে হয়, সে হউক, কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী কখন মোহিত হইবে না। তোরা আমাকে জ্বালাতন করিয়াছিস্। অল্পপ্রাণ পতঙ্গ! ক্ষীণ জীব! তুই প্রভাকরের প্রভায় নষ্টপক্ষ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হস্, শীত সঞ্চারে পলায়ন করিস, সমীরণের ঈষদ্বেগে কোথায় চালিত হস্, তাহার স্থিরতা নাই, দেবানন্দ সুগন্ধ সর্জ্জরস ধূমে তোর বংশধ্বংস হয়, রে কীটস্য কীট পতঙ্গাধম, অদ্য হইতে তোকে যেন আর সম্মুখে বা পৃষ্ঠে না দেখিতে হয়! আর অদ্য হইতে যেন কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীকে সামান্য মশা বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ভীষণ মহাদপ্তরে মসীবর্ষী ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপ না করিতে হয়। মশা মারিতে নিত্য কামান পাতিলে লোকে বলিবে

কাপুরুষ—কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

রজনী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রামসদয় মিত্রের সঙ্গে ললিতলবঙ্গলতার সম্বন্ধ হইবার আগে আমার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ হইয়াছিল। ললিতলবঙ্গলতার পিত্রালয়, ভবানীনগরের অনতিদূর কালিকাপুর গ্রামে। কালিকাপুরে, আমার এক পিসীর বাড়ী ছিল। পিসীকর্ত্তৃক এই সম্বন্ধ স্থির হয়। বিবাহের কথা বার্ত্তা অবধারিত হইয়াছিল— কিন্তু এমত সময়ে আমাদিগের সেই কুলকলঙ্ক কন্যাকর্ত্তার কর্ণে প্রবেশ করিল। সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। অবশেষে রামসদয় মিত্র আসিয়া ললিতলবঙ্গলতাকে ছিঁড়িয়া লইয়া গেল।

বিবাহের পূর্ব্বে আমি ললিতলবঙ্গলতাকে সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতাম। আমার পিসীর বাড়ীতে আমি মধ্যে২ যাইতাম। লবঙ্গকে পিসীর বাড়ীতেও

দেখিতাম—তাঁহার পিত্রালয়েও দেখিতাম। মধ্যে২ লবঙ্গকে শিশুবোধ হইতে "ক" য়ে করাত, "খ" য়ে খরা, শিখাইতাম। যখন তাহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হইল, তখন হইতে সে আমার কাছে আর আসিত না। কিন্তু সেই সময়েই আমিও তাহাকে দেখিবার জন্য অধিকতর উৎসুক হইয়া উঠিলাম। তখন লবঙ্গের বিবাহের বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছিল—লবঙ্গ কলিকা ফোট ফোট হইয়াছিল। চক্ষের চাহনি চঞ্চল অথচ ভীত হইয়া আসিয়াছিল—উচ্চহাসা মৃদু এবং ব্রীড়াযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—দ্রুতগতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল। আমি মনে করিতাম, এমন সৌন্দর্য্য কখন দেখি নাই—এসৌন্দর্য্য যুবতীর অদৃষ্টে কখন ঘটে না। বস্তুতঃ অতীতশৈশব, অথচ অপ্রাপ্তযৌবনার সৌন্দর্য্য, এবং অস্ফুটবাক্ শিশুর সৌন্দর্য্য, ইহাই মনোহর—যৌবনের সৌন্দর্য্য তাদৃশ নহে। যৌবনে বসন ভূষণের ঘটা, হাসি চাহনির ঘটা, —বেণীর দোলনি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনি, কথার ছলনি—যুবতীর রূপের বিকাশ, এক প্রকার দোকানদারি। আর আমরা যে চক্ষে যে সৌন্দর্য্য দেখি, তাহাও বিকৃত। যে যৌবনের উপভোগে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিত্তভাবের সংস্পর্শ মাত্র নাই, সেই সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য।

যাহা হউক, এই সময়ে লবঙ্গলতা লাভে নিরাশ হওয়ায় আমি বড় ক্ষুণ্ণ হইলাম—বৃদ্ধ ধনকলস রামসদয়ের উপর এমন জাতক্রোধ হইলাম যে, অনেক সময়েই তাহার লম্বোদরমধ্যে ছুরিকা প্রবেশের অভিলাষ হইত। তাহার পর আর আমি বিবাহ করিতে পাইলাম না—সকল রাগ টুকু রামসদয়ের উপর বর্ত্তিল। সে কথা আমি আর কখন ভুলিলাম না।

ইহার কয় বৎসর পরে এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যে তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। পশ্চাৎ বলিব, কি না, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছি না। সেই অবধি আমি গৃহত্যাগ করিলাম। সেই পর্য্যন্ত নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াই বেড়াই। কোথাও স্থায়ী হইতে পারি নাই।

কেন বল দেখি? আমি ক্রূর, খল, দ্বেষক, মন্দ—যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বল—আমি সব, স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমি এই সুখময় গৃহ—এই উদ্যানতুল্য পুষ্পময় সংসার ত্যাগ করিয়া, বাত্যাতাড়িত পতঙ্গের মত দেশে দেশে বেড়াইলাম, কেন বল দেখি? কেন আমি, আমার সেই জন্ম ভূমিতে রম্য গৃহ রম্য সজ্জায় সাজাইয়া, রঙ্গের পবনে সুখের নিশান উড়াইয়া দিয়া, হাসির বানে দুখ রাক্ষসকে বধ করিলাম না? আমার কি দুঃখ? আমার কেহ নাই? কাজ কি কেহতে? কে কার? কার কে? জীবনের নদী কি একা পার হওয়া যায় না? কে বারণ করে? কত টুকু পাড়ি? কিসের সহায়? সহায়ে কি হইবে? একা আসি-

য়াছি, একা যাইব, একা থাকিবনা কেন? জড়জগৎ জগৎ, অন্তর্জ্জগৎ কি জগৎ নয়? আপনার মন লইয়া কি থাকা যায় না? তোমার বাহ্যজগতে কয়টা সামগ্রী আছে, আমার অন্তরে কি নাই? আমার অন্তরে যাহা আছে, তাহা তোমার বাহ্য জগৎ দেখাইবে, সাধ্য কি? যে কুসুম এ মৃত্তিকায় ফুটে, যে বায়ু এ আকাশে বয়, যে চাঁদ এ গগনে উঠে, যে সাগর এ অন্ধকারে আপনি মাতে, তোমার বাহ্য জগতে তেমন কাথায়?

তবে কেন, সেই নিশীথ কালে, সুষুপ্তা সুন্দরীর সৌন্দর্য্যপ্রভা—দূর হৌক! কেন গরল খাইলাম না—কেন জলে ডুবিলাম না, কেন গলায় ছুরি দিয়া মরিলাম না! আমার বড় যন্ত্রণা হইতেছে—আমি মনের কথা বলি বলি, অথচ বলিতে পারিতেছি না। এক দিন নিশীথ কালে—এই অসীম পৃথিবী সহসা আমার চক্ষে শুষ্ক বদরীর মত ক্ষুদ্র হইয়া গেল—আমি লুকাইবার স্থান পাইলাম না। দেশে দেশে ফিরিলাম—জ্বালা নিবিল না।

আবার ফিরিলাম কেন? সংসারের বন্ধন দুশ্ছেদ্য কেন? কিছুতেই এ বাঁধন কাটা যায় না কেন? আমি কার, কে আমার? তবে আমি আবার ফিরিয়া লোকালয়ে আসিলাম কেন? লোকালয়ের জন্য আমি এত কাতর কেন? লোক আমার কে? আমি লোকের কে? কে আমার ভাল বাসে? কে আমার জন্য কাতর? কে আমার জন্য, এক দিনের সুখ অল্প করিয়া ভোগ করে? কে আমার জন্য এক দিনের আহ্লাদ বন্ধ করে? সুখের সময় কে আমাকে ভাবে? এমন কে লোকালয়ে আছে? তবে আমি লোকের জন্য কাতর কেন? আমি কাহার সুখ বাড়াইব,—কে আমার সুখ বাড়াইবে? আমি কাহার দুঃখ নিবারণ করিব—কে আমার দুঃখ নিবারণ করিবে? এমন কি পৃথিবীতে আমার কেহ নাই? না, এই অনন্ত অসীম, সাগর নগ নগর দেশ প্রদেশ প্রান্তর কানন মণ্ডিত, বিশাল, দুশ্চিন্ত্য জগতে আমার এমন কেহ নাই। কেহ নাই! কেহই নাই! ভাবিয়া, ভাবিয়া, ভাবিয়া, খুঁজিয়া, খুঁজিয়া, দেখিলাম এমন কেহ নাই। তবে ভাবি কেন? কেন ভাবি, তাই ভাবি।

তবে, এ সংসারের মায়া বড়ই দুশ্ছেদনীয়া। অথবা মন বড়ই অবশ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কাশীধামে গোবিন্দকান্ত দত্ত নামে কোন সচ্চরিত্র, অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ হইল। হরেকৃষ্ণদাসের নিবাস যে গ্রামে, ইঁহারও নিবাস সেই গ্রামে। সে কথা আমি জানিতাম না। ইনি বহুকাল হইতে কাশীবাস করিয়া আছেন।

একদা তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন কালে

পুলিষের অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গ ক্রমে উত্থাপিত হইল। অনেকে পুলিষের অত্যাচার ঘটিত অনেক গুলিন গল্প বলিলেন—দুই একটা বা সত্য, দুই একটা বক্তাদিগের কপোলকল্পিত। গোবিন্দকান্ত বাবু একটি গল্প বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই।

"হরেকৃষ্ণ দাস নামে আমাদিগের গ্রামে একঘর দরিদ্র কায়স্থ ছিল। তাহার একটি শিশু কন্যা ছিল। তাহার গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছিল, এবং সে নিজেও রুগ্ন। এজন্য সে কন্যাটি আপন শ্যালীপতিকে প্রতিপালন করিতে দিয়াছিল। তাহার কন্যাটির কতক গুলিন স্বর্ণালঙ্কার ছিল। লোভ বশতঃ তাহা সে শ্যালীপতিকে দেয় নাই। কিন্তু যখন মৃত্যু উপস্থিত দেখিল, তখন সেই অলঙ্কার গুলি সে আমাকে ডাকিয়া আমার কাছে রাখিল—বলিল যে 'আমার কন্যার জ্ঞান হইলে তাহাকে দিবেন—এখন দিলে রাজচন্দ্র ইহা আত্মসাৎ করিবে।' আমি স্বীকৃত হইলাম। পরে হরেকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে সে লাওয়ারেশ মরিয়াছে বলিয়া, নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেব দারোগা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরেকৃষ্ণের ঘটিবাটী পাতর টুকনি লাওয়ারেশ মাল বলিয়া হস্তগত করিলেন। কেহ কেহ বলিল, যে হরেকৃষ্ণ লাওয়ারেশ নহে—কলিকাতায় তাহার কন্যা আছে। দারগা মহাশয়, তাহাকে কটু বলিয়া, আজ্ঞা করিলেন, 'ওয়ারেশ থাকে, হজুরে হাজির হইবে।' তখন, আমার দুই একজন শত্রু সুযোগ মনে করিয়া বলিয়া দিল, যে গোবিন্দ দত্তের কাছে ইহার স্বর্ণালঙ্কার আছে। আমাকে তলব হইল। আমি তখন দেবাদিদেবের কাছে আসিয়া যুক্তকরে দাঁড়াইলাম। কিছু গালি খাইলাম। আসামীর শ্রেণীতে চালান হইবার গতিক দেখিলাম। বলিব কি? ঘুষাঘুষির উদ্যোগ দেখিয়া অলঙ্কার গুলি সকল দারোগা মহাশয়ের পাদ পদ্মে ঢালিয়া দিলাম; তাহার উপর পঞ্চাশ টাকা নগদ দিয়া নিষ্কৃতি পাইলাম।

"বলা বাহুল্য যে দারোগা মহাশয় অলঙ্কারগুলি আপন কন্যার ব্যবহারার্থ নিজালয়ে প্রেরণ করিলেন। সাহেবের কাছে তিনি রিপোর্ট করিলেন, যে 'হরেকৃষ্ণ দাসের এক লোটা আর এক দেরকো ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তিই নাই; এবং সে লাওয়ারেশ ফৌত করিয়াছে, তাহার কেহ নাই।'"

যখন রামসদয়ের সঙ্গে লবঙ্গলতার বিবাহ হয়, তখন রামসদয়ের বাপের উইলের কথা সবিশেষ শুনিয়াছিলাম। হরেকৃষ্ণ দাসের নাম শুনিয়াছিলাম এবং জানিতাম যে কথিত লাওয়ারেশ রিপোর্টের নকল দৃষ্টি করিয়াই বিষ্ণুরাম বাবু বিষয় রামসদয়ের পুত্রদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। আমি গোবিন্দবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে,

"ঐ হরেকৃষ্ণ দাসের এক ভাইয়ের নাম মনোহর দাস না?"

গোবিন্দ কান্ত বাবু বলিলেন, "হাঁ। আপনি কি প্রকারে জানিলেন?"

আমি বিশেষ কিছু বলিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "হরেকৃষ্ণের শ্যালী পতির বাড়ী কোথা?"

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "কলিকাতায়। কিন্তু কোন স্থানে তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।"

ইহার অল্পদিন পরেই আমি কাশী পরিত্যাগ করিলাম। লবঙ্গলতা অপহরণের প্রতিশোধ করিব।

অনেক দিন কলিকাতায় রাজচন্দ্র দাসের অনুসন্ধান করিলাম। কোন সন্ধান পাইলাম না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একদা কোন গ্রাম্য কুটুম্বের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে গ্রামপর্য্যটনে গিয়াছিলাম। একস্থানে অতি মনোহর নিভৃত জঙ্গল; দয়েল সপ্তস্বর মিলাইয়া আশ্চর্য্য ঐকতানবাদ্য বাজাইতেছে; চারিদিগে বৃক্ষরাজি; ঘনবিন্যস্ত, কোমল শ্যাম, পল্লবদলে আচ্ছন্ন; পাতায় পাতায় ঠেসাঠেসি মিশামিশি, শ্যাম রূপের রাশি রাশি; কোথাও কলিকা, কোথাও স্ফুটিত পুষ্প, কোথাও অপক্ক, কোথাও সুপক্ক ফল। সেই বনমধ্যে আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, এক জন বিকট মূর্ত্তি পুরুষ এক যুবতীকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিতেছে।

দেখিবা মাত্র বুঝিলাম পুরুষ অতি নীচ জাতীয় পাষণ্ড—বোধ হয় ডোম কি সিউলি—কোমরে দা। গঠন অত্যন্ত বলবানের মত।

ধীরে ২ তাহার পশ্চাদ্ভাগে গেলাম। গিয়া তাহার কক্ষাল হইতে দা খানি টানিয়া লইলা দূরে নিক্ষিপ্ত করিলাম। দুষ্ট তখন যুবতীকে ছাড়িয়া দিল—আমার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। আমাকে গালি দিল। তাহার দৃষ্টি দেখিয়া আমার শঙ্কা হইল।

বুঝিলাম, এস্থলে বিলম্ব অকর্ত্তব্য। একবারে তাহার গলদেশে হস্তার্পণ করিলাম। ছাড়াইয়া সেও আমাকে ধরিল। আমিও তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিলাম। তাহার বল অধিক। কিন্তু আমি ভীত হই-নাই—বা অস্থির হই নাই। অবকাশ পাইয়া আমি যুবতীকে বলিলাম যে, তুমি এই সময়ে পলাও—আমি ইহার উপযুক্ত দণ্ড দিতেছি।

যুবতী বলিল,—কোথায় পলাইব? আমি যে অন্ধ! এখানকার পথ চিনি না।

দেখিলাম, সে বলবান্ পুরুষ আমাকে প্রহার করিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু আমাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার অভিপ্রায় বুঝিলাম যে দিকে আমি দা ফেলিয়া দিয়াছিলাম, সেই দিকে সে আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি তখন দুষ্টকে ছাড়িয়া দিয়া অগ্রে গিয়া দা কুড়াইয়া লইলাম। সে

এক বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া, তাহা ফিরাইয়া আমার হস্তে প্রহার করিল—আমার হস্ত হইতে দা পড়িয়া গেল। সে দা তুলিয়া লইয়া, আমাকে তিন চারি স্থানে আঘাত করিয়া পলাইয়া গেল।

আমি গুরুতর পীড়া প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বহুকষ্টে আমি কুটুম্বের গৃহাভিমুখে চলিলাম। অন্ধ যুবতী আমার পদশব্দানুসরণ করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া আর আমি চলিতে পারিলাম না। পথিক লোকে আমাকে ধরিয়া আমার কুটুম্বের বাড়ীতে রাখিয়া আসিল।

সেই স্থানে আমি কিছু কাল শয্যাগত রহিলাম—অন্য আশ্রয়াভাবেও বটে, এবং আমার দশা কি হয়, তাহা না জানিয়া কোথাও যাইতে পারে না, সে জন্যও বটে, অন্ধ যুবতীও সেই খানে রহিল।

বহুদিনে, বহুকষ্টে, আমি আরোগ্য লাভ করিলাম। ক্রমে যুবতীর পরিচয় পাইলাম। তাহার নাম রজনী—পিতার নাম রাজচন্দ্র দাস। আমি যে রাজচন্দ্র দাসের সন্ধান করিতেছিলাম এ সেই রাজচন্দ্র নহে ত?

রজনীর নিকট হইতে ঠিকানা জানিয়া লইলাম। ঠিকানা বলিতে রজনী নিতান্ত অনিচ্ছুক, কিন্তু আমাকে অদেয় তাহার কিছুই ছিল না, কেন না আমি প্রায় আপনার প্রাণ দিয়া তাহার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলাম।

রজনী আপাততঃ সেইখানেই রহিল। আমি রাজচন্দ্র দাসের অনুসন্ধানে কলিকাতায় গেলাম। তাহার সঙ্গে কথোপকথনে জানিলাম যে, রজনী হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা বটে।

তখন আমি রজনীকে কলিকাতায় লইয়া গেলাম। এক নিভৃত গৃহে তাহাকে স্থাপিত করিলাম। সে আমার কাছে স্বীকৃতা হইল, যে সে গৃহ হইতে বাহির হইবে না। বা কাহাকেও দেখা দিবে না। তৎপরে আমি প্রমাণ সংগ্রহে যাত্রা করিলাম। পুনরপি গোবিন্দ কান্ত বাবুর কাছে গেলাম। বালার মোকদ্দামার সন্ধান তাঁহারই কাছে প্রাপ্ত হই। সে মোকদ্দামা বর্দ্ধমানে হয়। তাঁহার সাহায্যে অন্যান্য প্রমাণও সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলাম। বিস্তারে প্রয়োজন নাই।

এখন মোকদ্দামা করিলে, রজনী যে বিষয় পাইবে তাহা নিশ্চিত বুঝিলাম। আমার অভিপ্রায়, রজনীকে বিবাহ করি। কিন্তু আশ্চর্য্য! রজনী, আমার জন্য প্রাণ দানেও সম্মতা, তথাপি বিবাহ করিতে সম্মতা হইল না। ভাবগতিকে বুঝিলাম যে আমি যদি পীড়াপীড়ি করি, তবে আত্মহত্যা করিবে।

কিন্তু যদি আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ না হইল, তবে তাহার বিষয়োদ্ধারে আমার ইষ্ট কি? আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, যে বিষয়োদ্ধারেও রজনী নিতান্ত অসম্মতা। পরিশেষে, আমার অনুরোধে তাহাতে সম্মত হইল—তাহার উদ্ধারার্থে

আমি যে আহত হইয়া শয্যাগত হইয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিয়া, আমার অনুরোধে সম্মত হইল! বিষয়োদ্ধারের পর বিবাহ করিবে, এমত ভরসাও পাইলাম। এবং ইহাও স্বীকার করিল যে, যত দিন না বিবাহ হয়, তত দিন সে আমার গৃহে, আমার পত্নীপরিচয়ে থাকিবে। বহুকষ্টে এ সকল কথা তাহাকে স্বীকার করাইলাম। আমাকেও স্বীকার করিতে হইল, যে যত দিন না বিবাহ হয়, ততদিন আমি তাহাকে পরস্ত্রী বিবেচনা করিব।

কেবল আমার ঋণ পরিশোধার্থ রজনী এতদূর স্বীকার করিয়াছিল। তাহার পরে সে কি প্রকারে যে ফাঁকি দিল, তাহা বলিয়াছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রজনীর শান্তিপুরে যাইবার কথা রাজচন্দ্রদাসকে কাজে কাজেই বলিতে হইল। শুনিয়া রাজচন্দ্র বলিল যে, তবে আমি আর কি সম্বন্ধে এখানে থাকি? আমাকেও বিদায় দিন্।

অগত্যা তাহাও স্বীকার করিতে হইল। রাজচন্দ্রকে একটি বাড়ী কিনিয়া দিলাম। কিছু২ মাসিক দিতে স্বীকৃত হইলাম। রাজচন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া নূতন বাড়ীতে গিয়া বাস করিতে লাগিল। রজনীকেও সেইখানে লইয়া যাইবার জন্য সে অনেক যত্ন করিল, কিন্তু কিছুতেই রজনী সম্মতা হইল না। সে শান্তিপুরে গেল।

আমি তখন একা—একা কি করিলাম? এই কণ্টকময় জীবনারণ্যে ঘুরিয়া২ বেড়াইতে লাগিলাম। আপাততঃ কলিকাতাতেই রহিলাম। দেখিব, লোকালয়ে কি সুখ। লোকের সঙ্গে মিশিতে লাগিলাম। লোকও আমার সঙ্গে মিশিতে লাগিল। অনেক লোক আমার বশীভূত হইতে লাগিল। কাহাকে কথায় বশ করিলাম, শুধু মিষ্ট কথায়, কাহাকে আলাপে; কাহাকে অর্থের দ্বারা বশ করিলাম,—অর্থাৎ কাহাকে অল্প২ নগদ দিলাম, কাহাকে ঋণের আশায় রাখিলাম। কাহাকেও ঋণ দিলাম না—কর্জ্জ লইলেই শত্রু হয়। কাহাকে কেবল পরামর্শ দিয়া বাধ্য করিলাম—কাহারেও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া আরও বাধিত করিলাম। কাহারও পীড়ার সময়ে আত্মীয়তা করিয়া আত্মীয় করিয়া তুলিলাম,—কাহারও সুখের দিনে সুখ বাড়াইয়া দিয়া অনুগত করিয়া লইলাম। কাহারও বক্তৃতা লিখিয়া দিলাম—লোকের কাছে প্রকাশ করিলাম না;—কাহারও সুখ্যাতি সম্বাদপত্রে লিখিয়া তাহাকে ক্রীতদাস করিলাম,—কাহারও শত্রুনিন্দা লিখিয়া আরও আপ্যায়িত করিলাম। কাহারও কাছে মিষ্ট গল্প করিয়া বন্ধু করিয়া লইলাম—কাহার অমিষ্ট গল্প নীরবে কাণ পাতিয়া শুনিয়া তাহাকে প্রেমডোরে বাঁধিলাম। কাহাকে হাস্য পরিহাসে প্রীত করিলাম, কাহারও রসশূন্য পরিহাসে হাসিয়া কিনিয়া রাখি

লাম। কেহ আমাকে ধার্ম্মিক ভাবিয়া ভাল বাসিল—কেহ আমাকে তাহার আপনার মত অধার্ম্মিক বলিয়া ভাল বাসিল। কেহ কোন জ্ঞাতি বা অন্য শত্রুর নিন্দা করিতে ভাল বাসিত, আমি বিনা আপত্তিতে তৎকৃত জ্ঞাতিনিন্দা শুনিতাম;—কেহ আপনার কুচরিত্রা পত্নীর, বা কুপুত্রের, বা ততোধিক নিন্দার্হ কোন প্রেমাস্পদীভূত বা প্রেমাস্পদীভূতার সুখ্যাতি করিতে ভাল বাসিত, তাহাও কাণ পাতিয়া শুনিতাম; উভয়েরই প্রিয় হইলাম। পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খের কাছে কতক গুলা গ্রন্থের নাম করিয়া পূজ্য হইলাম—যথার্থ পণ্ডিতদিগের সারগর্ভ বাক্যের মর্ম্মগ্রহণে যত্ন করিয়া তাঁহাদিগেরও শ্রদ্ধা লাভ করিলাম। অনেকেই শুধু আমার গাড়ি জুড়ি বাড়ী দেখিয়া গোলাম হইল। কেহ বা সে সকলের নিন্দা করিয়া আপনার ঐশ্বর্য্য ইঙ্গিতে জানাইতেন, আমি সে নিন্দা প্রকারতঃ স্বীকার করিতাম—সুতরাং তাঁহাদিগেরও আমি প্রিয় হইলাম। কেহ কেবল আমার গাড়ি ঘোড়াতে চড়িয়াই বাধ্য! অল্পদিন মধ্যেই শুনিতে পাইলাম যে, অমরনাথ ঘোষ কলিকাতায় একজন সুপ্রসিদ্ধলোক—সকলেরই প্রিয়! অল্পকালমধ্যে দেখিলাম আত্মীয় লোকের জ্বালায় আমার স্নানাহারেরও অবকাশ নাই।

কাহারও কিছু কাড়িয়া লইব, কাহাকেও বঞ্চনা করিব, পাকচক্রে বড় লোক হইব —এরূপ কোন অভিসন্ধিতে আমি এজাল পাতিলাম না। আমি যাহা হই—আমাকে, যদি ক্ষুদ্র প্রবঞ্চক মনে করিয়া থাক, তবে ভুলিয়াছ। রজনীর সম্পত্তি, আমি বঞ্চনা করিয়া লই নাই—সে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে দিয়াছে—যে দিন চাহিবে সেই দিন প্রত্যর্পণ করিতে রাজি আছি। শচীন্দ্রের সম্পত্তি ন্যায়ানুসারে রজনীর—তাহাতেও কাহাকে প্রবঞ্চনা করিনাই। এখনও কোন ব্যক্তিবিশেষকে বা জন সমাজকে প্রবঞ্চনা করিব, সে অভিপ্রায় রাখিতাম না।

তবে কেন এ জালবিস্তার? কেবল লোকালয়ে কিসুখ তাহা দেখিব, এই কামনায়। তাহা দেখিলাম; ইহা অপেক্ষা অরণ্য ভাল। এখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কেন এবিষয় সংগ্রহ করিলাম? রজনী ইহা পুনর্গ্রহণ করুক—লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করুক।

ঋতুবর্ণন।*

কাব্যের দুইটি উদ্দেশ্য; বর্ণন, ও শোধন।

এই জগৎ শোভাময়। যাহা দেখিতে সুন্দর, শুনিতে সুন্দর, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুকোমল, তৎসমুদায়ে বিশ্ব পরিপূর্ণ। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য, কিন্তু সৌন্দর্য্য খুঁজিতে হয় না—এ জগৎ যেমন দেখি, তেমনি যদি লিখিতে পারি, যদি ইহার যথার্থ প্রতিকৃতির সৃষ্টি করিতে পারি, তাহা হইলেই সুন্দরকে কাব্যে অবতীর্ণ করিতে পারিলাম। অতএব কেবল বর্ণনা মাত্রই কাব্য।

সংসার সৌন্দর্য্যময় কিন্তু যাহা সুন্দর নহে, তাহারও অভাব নাই। পৃথিবীতে কদাকার কুবর্ণ, পূতিগন্ধ, কর্কশস্পর্শ, ইত্যাদি বহুতর কুৎসিত সামগ্রী আছে, এবং অনেক বস্তু এমনও আছে যে, তাহাতে সৌন্দর্য্যের ভাব বা অভাব কিছুই লক্ষিত হয় না। ইহাও কি কাব্যের সামগ্রী? অথচ ঐ সকলের বর্ণনাও ত কাব্যমধ্যে পাওয়া যায়—এবং অনেক সময় যাহা অসুন্দর, তাহারই সৃজন কবির মুখ্য উদ্দেশ্যস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। কারণ কি?

সকলেই বৃদ্ধিশালী। কাব্যের অধিকারও বৃদ্ধির নিয়মানুসারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আদৌ সুন্দরের বর্ণনা বর্ণনা কব্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু জগতে সুন্দর অসুন্দর মিশ্রিত; অনেক সুন্দরের বর্ণনায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অসুন্দরের বর্ণনা; অনেক সময়ে আনুষঙ্গিক অসুন্দরের বর্ণনায় সুন্দরের সৌন্দর্য্য স্পষ্টীকৃত হইয়া থাকে। এজন্য অসুন্দরের বর্ণনা বর্ণনাকাব্যে স্থান পাইয়াছে; কালে বর্ণনা মাত্রই বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য, স্বরূপ বর্ণনা। জগৎ যেমন আছে, ঠিক্ তাহার প্রকৃত চিত্রের সৃজন করিতে এ শ্রেণীর কবিরা যত্ন করেন।

আর এক শ্রেণীর কবিদিগের উদ্দেশ্য অকিবল স্বরূপ বর্ণনা নহে। অপ্রকৃত বর্ণনাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা প্রকৃতি সংশোধন করিয়া লয়েন—যাহা সুন্দর, তাহাই বাছিয়া বাছিয়া লইয়া, যাহা অসুন্দর তাহা বহিষ্কৃত করিয়া কাব্যের প্রণয়ন করেন। কেবল তাহাই নহে। সুন্দরেও যে সৌন্দর্য্য নাই যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ, কেহ কখন ইন্দ্রিয়গোচর করে নাই, "যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই" সেই আত্মচিত্ত প্রসূত উজ্জ্বল হৈমকিরণে সকলকে পরিপ্লুত করিয়া, সুন্দরকে আরও সুন্দর করেন—সৌন্দর্য্যের অতিপ্রকৃত চরমোৎ-

* ঋতুবর্ণন। শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত। চুঁচুড়া সাধারণী যন্ত্র।

কর্ম্মের সৃষ্টি করেন। অতি প্রকৃত কিন্তু অপ্রকৃত নহে। তাঁহাদের সৃষ্টিতে অযথার্থ, অভাবনীয়, সত্যের বিপরীত, প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই, কিন্তু প্রকৃতিতে ঠিক্ তাহার আদর্শ কোথাও দেখিবে না। ইহাকেই আমরা প্রবন্ধারম্ভে শোধন বলিয়াছি। যে কাব্যে এই শোধনের অভাব, যাহার উদ্দেশ্য কেবল "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং" তাহাকেই আমরা বর্ণন বলিয়াছি।

আমরা দুই জন আধুনিক বাঙ্গালি কবির কাব্যকে উদাহরণ স্বরূপ প্রয়োগ করিয়া এই কথাটি সুস্পষ্ট করিতে চাহি। যে কাব্যের উদ্দেশ্য শোধন, হেম বাবু প্রণীত "বৃত্রসংহার" তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহার কাব্যে প্রকৃতি পরিশুদ্ধ হইয়া, মনোহর নবীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া লোকের মনোমোহন করিতেছেন। মানব স্বভাব সংশুদ্ধ হইয়া দৈব এবং আসুরিক প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছে; কর্কশ পৃথিবী পরিশুদ্ধা হইয়া স্বর্গে ও নৈমিষারণ্যে পরিণত হইয়াছে। যে জ্যোতিঃ দেবগণের শিরোমণ্ডলে, তাহা জগতে নাই—কবির হৃদয়ে আছে। যে জ্বালা শচীর কটাক্ষে, তাহা জগতে নাই—কবির হৃদয়ে আছে। সংসারকে শোধন করিয়া কবি আপনার কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাবু গঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত ঋতুবর্ণন। ইহাতে প্রকৃতির সংশোধন উদ্দিষ্ট নহে—প্রকৃত বর্ণনা, স্বরূপ চিত্র, বাহ্য জগতের আলোকচিত্র, ইহার উদ্দেশ্য। উভয়েই কৃতকার্য্য, উভয়েই সুকবি কিন্তু প্রভেদও অতি স্পষ্ট। একটী উদাহরণে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। উভয়েরই কাব্যে বিদ্যুৎ আছে—গঙ্গাচরণ বাবুর কাব্যে বিদ্যুৎ, উৎকৃষ্ট রূপে আত্মকার্য্য সম্পন্ন করে, যথা,

ঘনতম ঘোর ঘটা ক্রমে ঘোরতর,
চতুর্দ্দিকে অন্ধকার, অতিভয়ঙ্কর।
চপলা চমকি প্রভা করিছে বাহির।
ভীষণ নিনাদে ঘন নির্ঘোষে গভীর।

চারি ছত্রে এই চিত্রটি সম্পূর্ণ, ইহাতে অসম্পূর্ণতা কিছুই নাই। দোষ ধরিবার কথা কিছুই নাই। যাহা প্রকৃত তাহার কিছুরই অভাব নাই—তাহার অতিরিক্ত একটি কপর্দ্দক নাই। পরে হেম বাবুর বিদ্যুৎ দেখ,

কিম্বা গিরিশৃঙ্গ রাজি
মধ্যে যথা তেজে সাজি
ক্ষণ প্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা।
খেলে রঙ্গে ভীমভঙ্গি,
শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া স্থূল তীক্ষ্ণ ছটা॥
নিমেষে নিমেষ ভঙ্গ,
দগ্ধ গিরিচূড়া অঙ্গ,
অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ে ঘোর রাবে,
বেগে দীপ্ত গিরি কায়,
বিদ্যুৎ আবার ধায়,
ছড়ায়ে জ্বলন্ত শিখা উল্লাসিত ভাবে॥

স্থানান্তরে বিদ্যুৎ আরও শোধিত, উৎকর্ষতা প্রাপ্ত;—

কেমনে ভুলিব বল, মেঘে যবে আখণ্ডল
বসিত কার্ম্মুক ধরি করে।
তুই সে মেঘের অঙ্গে খেলাতিস্ কত রঙ্গে
ঘটাকরি লহরে লহরে॥

এক্ষণে গঙ্গাচরণ বাবু প্রণীত দুই একটি "আলোকচিত্র," পাঠককে উপহার দিব। দেখিবেন আলোকচিত্র ঠিক উঠিয়াছে। নিদাঘ কালের গৃহ দাহ বর্ণনা করিতেছেন,

বায়ু সঙ্গ চালি অঙ্গ দেখ অগ্নি রোষিছে,
শুষ্ক ঘাস, রজ্জু, বাঁশ শক্তি তার পোষিছে;
দীপ্ত কায় মত্ততায় ভীম মূর্ত্তি খেলিছে;
রশ্মিভাগ রক্তরাগ পল্লিমাঝ মেলিছে;
গেহচাল, বৃক্ষডাল, দাহি বহ্নি মাতিছে;
শূন্যপুরি ভূরি ভূরি বিস্ফুলিঙ্গ ভাতিছে;
ধূমরাশি ভাসি ভাসি ঊর্দ্ধদেশ যাইছে;
ভস্মভার অন্ধকার অন্তরীক্ষ ছাইছে;
উচ্চরোল সোরগোল তাপতেজ বাড়িছে;
বংশরাজি বোম বাজি তুল্য শব্দ ছাড়িছে;
ধেনুপাল আলথাল উৰ্দ্ধ ফুৰ্দ্ধ চাহিছে;
দগ্ধকায় শারিকায় মৃত্যুগীত গায়িছে;
"বারিআন""চালটান,"লোকপুঞ্জহাঁকিছে;
দীনতায় কাতরায় দেবতায় ডাকিছে;
দূর্ব্বা, ধান, বস্ত্র, পান, অগ্নিমাঝ ডালিছে;
বাম্পবারি কুম্ভবারি একতায় ঢালিছে;
আর্ত্তনাদি তৈজসাদি আঙ্গিনায় নাড়িছে;
কেহ কেহ বাস গেহ ভাঙ্গি ভূমি পাড়িছে;
মুক্ত কেশ,ছিন্ন বেশ,দৌড়াদৌড়ি ধাইছে;
তপ্তঅঙ্গ, চিত্তভঙ্গ, পানবারি চাইছে;
গেল বাস, সর্ব্বনাশ, বালবৃদ্ধ কাঁদিছে;
একি দায়! চোর তায় চৌর্য্যবৃত্তি সাধিছে;
বহ্নিজাল পণ্যশাল ঘেরি দেখ লাগিছে;
মাস, মুগ, তৈল, পূগ, খায় আর রাগিছে;
গেল ঠাট, পুঁজিপাট, মুদি মুণ্ড কুটিছে;
হায় হায়! মৃত্তিকায় দেহপাতি লুটিছে;
নষ্টদেশ, অর্থশেষ নাহি কার থাকিছে;
ছারখার ভস্মভার দগ্ধধাম ঢাকিছে;
গ্রামখণ্ড লণ্ডভণ্ড অগ্নিচণ্ড নামিছে;
দাহিবার নাহি আর ধিকি ধিকি থামিছে;

নিম্নোদ্ধৃত কয় ছত্রে বাত্যার পর প্রকৃতির অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

দেখি গিয়া পরদিন, জনপদ শোভা হীন,
লণ্ডভণ্ড মানব বসতি;
দুরাচার প্রভঞ্জন দৌরাত্ম্যের নিদর্শন
গেছে রেখে, শোচনীয় অতি;
কতশত তরুবর মূলসহ কলেবর
মৃত্তিকায় করেছে বিস্তার;
আর নাহি তুলি কায়া,পথিকেরে দিবেছায়া,
ফল ফুলে তুষিবে না আর।
তাহাদের অধিবাসী, বিহঙ্গম রাশি রাশি,
আছে পড়ে এখানে সেখানে;
কত বৃক্ষ কাণ্ড সার, নাহি শাখা অলঙ্কার,
স্থাণু হয়ে আছে স্থানে স্থানে।
নরবাস আলথাল, গৃহ হতে কত চাল
দূরে গিয়া, শুয়েছে ভূতলে;
অনেক ইটের গেহ ত্যজেছে প্রাচীন দেহ,
অঙ্গহীন হয়েছে সকলে।
পথে চলা কষ্ট অতি,ডালে চালে রোধগতি,
স্থানে স্থানে সেতুর নিপাত;

বিনষ্ট বাজার হাট, ভেঙেছে দোকান পাট,
হানে মুদী শিরে করাঘাত।
মাঠে ঘাটে, জলে ঝড়ে, ঘরে ঘরে আছেপড়ে
ধেনু মেষ মহিষ বিস্তর;
কত নর ভাগ্য দোষে পড়িয়া ঝঞ্চার রোষে
গেছে চলে শমনের ঘর।
ভাসে শব নদীনীরে, কত বা লেগেছে তীরে,
কত দ্রব্য স্রোতে ভেসে যায়,
উলটিয়া কত তরী ভাসিছে সলিলোপরি,
ভেঙে কত রয়েছে চড়ায়।
বিদলিত কত কুঞ্জ, ছিন্ন ভিন্ন লতা পুঞ্জ,
বিহঙ্গের নাহি কণ্ঠকল,
নর নারী হতজ্ঞান, হয়ে অতি ম্রিয়মাণ,
ফেলিতেছে নয়নের জল।

আমরা যে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম, উভয়েই শোধনশূন্য উৎকৃষ্ট বর্ণনার উদাহরণ। গঙ্গাচরণ বাবুর কবিতা পড়িয়া, ইংরেজি কবিদিগের মধ্যে ক্রাব (Crabbe) কে মনে পড়ে। কিন্তু ক্রাবের সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য নির্দ্দেশ করিতেছি বলিয়া, বাঙ্গালি কবিদিগের মধ্যে বর্ণনা কাব্য দুর্লভ এমত নহে। বাঙ্গালি সাহিত্যে শোধন এবং বর্ণন উভয়বিধ কাব্যেরই প্রাচুর্য্য আছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব গীতিকাব্য প্রণেতৃগণ শোধনপটু। বর্ণনকাব্য প্রণেতৃগণ মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একজন।

ইহাও বক্তব্য যে গঙ্গাচরণ বাবু স্পষ্টতঃ দেখাইয়াছেন যে, তিনি শোধন কাব্যেও অপটু নহেন। উদাহরণ স্বরূপ প্রভাত বর্ণনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

মরি কি তরল অমল কিরণে,
ঢল ঢল আভা ঢালিয়া ভুবনে,
পুলকজনক আলোক ভূষণে,
প্রাচী নভোদ্বারে উষা উপনীত,
আরক্ত অধরে কিবা হাসি হাসে,
সে হাসি হিল্লোলে চরাচর ভাসে,
নিশার তামস মিশায় আকাশে,
হেরিয়া হইল অখিল মোহিত।

মোহিনী মাধুরী করি দরশন
প্রণয় প্রয়াসে আপনি তপন
আদরেতে কর করে প্রসারণ,
রূপসীরে যেন হৃদয়ে ধরিতে,
অপরূপ রুচি মানস রঞ্জন,
শান্তির সহিত শোভার মিলন,
সে রুচি দেখাতে বিহঙ্গমগণ
জাগায় জগৎ মধুর ধ্বনিতে।

সুধীর গমনে সমীর শীতল
চলেছে জুড়াতে তাপিত ভূতল;
প্রফুল্ল আননে প্রসূন সকল
পরশনে তার নাচে ধীরে ধীরে;
নলিনী নিকর তাহার হিল্লোলে
কাচসম স্বচ্ছ সরসীর কোলে
হাসি হাসি মুখে আধ আধ দোলে,
নিরখি গগনে নবীন মিহিরে।

আমরা যাহা কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা নিদাঘ হইতে। এই ঋতুবর্ণনে ছয় ঋতুর বর্ণনা নাই—আপাততঃ বসন্ত এবং নিদাঘই প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বসন্ত হইতে নিদাঘ সর্ব্ব প্রকারে উৎকৃষ্ট এবং

এতদুভয় যে ভিন্ন২ সময়ের রচনা তাহা বিলক্ষণ বুঝা যায়। নিদাঘের উৎকর্ষ হেতু আমরা নিদাঘ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি।

পরিশেষে বক্তব্য যে, আমরা ভরসা করি যে গঙ্গাচরণ বাবু এই ঋতুবর্ণনা সম্পূর্ণ করিয়া আমাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। আমরা তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। তাঁহাকে আমরা উচ্চ শ্রেণীর কবি বলিব না—না বলিলেও তিনি আমাদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না। তাঁহার ন্যায় কৃতবিদ্য এবং মার্জ্জিতরুচি লেখক কখনই আপনার রচনার দোষ গুণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত হইবেন না। তবে ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তাঁহার কবিত্ব আছে, এবং তাঁহার কবিতা প্রীতিপ্রদ বটে।

পরামর্শ স্বরূপ ইহাও বলিতে হয় যে, ভবিষ্যৎ সংস্করণে ঋতুবর্ণনের কোন২ অংশ বাদ দিলে ভাল হয়। উদাহরণ—ইক্ষুরস বর্ণনা ইত্যাদি।

অনলেতে চড়াইয়া সেই রস জ্বাল দিয়া
করে কৃষী গুড় অপরূপ।
কিবা মিষ্ট তার তার [illegible] হয় তুলনা তার
থাক নর দেবতা লোলুপ॥
গুড় হতে ভারে ভার হয় চিনি চমৎকার
সুধা সম যার আস্বাদন।
ভোগ সুখ বাড়ে তায় নানা দেশে লয়ে যায়
বণিকেরা বাণিজ্য কারণ॥
এই যে ভারতবর্ষে নভো হতে বর্ষে বর্ষে
বর্ষে বারি বারিধবগণ।
সেই জলে যত চাষী উৎপাদিয়া শস্যরাশি
করে দেশ লক্ষ্মী নিকেতন॥
যত ধনী মহাজন বাঁধে গোলা অগণন
পূরে তায় খন্দ নানা মত।
প্রতুল ঐশ্বর্য্য হয় সতত স্বাধীন রয়
কত লোক হয় অনুগত॥

গঙ্গাচরণ বাবুর পদ্যের গঠন দেখিয়া বোধ হয়, তিনি রহস্যকাব্যে সফল হইতে পারেন। ঋতুবর্ণনে রহস্যের কোন উদ্যোগ দেখিনাই—কিন্তু ভবিষ্যতে চেষ্টা করিলে কি হয়, বলা যায় না।

মিল, ডার্বিন, এবং হিন্দুধর্ম্ম।

প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের শিরোভাগ এই যে, ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনটি পৃথক্২ মূর্ত্তিতে তিনি বিভক্ত। এক সৃজন করেন, এক পালন করেন, এবং এক ধ্বংস করেন। এই ত্রিদেব লোকপ্রথিত। বেদ অনুসন্ধান করিলে এরূপ বিশ্বাসের কিছু অঙ্কুর পাওয়া যাইতে পারে। দর্শনে যে পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু এরূপ বিশ্বাসের কোন নৈসর্গিক ভিত্তি পাওয়া যায় কি?

জনষ্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যুর পর, ধর্ম্মসম্বন্ধে তৎপ্রণীত তিনটি প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে। তাহার একটির উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের অস্তিত্বের মীমাংসা করা। মিলের মত, যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ ঈশ্বরবাদীরা প্রয়োগ করেন, তাহার মধ্যে একটীই সারবান্। জগতের নির্ম্মাণ কৌশল হইতে তাঁহার মতে, নির্ম্মাতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। এটি প্রাচীন কথা, এবং অখণ্ডনীয়ও নহে। ডার্বিনের মত প্রচারের পূর্ব্বেও ইহার সদুত্তর ছিল; এক্ষণে ডার্বিন দেখাইয়াছেন, যে এই নির্ম্মাণ কৌশল স্বতঃই ঘটে। মিলও ডার্বিনের এই মত অনবগত ছিলেন এমত নহে; তিনি স্বীয় প্রবন্ধ মধ্যে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, যদি এই মতটি প্রকৃত হয় তবে উপরি কথিত নির্ম্মাণকৌশল ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদক হয় না। কিন্তু ডার্বিনের মত প্রচারের অল্পকাল পরেই মিলের প্রস্তাব লিখিত হয়। সে মতের সত্যাসত্য পরীক্ষিত এবং নির্ব্বাচিত হওয়ার পক্ষে কাল বিলম্বের প্রয়োজন। কালবিলম্বের সে ফল তিনি পান নাই। অতএব তিনি এই মতের উপর দৃঢ়রূপে নির্ভর করিতে পারেন নাই। নির্ভর করিতে পারিলে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণ নাই।

এখনও অনেকে ডার্বিনের প্রতিবাদী আছেন—কিন্তু বহুতর পণ্ডিতগণ কর্তৃক তাঁহার মত আদৃত এবং স্বীকৃত। অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদ্ এবং দর্শনবিদ্ পণ্ডিতেরা এক্ষণে ডার্বিনের মতাবলম্বী। কিন্তু ডার্বিনের মত প্রকৃত হইলেও ঈশ্বর নাই, এ কথা সিদ্ধ হইল না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণাভাব, ঈশ্বরের অনস্তিত্বের প্রমাণ নহে। কোন পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণাভাবে তাহার অনস্তিত্ব প্রমাণ হইবে,-যদি বিচারের এরূপ নিয়ম সংস্থাপন করা যায়, তাহা হইলে অনেক স্থানে প্রমাদ ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ একটী তত্ত্ব গ্রহণ করা যাউক। জগৎ নিত্য না সৃষ্ট? জগতের আদি আছে না আদি নাই? যদি বল আদি আছে, সে আদির প্রমাণ কি? কিছু না। তবে আদির প্রমাণাভাবে, জগতের অনাদিত্ব সিদ্ধ। যদি বল আদি নাই, তাহারই বা প্রমাণ কি? এখানে প্রমাণাভাবে জগতের সাদিত্ব বা সৃষ্টতা সিদ্ধ। অতএব জগৎ সাদি এবং অনাদি—সৃষ্ট এবং অসৃষ্ট—উভয়ই প্রমাণ হইয়া উঠে। অস্তিত্বের প্রমাণাভাব অনস্তিত্বের প্রমাণ নহে।

অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রমাণ শূন্য যাঁহারা বলিবেন, তাঁহারাও বলিতে পারিবেন না যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রমাণ বিরুদ্ধ বিশ্বাস। ঈশ্বর আছেন এ কথা সত্য হউক না হউক কথা অসঙ্গত কেহ বলিতে পারিবেন না। প্রায় এই রূপ ভাবেই মিল ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। ডার্বিন স্বয়ং স্পষ্টতঃ ঈশ্বর স্বীকার করেন। অতএব প্রমাণ থাক্ বা না থাক্ ঈশ্বর

স্বীকার করা যাউক। কিন্তু যদি ঈশ্বর আছেন, তবে তাঁহার প্রকৃতি কি প্রকার? এ বিষয়ে একটি প্রভেদ এস্থলে স্পষ্টীকরণ আবশ্যক। কতকগুলি ঈশ্বরবাদী আছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও তৎপ্রতি স্রষ্টা বিধাতা ইত্যাদি পদ ব্যবহার করেন না। অন্যে বলেন, ঈশ্বর ইচ্ছা প্রবৃত্ত্যাদি বিশিষ্ট—এই জগতের নির্ম্মাতা; ইচ্ছাক্রমে এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। উপরি কথিত দার্শনিকেরা বলেন, আমরা সে সকল কথা জানি না, জানিবার উপায়ও নাই; ইহাতে কেবল জানি, যে সেই, জগৎকারণ অজ্ঞেয়। হর্বটস্পেন্সর এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্র।* তাঁহার দর্শনে ঈশ্বর জগদ্ব্যাপক জ্ঞানাতীত শক্তি মাত্র।

মিল যে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, তিনি এরূপ অজ্ঞেয় নহেন। মিল ইচ্ছাবিশিষ্ট, জগন্নির্ম্মাতা স্বীকার করিয়াছেন। স্বীকার করিয়া ঐশিক স্বভাবের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঈশ্বরবাদীরা সচরাচর ঈশ্বরের তিনটি গুণ বিশেষ রূপে নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন—শক্তি, জ্ঞান এবং দয়া। তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বরের গুণ মাত্র সীমাশূন্য—অনন্ত। অতএব ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান, এবং দয়াও অনন্ত। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, এবং দয়াময়।

মিল এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যেখানে জগতের নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়াই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছি, সেই খানেই তাঁহার শক্তি যে অনন্ত নহে তাহা স্বীকৃত হইতেছে। কেননা যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার কৌশলের প্রয়োজন কি? কৌশল কোথায় প্রয়োজন হয়? যেখানে কৌশল ব্যতীত ইষ্টসিদ্ধি হয় না, সেইখানেই কৌশল প্রয়োজন হয়—যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, ইচ্ছায় সকলই করিতে পারেন, তাঁহার কৌশলের প্রয়োজন হয় না। কেবল ইচ্ছা বা আজ্ঞামাত্রে কৌশলের উদ্দেশ্য কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে। যদি মনুষ্যের এরূপ শক্তি থাকিত যে, সে কেবল ঘড়ির ডায়ল প্লেটের উপর কাঁটা বসাইয়া দিলেই কাঁটা নিয়ম মত চলিত, তবে কখন মনুষ্য কৌশলাবলম্বন করিয়া ঘড়ির স্প্রিঙ্গের উপর স্প্রিঙ্গ এবং হুইলের উপর হুইল গড়িত না। অতএব ঈশ্বর যে সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, ইহা সিদ্ধ।

এ কথার দুই একটা উত্তর আছে কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তির অনুসন্ধান আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, অতএব সে সকল কথা আমরা ছাড়িয়া যাইতে পারি। সে সকল আপত্তিও মিল সম্যক্ প্রকারে খণ্ডন করিয়াছেন।

সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে মিল বলেন, যে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ। যে

* The consciousness of an Inscrutable Power manifested to us through all phenomena has been growing ever clearer.—*First Principles.* p. 108.

প্রণালী অবলম্বন করিয়া মনুষ্যের কৃত কৌশলের বিচার করা যায়, সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরকৃত কৌশল সকলের সমালোচনা করিলে অনেক দোষ বাহির হয়। এই মনুষ্যদেহের নির্ম্মাণে কত কৌশল, কত শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে, কত যত্নে তাহা রক্ষিত হইয়া থাকে! কিন্তু যাহাতে এত কৌশল, এত শক্তিব্যয়, এত যত্ন, তাহা ক্ষণ ভঙ্গুর—কখন অধিক কাল থাকে না। যিনি এত কৌশল করিয়া ক্ষণভঙ্গুরতা বারণ করিতে পারেন নাই, তিনি সকল কৌশল জানেন না—সর্ব্বজ্ঞ নহেন। দেখ, জীবশরীর কোন স্থানে ছিন্ন হইলে, তাহা পুনঃ সংযুক্ত হইবার কৌশল আছে; উহাতে বেদনা হয়, পূঁজ হয়, এবং সেই ব্যাধির ফলে পুনঃসংযোগ ঘটে। কিন্তু সেই ব্যাধি পীড়াদায়ক। যাহার প্রণীত কৌশল, উপকারার্থ প্রণীত হইয়াও পীড়াদায়ক, তাঁহার কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে। যাঁহার কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে, তাঁহাকে কখন সর্ব্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে না।

ইহাও মিল স্বীকার করেন যে এমতও হইতে পারে, যে এই অসম্পূর্ণতা শক্তির অভাবের ফল—অসর্ব্বজ্ঞতার ফল নহে। অতএব ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইলেও হইতে পারেন।

যদি ইহাই বিশ্বাস কর, যে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, তবে এই এক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যে কে ঈশ্বরের শক্তির প্রতিবন্ধকতা করে? মনুষ্যাদি যে সর্ব্বশক্তিমান্ নহে, তাহার কারণ তাহাদিগের শক্তির প্রতিবন্ধক আছে। তুমি যে হিমালয় পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া সাগর পারে নিক্ষেপ করিতে পার না—তাহার কারণ মাধ্যাকর্ষণ তোমার শক্তির প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। শক্তির প্রতিবন্ধক না থাকিলে, সকলেই সর্ব্বশক্তিমান্ হইত। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে, যে তাঁহার শক্তির প্রতিবন্ধক কেহ বা কিছু আছে। সেই প্রতিবন্ধক কি? কোন্ বিঘ্নের জন্য সর্ব্বজ্ঞতা তাঁহার অভিপ্রেত কৌশল নির্দ্দোষ করিতে পারেন নাই?

এই সম্বন্ধে দুইটি উত্তর হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন যে, দেখ, ঈশ্বর নির্ম্মাতা মাত্র, তিনি যে স্রষ্টা এমত প্রমাণ তুমি কিছুই পাও নাই। তুমি তাঁহার নির্ম্মাণ প্রণালী দেখিয়াই তাঁহার অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছ; কিন্তু নির্ম্মাণ প্রণালী হইতে কেবল নির্ম্মাতাই সিদ্ধ হইতে পারেন, স্রষ্টা সিদ্ধ হইতে পারেন না। ঘটের নির্ম্মাণ দেখিয়া তুমি কুম্ভকারের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতে পার; কিন্তু কুম্ভকারকে মৃত্তিকার সৃষ্টিকারক বলিয়া তুমি সিদ্ধ করিতে পার না। অতএব এমন হইতে পারে যে ঈশ্বর স্রষ্টা নহেন কেবল নির্ম্মাতা। ইহার অর্থ এই, যে সামগ্রীকে গঠন দিয়া তিনি বর্ত্তমানাবস্থাপন্ন করিয়াছেন, সে সামগ্রী পূর্ব্ব হইতেছিল—ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে। ঘট দেখিয়া কেব

ইহাই সিদ্ধ হয় যে কোন কুম্ভকার মৃত্তিকা লইয়া ঘট নির্ম্মাণ করিয়াছে। মৃত্তিকা তাহার পূর্ব্ব হইতে ছিল, কুম্ভকারের সৃষ্ট নহে, একথা বলা বিচার সঙ্গত হইবে। সেই অসৃষ্ট সামগ্রীই বোধ হয় ঐশী শক্তির সীমা নির্দ্দেশক—তাঁহার শক্তির প্রতিবন্ধক। সেই জাগতিক জড় পদার্থের এমন কোন দোষ আছে, যে তজ্জন্য উহা ঈশ্বরেরও সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত নহে। সেই কারণে বহু কৌশলময় এবং বহু শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরও আপনকৃত কার্য্য সকল সম্পূর্ণ এবং দোষশূন্য করিতে পারেন নাই।

আর একটি উত্তর এই যে ঈশ্বরবিরোধী দ্বিতীয় কোন চৈতন্যই তাঁহার শক্তির প্রতিবন্ধক। যদি নির্ম্মাতার কার্য্য দেখিয়া নির্ম্মাতাকে সিদ্ধ করিলে, তবে তাঁহার কার্য্যের প্রতিবন্ধকতার চিহ্ন দেখিয়াও প্রতিকূলাচারী চৈতন্যেরও কল্পনা করিতে পার। পারসিক দিগের প্রাচীন দ্বৈতধর্ম্ম এইরূপ—তাঁহারা বলেন যে এক জন ঈশ্বর জগতের মঙ্গলে নিযুক্ত—আর এক ঈশ্বর জগতের অমঙ্গলে নিযুক্ত। খ্রীষ্টধর্ম্মে ঈশ্বর ও সয়তানে এই দ্বৈত মত পরিণত।

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে মিল প্রথমোক্ত মতটি অবলম্বন করারই কারণ দর্শাইয়াছেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বপ্রণীত "প্রকৃতি তত্ত্ব" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তিনি দ্বিতীয় মতের পৃষ্ঠরক্ষা করিয়াছেন। সংসার যে অনিষ্টময়, তাহা কোন মনুষ্যকে কষ্ট করিয়া বুঝাইবার কথা নহে—সকলেই অবিরত দুঃখ ভোগ করিতেছেন—এবং পরের দুঃখভোগও দেখিতেছেন। জীবের কার্য্য মাত্রই কেবল দুঃখ মোচনের চেষ্টা। যিনি কেবল জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তৎকর্ত্তৃক এরূপ দুঃখময় সংসার সৃষ্ট হওয়া অসম্ভব। এ সম্বন্ধে কথিত প্রবন্ধ হইতে কয়েক পংক্তির মর্ম্মানুবাদ করিতেছি। মিল বলেন—

"যদি এমন হয়, যে ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন, তবে জীবের দুঃখ যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত, এ সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার নাই।* যাঁহারা

* তৎসম্বন্ধে মিলের কয়েকটি কথা ইংরেজিতেই উদ্ধৃত করিতেছি।

"Next to the greatness of these Cosmic Forces, the quality which most forcibly strikes every one who does not avert his eyes from it is their perfect and absolute recklessness. They go straight to their end, without regarding what and whom they crush on the road. ......In sober truth, nearly all things for which men are hanged or imprisoned for doing to one another are nature's every day performances. Killing, the most criminal act recognised by human laws, Nature does once to every being that lives; and in a large proportion of cases, after protracted tortures such as only the greatest monsters whom we read of ever purposely inflicted on their living fellow-creatures. If, by an arbitrary reservation we refuse to account any thing murder but what abridges a certain term supposed to be allotted to human life,

মনুষ্য প্রতি ঈশ্বরের আচরণের পক্ষ সমর্থন করিতে আপনাদিগকে যোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা মতবৈপরীত্য শূন্য, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, হৃদয়কে কঠিন ভাবাপন্ন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, দুঃখ অশুভ নহে। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বরকে দয়াময় বলায়

nature does also this to all but a small percentage of lives, and does it in all the modes, violent or insidious in which the worst human beings take the lives of one another. Nature impales men, breaks them as if on the wheel, casts them to be devoured by wild beasts, burns them to death, crushes them with stones, like the first Christian Martyr, starves them with hunger, freezes, them with cold, poisons them by the quick or slow venom of her exhalations, and has hundreds of other hideous deaths, such as the ingenious cruelty of a Nabis or a Domitian never surpassed. All this Nature does with the most supercilious disregard both of mercy and of justice, emptying her shafts upon the best and noblest indifferently with the meanest and worst; upon those who are engaged in the highest and worthiest enterpries, and often as the direct consequence of the noblest acts; and it might almost be imagined as a punishment for them. She mows down those on whose existence hangs the well-being of a whole people, perhaps of the prospects of the human race for generations to come, with as little compunction as those whose death is a relief to themselves and to those under their noxious influence. Such are nature's dealings with life. Even when she does not intend to kill, she inflicts the same tortures in apparent wantonness. In the clumsy provision which she has made for that perpetual renewal of animal life, rendered necessary by the prompt termination she puts to it in every individual instance, no hnman being ever comes into the world but another human being is literally stretched on the rack for hours or days, not unfrequently issuing in death. Next to taking life (equal to it according to a high authority) is taking the means by which we live; and nature does this too on the largest scale, and with the most callous indifference. A single hurricane destroys the hopes of a season, a flight of locusts or an inundation desolates a district; a trifling chemical change in an edible root starves a million of people. The waves of the sea, like banditti seize and appropriate the wealth of the rich and the little all of the poor with the same accompaniments of stripping, wounding, and killing as their human prototypes. Every thing in short which the worst men commit either against life or property is perpetrated on a larger scale by natural agents. Nature has Noyades more fatal than those of Carrier; her explosions of fire damp are as destructive as human artillery; her plague and cholera far surpass the poison cups of the Borgias......Anarchy and the Reign of Terror are overmatched in injustice, ruin, and death by a hurricane and a pestilence.—*Mill on Nature*. p. p. 28-31.

এমত বুঝায় না, যে মনুষ্যের সুখ তাঁহার অভিপ্রেত; তাহাতে বুঝায় যে মনুষ্যের ধর্ম্মই তাঁহার অভিপ্রেত; সংসার সুখের হউক না হউক, ধর্ম্মের সংসার বটে। এইরূপ ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, তাহা পরিত্যাগ করিয়াও ইহা বলা যাইতে পারে যে স্থূল কথার মীমাংসা ইহাতে কই হইল? মনুষ্যের সুখ, সৃষ্টিকর্ত্তার যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য যেমন সম্পূর্ণরূপে বিফলীকৃত হইয়াছে, মনুষ্যের ধর্ম্ম তাঁহার যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে সে উদ্দেশ্যও সেইরূপ সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। সৃষ্টি প্রণালী, লোকের সুখের পক্ষে যেরূপ অনুপযোগী, লোকের ধর্ম্মের পক্ষে বরং তদধিক অনুপযোগী। যদি সৃষ্টির নিয়ম ন্যায়মূলক হইত, এবং সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান্ হইতেন, তবে সংসারে যেটুকু সুখ দুঃখ আছে, তাহা ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যে তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্মের তারতম্য অনুসারে পড়িত; কেহ অন্যাপেক্ষা অধিকতর দুষ্ক্রিয়াকারী না হইলে অধিকতর দুঃখভাগী হইত না; অকারণ ভালমন্দ বা অন্যায়ানুগ্রহ সংসারে স্থান পাইত না; সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নৈতিক উপাখ্যানবৎ গঠিত নাটকের অভিনয় তুল্য মনুষ্যজীবন অতিবাহিত হইত। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তাহা যে উপরিকথিত রীতি যুক্ত নহে, এ বিষয়ে কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না; এবং এইরূপ, ইহলোকে যে ধর্ম্মাধর্ম্মের সমুচিত ফল বাকি থাকে, লোকান্তরে তাহার পরিশোধন আবশ্যক, পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইহাই গুরুতর প্রমাণ বলিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এরূপ প্রমাণ প্রয়োগ করায় অবশ্য স্বীকৃত হয়, যে ইহ জগতের পদ্ধতি অবিচারের পদ্ধতি, সদ্বিচারের পদ্ধতি নহে। যদি বল যে ঈশ্বরের কাছে সুখ দুঃখ এমন গণনীয় নহে যে তিনি তাহা পুণ্যাত্মার পুরস্কার এবং পাপাত্মার দণ্ড বলিয়া ব্যবহার করেন, বরং ধর্ম্মই পরমার্থ এবং অধর্ম্মই পরম অনর্থ, তাহা হইলেও নিতান্ত পক্ষে এই ধর্ম্মাধর্ম্ম যাহার যেমন কর্ম্ম তাহাকে সেই পরিমাণে দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। তাহা না হইয়া, কেবল জন্মদোষেই † বহুলোকে সর্ব্ব প্রকার পাপাসক্ত হয়; তাহাদিগের পিতৃ মাতৃ দোষে, সমাজের দোষে, নানা অলঙ্ঘ্য ঘটনার দোষে, এরূপ হয়;—তাহাদের নিজদোষে নহে। ধর্ম্ম প্রচারক বা দার্শনিক দিগের ধর্ম্মোন্মাদে শুভাশুভ সম্বন্ধে যে কোন প্রকার সঙ্কীর্ণ বা বিকৃত মত প্রচার হইয়া থাকুক না কেন, কোন প্রকার মতানুসারেই প্রাকৃতিক শাসন প্রণালী দয়াবান্ ও সর্ব্বশক্তিমানের কৃত কার্য্যানুরূপ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারিবে না।" ‡

এই সকল কথা বলিয়া মিল যাহা ব-

† খ্রীষ্টান ইউরোপে এ কথার উত্তর নাই। পুনর্জ্জন্মবাদী হিন্দুর হাতে মিল তত সহজে নিস্তার পাইতেন না।

‡ *Mill on Nature.* p. p. 37-38

লিয়াছেন, তাহার এমত অর্থ করা যায়, যে এই জগতের নির্ম্মাতা বা পালন কর্ত্তা হইতে পৃথক্ শক্তির দ্বারা জীবের ধ্বংস বা অনিষ্ট সম্পন্ন হইতেছে। এরূপ মত সুসঙ্গত। মিল, এরূপ মত, ইঙ্গিতেও ব্যক্ত করিয়াছেন কি না, তাহা তাঁহার জীবনচরিত যে না পড়িয়াছে, তাহার সংশয় হইতে পারে। এজন্য ইংরেজি হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

"The only admissible moral theory of Creation is that the principle of good *cannot* at once and altogether subdue the powers of evil, either physical or moral; *could not place mankind in a world* free from the necessity of an incessant struggle with the maleficent powers, or make them victorious in that struggle, but could and did make them capable of carrying on the fight with vigour and with progressively increasing success. Of all the religious explanations of the order of nature, this alone is neither contradictory to itself, nor to the facts for which it attempts to account."*

যদি এ কথার কোন অর্থ থাকে, তবে সে অর্থ এই যে, জগতের পালনকর্ত্তা, এবং সংহারকর্ত্তা স্বতন্ত্র, এমত কথা অসঙ্গত নহে। ইহার উপর যদি এক জন পৃথক্ স্থষ্টিকর্ত্তা পাওয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি পাওয়া গেল।

মিলে তাহা পাওয়া যাইবে না, মিল হিন্দু নহেন, হিন্দুর পক্ষসমর্থন জন্য লিখেন নাই। তিনি নির্ম্মাণ কৌশল হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন, নির্ম্মাতা ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা মানেন না। কিন্তু বিজ্ঞানে বলে, জীবের জন্ম নির্ম্মাণ মাত্র; ভৌতিক পদার্থের সমবায় বিশেষ জীবত্ব। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখি—জীব উদ্ভিদ্ বায়ু বারি মৃৎপ্রস্তরাদি, সকলই সেই রূপে নির্ম্মিত; পৃথিবীও তাই; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, নক্ষত্র, নীহারিকা, সকলই নির্ম্মিত। অতএব সকলই সেই নির্ম্মাতার কীর্ত্তি—তাঁহার হস্তপ্রসূত। সচরাচর সৃষ্টিকর্ত্তা যাঁহাকে বলাযায়, ঈদৃশ নির্ম্মাতার সঙ্গে তাঁহার প্রভেদ অল্প। যে আকার শূন্য, শক্তিবিশিষ্ট, পরমাণু সমষ্টিতে এই বিশ্ব গঠিত তাহা নির্ম্মিত কি না—নির্ম্মাতার হস্তপ্রসূত কিনা—তাহার কেহ স্রষ্টা আছেন কিনা, তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব। এই টুকু স্মরণ রাখিয়া, সৃষ্টিকর্ত্তা শব্দের প্রচলিত অর্থে নির্ম্মাতাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যাইতে পারে। তাহা হউক বা না হউক, ঈদৃশ স্রষ্টার সঙ্গেই ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের নিকট সম্বন্ধ। অতএব তাঁহাকে পাইলেই আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।

মিল বলেন, তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত। তবে মিল, নির্ম্মাতা এবং পালন

* *Mill on Nature*...p. p. 38-39.

বা রক্ষাকর্ত্তার মধ্যে প্রভেদ করেন না। ইউরোপে, কেহ এরূপ প্রভেদ স্বীকার করে না। এরূপ স্বীকার না করিবার কারণ ইহাই দেখা যায়, যে জন্মও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল, রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল; যে নিয়মাবলীর ফল জন্ম বা সৃজন, সেই নিয়মাবলীর ফল রক্ষা। অতএব যিনি জন্ম, নির্ম্মাণ, বা সৃষ্টির নিয়ন্তা, তিনিই রক্ষা বা পালনেরও নিয়ন্তা ইহা সিদ্ধ।

কিন্তু ধ্বংস সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল; সংহারও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল। যে সকল নিয়মের ফল রক্ষা, সেই সকল নিয়মেরই ফল ধ্বংস। যে রাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণে জীবের দেহ রক্ষিত হয়, সেই রাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণেই জীবের দেহ লয়প্রাপ্ত হয়। যে অম্লজানের সংযোগে জীবের দেহ প্রত্যহ গঠিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে—শেষ দিনে সেই অম্লজান সংযোগেই তাহা নষ্ট হইবে। অতএব যিনি পালনের নিয়ন্তা, তিনিই যে সংহারের নিয়ন্তা ইহাও সিদ্ধ।

তবে, পালনকর্ত্তা চৈতন্য সংহারকর্ত্তা চৈতন্য পৃথক্, একপ বিবেচনা অসঙ্গত নহে, একথা বলিবার কারণ কি? কারণ এই, যে যিনি পালনকর্ত্তা, তাঁহার অভিপ্রায় যে জীবের মঙ্গল, জগতে ইহার বহুতর প্রমাণ দেখা যায়। কিন্তু মঙ্গল তাঁহার অভিপ্রেত হইলেও অমঙ্গলেরই আধিক্য দেখা যায়। যাঁহার অভিপ্রায় মঙ্গলসিদ্ধি, তিনি আপনার অভিপ্রায়ের প্রতিকূলতা করিয়া অমঙ্গলের আধিক্যই সিদ্ধকরিবেন, ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। এই জন্য সংহার যে পৃথক্ চৈতন্যের অভিপ্রায় বা অধিকার, একথা অসঙ্গত নহে বলা হইয়াছে।

তবে এরূপ মতের স্থূল কারণ, পালনে ও ধ্বংসে দৃশ্যমান অসঙ্গতি। সৃজন ও পালনে যদি এইরূপ অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায়, তবে স্রষ্টা, ও পাতা পৃথক্, এরূপ মতও অসঙ্গত বোধ হইবে না।

সৃজনে ও পালনে এরূপ অসঙ্গতি আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে। নহিলে ডার্বিনের "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" পরিত্যাগ করিতে হয়। যে মতকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বলে, তাহার মূলে এই কথা আছে, যে, যে পরিমাণে জীব সৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে কখন রক্ষিত বা পালিত হইতে পারে না। জীবকুল অত্যন্ত বৃদ্ধিশীল—কিন্তু পৃথিবী সঙ্কীর্ণা। সকলে রক্ষিত হইলে, পৃথিবীতে স্থান কুলাইত না, পৃথিবীতে উৎপন্ন আহারে তাহাদের পরিপোষণ হইত না। অতএব, অনেকেই জন্মিয়াই বিনষ্ট হয়—অধিকাংশ অণ্ডমধ্যে বা বীজে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যাহাদিগের বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক প্রকৃতিতে এমন কিছু বৈলক্ষণ্য আছে, যে তদ্দারা তাহারা সমাবস্থাপন্ন জীবগণ হইতে আহার সংগ্রহে,

কিম্বা অন্য প্রকারে জীবন রক্ষায় পটু, তাহারাই রক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, অন্য সকলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। মনে কর যদি কোন দেশে বহুজাতীয়, এরূপ চতুষ্পদ আছে, যে তাহারা বৃক্ষের শাখা ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহা হইলে যাহাদিগের গলদেশ ক্ষুদ্র, তাহারা কেবল সর্ব্বনিম্নস্থ শাখাই ভোজন কবিতে পাইবে, যাহাদের গলদেশ দীর্ঘ তাহারা নিম্নস্থ শাখাও খাইবে তদপেক্ষা উর্দ্ধস্থ শাখাও খাইতে পারিবে। সুতরাং যখন খাদ্যের টানাটানি হইবে—সর্ব্বনিম্নস্থ শাখা সকল ফুরাইয়া যাইবে, তখন কেবল দীর্ঘস্কন্ধরাই আহার পাইবে—হ্রস্বস্কন্ধরা অনাহারে মরিয়া যাইবে বা লুপ্তবংশ হইবে। ইহাকেই বলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। দীর্ঘস্কন্ধেরা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে রক্ষিত হইল। হ্রস্বস্কন্ধের বংশলোপ হইল।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের মূল ভিত্তি এই যে যত জীব সৃষ্ট হয়, তত জীব কদাচ রক্ষা হইতে পারে না। পারিলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রয়োজনই হইত না। দেখ একটি সামান্য বৃক্ষে কত সহস্র২ বীজ জন্মে; একটি ক্ষুদ্র কীট, কত শত২ অণ্ড প্রসব করে। যদি সেই বীজ, বা সেই অণ্ড, সকল গুলিই রক্ষিত হয়, তবে অতি অল্পকাল মধ্যে সেই এক বৃক্ষেই, বা সেই একটি কীটেই পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়, অন্য বৃক্ষ বা অন্য জীবের স্থান হয় না। যদি কোন কীট প্রত্যহ দুইটি অণ্ড প্রসব করে, (ইহা অন্যায় কথা নহে) তবে দুই দিনে সেই কীট-সন্তান হইতে চারিটি, তিন দিনে আটটি, চারি দিনে, ষোলটি, দশ দিনে সহস্রাধিক, এবং বিশ দিনে দশ লক্ষের অধিক কীট জন্মিবে। এক বৎসরে কত কোটি কীট হইবে তাহা শুভঙ্কর হিসাব করিয়া উঠিতে পারেন না। মনুষ্যের বহুকাল বিলম্বে এক একটি সন্তান হয়, এক দম্পতি হইতে চারি পাঁচটি সন্তানের অধিক নচরাচর হয় না; অনেকেই মরিয়া যায়; তথাপি এমন দেখা গিয়াছে যে, পঁচিশ বৎসরে মনুষ্য সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। যদি সর্ব্বত্র এই রূপ বৃদ্ধি হয় তবে, হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, সহস্র বৎসর মধ্যে পৃথিবীতে মনুষ্যের দাঁড়াইবার স্থান হইবে না। হস্তীর অপেক্ষা অল্পপ্রসবী কোন জীবই নহে, মনুষ্যও নহে কিন্তু ডার্বিন হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে অতি ন্যূনকল্পেও এক হস্তিদম্পতি হইতে ৭৫০ বৎসরমধ্যে এক কোটি নবতি লক্ষ হস্তী সম্ভূত হইবে। এমন কোন বর্ষজীবী বৃক্ষ নাই যে তাহা হইতে বৎসরে দুইটি মাত্র বীজ জন্মে না। লিনিয়স হিসাব করিয়াছেন যে, যে বৃক্ষে বৎসরে দুইটি মাত্র বীজ জন্মে, সকল বীজ রক্ষা পাইলে, তাহা হইতে বিংশতি বৎসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হইবে।*

এক্ষণে পাঠক ভাবিয়া দেখুন একটি বার্ত্তাকু বৃক্ষে কতগুলি বার্ত্তাকু—পরে ভাবুন বার্ত্তাকুতে কতগুলি বীজ থাকে।

* *Origin of Spicies*—6th *Edition.* p. 51.

তাহা হইলে একটি বার্ত্তাকু বৃক্ষে কত অসংখ্য বীজ জন্মে তাহা স্থির করিবেন। সকল বীজ রক্ষা হইলে,যেখানে বার্ষিক দুইটি বীজ হইতে বিংশতি বৎসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হয়, সেখানে বৎসর২ প্রতি বৃক্ষের সহস্র২ বার্ত্তাকু বীজে বিংশতি বৎসরে কত কোটি কোটি কোটি বার্ত্তাকু বৃক্ষ হইবে, তাহা কে মনে ধারণা করিতে পারে? সকল বীজ রক্ষা পাইলে, কয় বৎসর পৃথিবীতে বার্ত্তাকুর স্থান হয়?

চেতন সম্বন্ধেও ঐরূপ। যে পরিমাণে সৃষ্টি, তাহার সহস্রাংশ রক্ষিত হয় না। যদি স্রষ্টা এবং পালনকর্ত্তা এক, তবে তিনি যাহার পালনে অশক্ত তাহা এত প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি করেন কেন? জীবের রক্ষা যাঁহার অভিপ্রায়, তিনি অরক্ষণীয়ের সৃষ্টি করেন কেন? ইহাতে কি অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায় না? ইহাতে কি এমত বোধ হয় না, যে স্রষ্টা ও পাতা এক, একথা না বলিয়া, স্রষ্টা পৃথক্ পাতা পৃথক্ একথা বলাই সঙ্গত?

ইহার একটি উত্তর আছে—জীব ধ্বংসেরজন্য একজন সংহার কর্ত্তা কল্পনা করিয়াছ। সৃষ্ট জীবের ধ্বংস তাঁহার কার্য্য —যত সৃষ্টি হয় তত যে রক্ষা হয় না, ইহা তাঁহারই কার্য্য। পাতা এবং সৃষ্টিকর্ত্তা এক, কিন্তু তিনি যত সৃষ্টি করেন, তত যে রক্ষা করিতে পারেন না, তাহার কারণ এই সংহার কর্ত্তার শক্তি। নচেৎ সকলের রক্ষাই যে তাঁহার অভিপ্রায় নহে, এমত কল্পনীয় নহে। যেখানে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, কল্পনা* করিয়াছ, সেখানে তিনি যে সকলকে রক্ষা করিতে পারেন না, ইহাই বলা উচিত; সকলের রক্ষা যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে ইহা বলিতে পার না। উত্তর এই।

ইহার ও প্রত্যুত্তর আছে। জগতের অবস্থা, জগতে যে সকল নিয়ম চলিতেছে, সে সকলের অথবা সেই সংহারিকাশক্তির আলোচনা করিলে ইহাই সহজে বুঝা যায়, যে এজগতে অপরিমিত সংখ্যক জীব রক্ষণীয় নহে—অতএব অপরিমিত জীবসৃষ্টি নিষ্ফল। সামান্য মনুষ্যের সামান্য বুদ্ধি দ্বারা একথা প্রাপণীয়। অতএব যিনি স্রষ্টা ও পাতা, তিনিও ইহা অবশ্য বিলক্ষণ জানেন। না জানিলে তিনি মনুষ্যাপেক্ষা অদূরদর্শী। কিন্তু তিনি কৌশলময় —জীবস্বজন প্রণালী অপূর্ব্ব কৌশলসম্পন্ন, ইহার ভূরি২ প্রমাণ আছে। যাঁহার এত কৌশল তিনি কখনও অদূরদর্শী হইতে পারেন না। যদি তাঁহাকে অদূরদর্শী বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই সকল কৌশল যে চৈতন্য প্রণীত একথা আর বলিতে পারিবে না, কেন না অদূরদর্শী চৈতন্য হইতে সেরূপ কৌশল অসম্ভব। তবে, বলিতে হইবে যে তিনি জানিয়া নিষ্ফল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত। দূরদর্শী চৈতন্য যে নিষ্ফল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। কারণ নিষ্ফলতা বুদ্ধি বা প্রবৃত্তির লক্ষ্য হইতে পারে না।

অতএব ইহা সিদ্ধ, যিনি পালন কর্ত্তা,

অপবিমিতজীব সৃষ্টি তাঁহার ক্রিয়া নহে। এজন্য পালনকর্ত্তা হইতে পৃথক্ চৈতন্যকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কল্পনা কবা অসঙ্গত নহে।

ইহাতেও আপত্তি হইতে পাবে, যে, স্রষ্টা ও পাতা পৃথক্ স্বীকাব কবিলেও অবশ্য স্বীকাব কবিতে হইতেছে, যে স্রষ্টা নিষ্ফল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত; চৈতন্য নিষ্ফল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পাবে না, এ আপত্তিব মীমাংসা কই হইল? সত্য কথা, কিন্তু বিবেচনা কবিযা দেখ যে, পাতা হইতে স্রষ্টা যদি পৃথক্ হইলেন, তবে সৃষ্ট জীবেব বক্ষা তাঁহাব উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা কবিবাব আব কাবণ নাই। সৃষ্টি তাঁহাব এক মাত্র অভিপ্রায, এবং সৃষ্টি হইলেই তাঁহাব অভিপ্রাযেব সফলতা হইল—বক্ষা না হইলেও সে অভিপ্রায়েব নিষ্ফলতা নাই।

অতএব, স্রষ্টা, পাতা, এবং হর্ত্তা, পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্য এমত বিবেচনা কবা, অসঙ্গত এবং প্রমাণবিরুদ্ধ নহে—ইহাই হিন্দুধর্ম্মেব নৈসর্গিক ভিত্তি, এবং এই স্রষ্টা পাতা ও হর্ত্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বব বলিযা পবিচিত। কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে আমাদের কযেকটি কথা বলিবাব আছে।

প্রথম, আমবা বলিতেছি না যে এই ত্রিদেবের উপাসনা এই রূপে ভাবতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছে। আমবা এমত বিশ্বাস কবি না যে ভারতীয় ধর্ম্মস্থাপকগণ এই রূপ বৈজ্ঞানিক বিচাব কবিয়া ত্রিদেবেব কল্পনায উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাদিগের উৎপত্তি বেদগীত বিষ্ণু রুদ্রাদি হইতে। বৈদিক বিষ্ণু রুদ্রাদি বৈজ্ঞানিক সম্পন্ন নহে, ইহাব যথেষ্ট প্রমাণ বেদেই আছে। কিন্তু পাতৃত্ব হর্ত্তৃত্ব স্রষ্টৃত্বের সূচনাও বেদে আছে। তবে অদ্বিতীয় দর্শনশাস্ত্রবিৎ ভাবতীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এই ত্রিদেবোপাসনা গৃহীত হইয়া ছিল, জন সাধাবণে উহা বদ্ধমূল, ইহাতে অবশ্য এমত বিবেচনা কবা কর্ত্তব্য যে উহাব সুদৃঢ় নৈসর্গিক ভিত্তি আছে। লোকবিশ্বাসেব সেই গূঢ় নৈসর্গিক ভিত্তি কি তাহাই আমবা দেখাইলাম।

আমাদিগেব দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, এই ত্রিদেবোপাসনাব নৈসর্গিক ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু আমবা এমত কিছু লিখি নাই এবং বিচাবেও এমত কোন কথাই পাওযা যায় না, যে তদ্দ্বাবা এই ত্রিদেবেব অস্তিত্ব বিজ্ঞানের দ্বাবা প্রমাণীকৃত বলিযা স্বীকাব কবা যাব। প্রমাণে দুইটি গুরুতব ছিদ্র লক্ষিত হয।

প্রথম এই, যে জগতেব নির্ম্মাণ কৌশলে চৈতন্যযুক্ত নির্ম্মাতাব অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে এই কথা স্বীকাব কবাতেই ত্রিদেবেব অস্তিত্ব সঙ্গত বলিয়া সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম সূত্রটি ভ্রান্তিজনিত: প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনেব ফলকেই নির্ম্মাণকৌশল বলিয়া আমাদিগের ভ্রম হয়; সেই ভ্রান্ত জ্ঞানেই আমরা নির্ম্মাতাকে সিদ্ধ কবিয়াছি। নচেৎ নির্ম্মাতার অস্তিত্বের নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। নির্ম্মাতাব অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই আমরা

সংহার কর্ত্তা, এবং পৃথক্২ স্রষ্টা পাতা পাইয়াছি। যদি নির্ম্মাতার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, তবে ত্রিদেবের মধ্যে কাহারও অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই।

দ্বিতীয় দোষ এই, যে সৃজন পালন সংহার, একই নিয়মাবলীর ফল। বিজ্ঞান ইহাই শিখাইতেছে যে, যে২ নিয়মের ফলে সৃজন, সেই২ নিয়মের ফলে পালন, সেই২ নিয়মের ফলে ধ্বংস।' নিয়ম যেখানে এক, নিয়ন্তা সেখানে পৃথক্ সঙ্কল্প করা প্রামাণ্য নহে। আমরা কোথাও বলি নাই যে তাহা প্রামাণ্য। আমরা কেবল বলিযাছি যে, তাহা অপ্রামাণ্য বা অসঙ্গত নহে, সঙ্গত। যাহা প্রমাণ বিরুদ্ধ নহে, বা যাহা কেবল সঙ্গত, তাহা সুতরাং প্রামাণিক, ইহা বলা যাইতে পারে না।

আমাদিগের তৃতীয় বক্তব্য এই যে, ত্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও, তাঁহাদিগকে সাকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পুরাণেতিহাসে যে সকল আনুষঙ্গিক কথা আছে, তৎপোষকে কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রত্যেকেই কতক গুলি অদ্ভুত উপন্যাসের নায়ক। সেই সকল উপন্যাসের তিলমাত্র নৈসর্গিক ভিত্তি নাই। যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে বিশ্বাস করেন, তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিতে পারি না; কিন্তু তাই বলিয়া পুরাণেতিহাসে বিশ্বাসের কোন কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি না।

চতুর্থ, ত্রিদেবের অস্তিত্বের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, ইহা যথার্থ, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে মহাবিজ্ঞানকুশলী ইউরোপীয় জাতির অবলম্বিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মাপেক্ষা, হিন্দুদিগের এই ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানসঙ্গত এবং নৈসর্গিক। ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানমূলক না হউক, বিজ্ঞান বিরুদ্ধ নহে। কিন্তু এক জন সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, এবং দয়াময় ঈশ্বরে বিশ্বাস যে, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, তাহা উপবিকথিত মিলকৃত বিচারে সপ্রমাণ হইয়াছে।

পঞ্চম, অনেকের বোধ হইবে যে এ সকল কথায় আমরা উপধর্ম্মের পক্ষ সমর্থন করিতেছি। কিন্তু প্রচলিত একেশ্বরবাদ যে উপধর্ম্ম নহে একথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। আমাদিগের বিবেচনায় ত্রিদেবোপসনাও উপধর্ম্ম, প্রচলিত একেশ্বরবাদও উপধর্ম্ম, এবং নাস্তিকতাও উপধর্ম্ম। হইতে পারে একোপাসনাই প্রকৃত ধর্ম্ম,—আমরা সে কথা অপ্রমাণ করিতে পারি না। আমরা কেবল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেরই সন্ধান করিয়াছি; এবং বিজ্ঞান ত্রিদেবের অপেক্ষা সর্ব্বশক্তিমান্ একেশ্বরে অধিক আদর করেন না ইহা দেখাইয়াছি। তবে যদি কেহ বলেন যে বিজ্ঞানের কাছে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিব না, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই।

ষষ্ঠ। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ সংস্কারে নিযুক্ত, তাঁহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে একেশ্বরবাদের পুনরুজ্জীবন অপেক্ষা, ত্রিদেবোপাসনার পুনরুজ্জীবন অধিক সহজ, বিজ্ঞানসঙ্গত, এবং লোকানুমত হয় কি না?

সপ্তম। এই প্রবন্ধে অনেক স্থানে এমত কথা আছে যে তদ্দ্বারা অনেকে বুঝিতে পারেন, যে ঈশ্বর বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নহে। বস্তুতঃ এ কথা আমরা বলি নাই, তাহা অভিপ্রেতও নহে। সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, দয়াময় এবং প্রবৃত্তিশালী ঈশ্বরই বিজ্ঞানের দ্বারা অসিদ্ধ, ইহাই আমরা বলিয়াছি। জগতের নির্ম্মার্তা বিজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ নহেন। কিন্তু বিজ্ঞানে ইহা পদে২ প্রমাণীকৃত হইতেছে যে এই জগৎ ব্যাপিয়া, সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে, এক অনন্ত, অচিন্তনীয়, অজ্ঞেয় শক্তি আছে—ইহা সকলের কারণ, বহির্জ্জগতের অন্তরাত্মা স্বরূপ। সেই মহাবলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা দূরে থাকুক, আমরা তদুদ্দেশে ভক্তিভাবে কোটি কোটি কোটি প্রণাম করি। আমরা ত্রিদেবের উপাসক নহি।

সুখচর।

যথা রম্য মরুদ্বীপ মরু ভূমি মাঝে
জুড়ায় পথিক আঁখি শ্যামল শোভায়,
এ স্মৃতি নয়ন পথে তুমিও তেমনি,
সুখধাম সুখচর—সতত সুন্দর!

তব সেই সরোবর—কুসুম কানন—
বিশাল রসাল রাজী—চির দিন তরে
কে যেন রোপেছে আনি হৃদয়ে আমার!
যখনি সংসার তাপে জ্বলে এ অন্তর
ফিরাই কাতর আঁখি জুড়াইতে জ্বালা,
অমনি নয়নে ভাসে সেই সব শোভা;
সমীরণ আন্দোলিত কুসুম, পল্লব,
সরসী শীতল বারি, তৃণ সুশ্যামল।
বহুদিন হল আজি,—এখনো তেমনি,—
নারিব ভুলিতে তোমা থাকিতে জীবন!

আর কি আসিবে ফিরে সে সুখ সময়?
জানি না অদৃষ্টে মম লিখেছে কি বিধি!
আর কি ভ্রমিব আমি সে ফুল্ল হৃদয়ে
মধুর বিজন স্থানে—বৃক্ষাবলিমাঝে?
মরি কি সুখের দিন গিয়াছে চলিয়া!
স্মৃতি মাত্র রেখে গেছে তুষিতে হৃদয়!

মধুর বসন্ত নিশি—প্রভাত মধুর—
মধুর ঘুমের ঘোরে পশিত শ্রবণে
অস্ফুট বিহঙ্গ-কুল-কাকলি-লহরী,
বাতায়ন সন্নিহিত শাখা দল হতে
মাঝে মাঝে সকরুণ "বউ কথা কও"—

"বউ কথা কও" রবে ব্যথিত হৃদয়—
ভাবিতাম এত কিরে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা—
এত যদি বাজে প্রাণে তবে কি কারণ—
মিছা দোষে—মিছা ভ্রমে—মানেতে মজিয়ে
প্রিয়জনে প্রিয়জন দেয় এ যাতনা?

শুনিতাম সুখে শুয়ে এ সকল রব
নীরব সময়ে সেই; প্রভাত সমীর—

গঙ্গার তরঙ্গ-ভঙ্গ নির্জ্জন পুলিনে—
'অবিরাম সেই ধ্বনি স্বপনের মত'
মিশায়ে মধুর ভাবে স্বচ্ছ স্ফটিকের
দুল্যমান ঝালরের ঠুন্ ঠুন্ রবে,
ধীরে ধীরে প্রবেশিত শ্রবণ কুহরে;—
আবার ঘুমের ঘোরে মুদিতাম আঁখি।

ক্রমে দিক্ পরিষ্কার;—বিহঙ্গ কূজন,
গ্রামবাসি-কোলাহল, বাড়িতে লাগিল;
মাঝে মাঝে যাত্রী তরে নাবিক চীৎকার
শুনাযায় মুহু র্মুহু জাহ্নবী উপরে।—
এইরূপে পোহাইত সুখদ যামিনী।

উষার কোমল বিভা শোভিলে গগনে
যেতাম প্রফুল্ল মনে ভাগীরথী কূলে
দেখিতে তরঙ্গ-রঙ্গ প্রভাত সমীরে—
প্রকৃতির চারু শোভা ভুঞ্জিতে বিরলে।

ক্রমেতে উঠিত রবি কিরণ বিস্তারি,—
কষিত কাঞ্চন যেন সোহাগে গলায়ে
ঢালিত গগন গায় পূর্ব্বদিক্ ব্যাপি,
নির্ম্মল সরসী জলে—শ্যামল পাতায়
সুবর্ণ বারির ছটা দিত ছড়াইয়া;
অবশেষে তটিনীর তরঙ্গ নিকরে
অযুত তপন-রশ্মি পড়িত আসিয়া—
সেই সে সুবর্ণ রাগে হইয়া জড়িত
অসংখ্য লহরী মালা ঝিক্ মিক্ করি
নাচিতে লাগিত রঙ্গে জাহ্নবী-হৃদয়ে।
ক্রমে সেই রবিকর হইলে প্রখর,
পশিতাম হৃষ্ট মনে আপন মন্দিরে।
পুরাতন বাটী সেই তটিনী-পুলিনে,
তিন দিকে লতা পাতা কুসুম উদ্যান,
পশ্চিমে সরিৎগঙ্গা—সোপান উপরে
লৌহময় দ্বার তায় প্রবেশিতে পুরে।—
রম্য স্থান—রম্য বাটী—রম্য সে তটিনী,
জীবন স্বপনমত বহি যায় হেথা!

মধ্যাহ্ন-মিহির-করে ধরণী যখন
জ্বলন্ত অনল রূপ করিত ধারণ,
নীরব বিহঙ্গ যত,—কেবল কোথাও
অমঙ্গলরূপী সেই কালান্ত-বাহন
বায়সের কা! কা! রব—তৃষিত চাতক
সকাতর মৃদুস্বর সুদূর হইতে
অবিরত প্রবেশিত শ্রবণ কুহরে,;
জুড়াতে নিদাঘ জ্বালা বসিতাম গিয়া
বিশাল-রসাল-মূলে নির্জ্জন কাননে।
পার্শ্বে স্বচ্ছ সরোবর—তাহার পুলিনে
সুশ্যামল তৃণদল দুলিছে বাতাসে—
দুলিছে পল্লব-কুল—লাগিছে অঙ্গেতে
শীতল দক্ষিণ-বায়ু ঝুর্ ঝুর্ করি—
নীরবে ঝরিছে পাতা—ধরিছে ধরণী—
জগত জীবের মাতা—যতনে অঙ্কেতে।
মর্ মর্ পত্র শব্দে—শীতল ছায়ায়,
মুদি আঁখি দেখিতাম কতই স্বপন—
কতই কোমল ভাব উঠিত এমনে—
কেমনে-কাহারে-আমি কহিব প্রকাশি—
বুঝিবে বা কেবা। জ্বলিলে সংসারতাপে,
হৃদয় জ্বালায় যদি যাই কার কাছে—
প্রিয়জন, প্রিয়বন্ধু, প্রিয় সহবাসে
দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে সে জ্বালা আমার!
শুদ্ধ মা তোমার শান্ত শ্যামল মূরতি
দেখিলে নয়নে মোর জুড়ায় জীবন!
আর কিছু এসংসারে ভাল নাহি লাগে!

বৃক্ষ-অন্তরালে ক্রমে নামিলে তপন,
ব্যাপিলে সুখদ ছায়া ধরণী অঙ্গেতে,
উঠিতাম তথা হতে। সরসী উত্তরে
আছে এক তীর্থরম্য, পূর্ব্ব পাশে তার
একটি বকুল গাছ,—দেখিতে সুন্দর,
নিবিড় পাতায় ঢাকা, নবীন বয়স,
অসংখ্য বকুল ফল রাঙ্গা রাঙ্গা তায়;
নীল, পীত, নানাবর্ণ ক্ষুদ্র পাখী কত
রাঙ্গা ফল লোভে আসি বকুল শাখায়
বসিয়া মনের সুখে গায় নিরন্তর!
এই তরুতলে আসি বসিয়া তখন,
শীতল সলিল মাখা মন্দ সমীরণ
সেবিতাম মন সুখে সোপান উপরে,
দেখিতাম স্বচ্ছ জলে মৎস্যদের ক্রীড়া,
মৎস্যরঙ্ক-মৎস্যধরা—আরো শোভা কত
মধুর শীতল ভাব উপজিত মনে।

পরে বেলা ঝিক্ মিক্ করিয়া আসিলে
ত্যজি সে বকুল তরু, ত্যজি সরোবর
যেতাম জাহ্নবী কূলে মনের আনন্দে
দেখিতে তপন অস্ত তরঙ্গিণী পারে,
দ্বাদশ মন্দির পাছে, অপূর্ব্ব সে দৃশ্য!
প্রাচীন দেউল সেই, কৃষ্ণ শ্বেতবর্ণ—
সম্মুখে দ্বাদশ ক্ষুদ্র পাদপ সুন্দর;
দক্ষিণ বাহিনী গঙ্গা বহিছে নিম্নেতে!
পবিত্র তটিনী বারি—মোক্ষদা মহীতে!
পশ্চাতে বৃক্ষের শ্রেণী সুদূর বিস্তৃত।
দেখেছে যে এক বার এই রম্য স্থানে
রবি অস্ত শোভা, নারিবে ভুলিতে কভু।
এক দিন সূর্য্য অস্ত দেখিবার আশে
গেলেম গঙ্গার কূলে, দেখিনু গগনে
নাহিক তপন; শুদ্ধ নীল মেঘ যত
নিবিড় ব্যাপিয়া নভে বহ্নি প্রান্ত প্রায়;
আগের নক্ষত্র এক দেখিনু সহসা
ফুটিয়া নীরদ চাঁদ জ্বলিতে লাগিল;
বিস্ময় হইনু হেরি সে দৃশ্য গগনে!
ক্রমশঃ বাড়িল তারা বোধ হ'ল যেন
অগ্নিময় রাজ্য এক আছে মেঘ পাছে।
তপন মণ্ডল শেষে হইল বাহির!
চারিদিকে নীল মেঘ, সে মেঘের গায়
সুদীর্ঘ সুবর্ণ ছটা পড়েছে আসিয়া।
ক্রমে নীল তল হতেগোলাপরঞ্জিত
বিচিত্র গগন গায় নামিল তপন,
সুবর্ণের চাপ্ যেন—মধ্যদেশ তার
বিভক্ত শ্যামল মেঘে, দৃশ্য মনোহর!
অবশেষে তাম্র বর্ণ ধরিয়া তপন
ডুবিল মন্দির পাছে দেখিতে দেখিতে।

দিবা অবসান। ক্রমে আইল যামিনী;
পক্ষিগণ নিজ নিজ কুলায় পশিল,
সন্ধ্যার উজ্জ্বল মণি শোভিল গগনে;
নৌকায় জ্বলিল দীপ সহস্র আলোক
ভাতিল বিমল জলে জাহ্নবী হৃদয়ে,
শান্ত ভাব ধরি মহী লভিল বিরাম।
হইলে চাঁদনী রাতি, উঠিত যখন
রজতের চাপ সম বৃক্ষ অন্তরালে
ভুবন মোহন সেই সুধাংশু সুন্দর,
হাসিত কুসুম কুল—হাসিত কানন,
হাসিত জাহ্নবী দেবী—হাসিত গগন,
কুসুম স্তবকমাঝে পশিয়া দুজনে
আমিও আমার প্রিয়া—তুলিতাম কত
মল্লিকা, মালতী, যূথি, সুগন্ধী-কুসুম;

সেই সে ফুলের দল একত্র মিশায়ে
মনোহর মালা প্রিয়া গাঁথিত যতনে,
দেখিতাম কাছে বসি কিবা চন্দ্রালোকে
বিমল চন্দ্রিকা মাখা ফুল দল পাশে
প্রেয়সীর মুখচন্দ্র হয়েছে মধুর!
অনিমিষ মুখপানে থাকিতাম চাহি।
অবশেষে সেই মালা দিতাম পরায়ে
দুজনে দুজন- গলে প্রেমের সোহাগে,
হাত ধরা ধরি করি পশিতাম গৃহে।
যথা সেই স্তম্ভ প্রান্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকার,
মর্ম্মর খচিত তল প্রকোষ্ঠ সুন্দর,
বসিতাম গিয়া তথা। সম্মুখে জাহ্নবী,
অবিরাম বীচিরব পশিছে শ্রবণে,
হু হু করি সমীরণ বহিছে তথায়,
উদাস করিছে মন—এসংসার হতে
কোথা যেন অন্তরিত করিয়া রাখিছে।
প্রহরান্তে পশিতাম শয়ন মন্দিরে,
লভিতে সুখদনিদ্রা সুখদ শয্যায়,
দেখিতাম চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল সে গৃহ
নিদ্রিত গৃহস্থ সব—নীরব জগত;
কেবল কখন সুদূর বাজনা শব্দ,
কভু বংশীধ্বনি, কভু নাবিক সঙ্গীত
নিথর আকাশ তলে তুলিছে তরঙ্গ,
মধুর বসন্ত-বায়ু বহিছে মধুর;
অবশেষে নিদ্রাবেশে মুদিয়া নয়ন
সুখের স্বপনস্রোতে যেতাম ভাসিয়া।

কভু বা সন্ধ্যার আগে পশিয়া কাননে
বসিতাম শীলাতলে ভাগীরথী তীরে।
কহিত আমারে প্রিয়া "দেখ কেবা আগে
দেখিবারে পায় তারা একটী আকাশে।"
একদৃষ্টে দুইজনে আকাশের পানে
একটী তারার আশে থাকিতাম চেয়ে,
দেখিলে একটী তারা প্রেয়সী আমার
করতালি দিয়া উঠি সদর্পে কহিত,
"দেখেছি আগেতে তারা ওই যে আকাশে!"
এই মত কত দিন যাপিনু তথায়।
আর কি সুখের দিন আসিবে ফিরিয়া?
না এ জন্মের মত গিয়াছে চলিয়া?

শ্রীগোপাল কৃষ্ণ ঘোষ।

দেবতত্ত্ব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জগতে সজীব নির্জীব দুই প্রকার পদার্থ আছে। সুতরাং বিশ্বকারণসম্বন্ধে কোন রূপ কল্পনা করিতে হইলে, হয় জড়জগৎ নতুবা প্রাণিমণ্ডলী এ দুয়ের মধ্যে একটিকে অবলম্বনভূমি করিতে হয়। জড়জগতের তিমিরহারী আলোকপ্রকাশে এবং প্রাণিমণ্ডলীর জীবোৎপত্তি ব্যাপারে যেরূপ সৃষ্টির ভাব লক্ষিত হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। এ নিমিত্ত এই দুইটী ঘটনা লইয়াই প্রাচীন কালে যথা ক্রমে দেবোপাসনা ও লিঙ্গোপাসনা এই দুই প্রকার উপাসনা পদ্ধতি প্রবর্তিত

হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বেদ, পারস্যের জেন্দাবেস্তা, এবং গ্রীসের ইলিয়ড্ ও ওডিসি, পাঠ করিয়া জানা যায় যে প্রাচীন আর্য্যেরা দেবোপাসক ছিলেন; এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধান দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে কাল্ডীয়, আসিরীয়, মৈসরীয়, ফিনিসীয় প্রভৃতি অনার্য্যজাতিদিগের মধ্যে অতি প্রাচীনকালে লিঙ্গোপাসনা প্রচলিত ছিল।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পার্থিব অগ্নি, অন্তরীক্ষ বিহারী অশনিধারী ইন্দ্র বা বায়ু, এবং আকাশবাসী দিবাকর, বৈদিক সময়ে আর্য্যদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা ছিলেন; এবং অন্য সকল দেবতা তাঁহাদিগেরই রূপান্তর বা নামান্তর বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু কালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠপদে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সৌর প্রকৃতিসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি, এবার শিবের বিষয়ে কয়েকটী কথা বিশেষ করিয়া বলিতে চাই।

বেদে শিব নামে কোন দেবতা দেখা যায় না; কিন্তু মঙ্গলকর অর্থে শিবশব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয়। যখন শিবের ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হয়, যখন তিনি সংহারমূর্ত্তি ধারণ করেন, তখন তাঁহাকে রুদ্র বলে। বেদের অনেক স্থলে রুদ্রের উল্লেখ আছে। সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির ন্যায় রুদ্রের নির্দ্দিষ্ট স্থান বা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নাই। তিনি কখন সূর্য্যরূপী, হেমবর্ণ, রথারূঢ়, ও ধনুঃশরধারী; কখন বায়ুভাবাপন্ন, মরুৎকুলের পিতা ও গিরিশায়ী; কখন অগ্নিমূর্ত্তি, কপর্দ্দী, নীলকণ্ঠ, সিতিকণ্ঠ, সহস্রাক্ষ, বিলোহিত, হিরণ্যপাণি ইত্যাদি। বোধ হয় যেখানে উগ্রতা, প্রচণ্ডতা বা ক্রোধ দৃষ্ট হইত, সেখানেই আদৌ রুদ্র শব্দ প্রযুক্ত হইত। বায়ু ও অগ্নির কোপ সচরাচরই লক্ষিত হয়। সুতরাং বায়ু ও অগ্নি হইতেই রুদ্রের অনেক নাম উৎপন্ন হইয়াছে। প্রচণ্ড ঝটিকায় সহস্র সহস্র গৃহ বৃক্ষ প্রভৃতি সহসা বিনষ্ট হয়, এবং পর্ব্বতশিখরেই প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ বিশেষরূপে অনুভূত হয়; সুতরাং রুদ্র যে মরুৎকুলের পিতা ও গিরিশ বলিয়া উক্ত হইবেন, আশ্চর্য্য নহে। যাঁহারা অগ্নি শিখার আকারের প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে কপর্দ্দী অর্থাৎ জটাধারী, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি নাম কিরূপ সুসঙ্গত। রুদ্রের অষ্টমূর্ত্তি। এই অষ্টমূর্ত্তি সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে একটী উপাখ্যান উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

"অভূদ্বেয়ম্ প্রতিষ্ঠেতি। তদ্ভূমিরভবৎ। তামপ্রথয়ৎ সা পৃথিব্যভবৎ। তস্যামস্যাম্ প্রতিষ্ঠায়াম্ ভূতানি ভূতানাঞ্চ পতিঃ সংবৎসরায়াদিক্ষন্ত। ভূতানাম্ পতির্গৃহ পতিরাসীদুষাঃ পত্নী। তদ্যানি তানি ভূতানি ঋতবস্তে। অথ যঃ স ভূতানাম্ পতি সম্বৎসরঃ সঃ। অথ যা সা উষা পত্নী ঔষসী সা। তানি ইমানি ভূতানি চ ভূতানাঞ্চ পতিঃ সম্বৎসর উষসি রেতোঽসিঞ্চন্। স সম্বৎসরে কুমারোঽ

জায়ত। সোঽরোদীৎ। তাম্ প্রজাপতিরব্রবীৎ "কুমার কিং রোদিসি যচ্ছ্রমাৎ তপসোঽধিজাতোঽসীতি।" সোঽব্রবীৎ 'অনপহতপাপ্মা বাস্মি অহিতনামা নাম মে দেহী' তি।. তস্মাৎ পুত্রস্য জাতস্য নাম কুর্য্যাৎ পাপ্মানমেবাস্য তদপহন্ত্যপি দ্বিতীয়মপি তৃতীয়মভিপূর্ব্বমেবাস্য তৎ-পাপ্মানমপহন্তি। তমব্রবীদ্রুদ্রোঽসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোৎ অগ্নিস্তদ্রূপমভবৎ অগ্নির্বৈ রুদ্রো যদরোদীৎ তস্মাৎ রুদ্রঃ। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ সর্ব্বোঽসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোদাপস্তদ্রূপ মভবন্নাপোবৈ সর্ব্বোঽদ্ভ্যোহি ইদম্ সর্ব্বম্ জায়তে। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ পশুপতিরসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোৎ ওষধয়স্তদ্রূপ মভবন্নোষধযো বৈ পশুপতি স্তস্মাদ্যদা পশব ওষধি র্লভন্তেঽথ পতিয়ন্তি। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ উগ্রোঽসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোৎ বায়ু স্তদ্রূপমভবৎ বায়ুর্বোগ্রস্তস্মাৎ যদা বলবদ্বাতি উগ্রো বাতি ইত্যাহুঃ। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীদশনি রসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোদ্বিদ্যুৎ তদ্রূপ মভবৎ বিদ্যুদ্বা অশনি স্তস্মাদ্যম্ বিদ্যুদ্ হন্ত্যাশনিরবধীদিতি আহুঃ। সোঽব্রবীজ্জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ ভবোঽসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোৎ পর্জ্জন্যস্তদ্রূপ মভবৎ পর্জ্জন্যো বৈভবঃ। পর্জ্জন্যাৎ হীদম্ সর্ব্বম্ ভবতি। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ মহাদেবোঽসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোচ্চন্দ্রমাস্তদ্রূপ মভবৎ প্রজাপতি র্বৈ চন্দ্রমা প্রজাপতি র্বৈ মহান্ দেবঃ। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ ঈশানোঽসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোৎ আদিত্যস্তদ্রূপমভবৎ আদিত্যো বা ঈশান আদিত্যোহি অস্য সর্ব্বস্য ঈষ্টে। সোঽব্রবীৎ এতাবান্বাস্মি মা মেতঃ-পরোনামধেতি। তান্যেতান্যষ্টাবগ্নি রূপাণি কুমারো নবমঃ।"

অর্থাৎ

"এই অধিষ্ঠান ছিল। তাহা ভূমি হইল। তাহা বিস্তৃত করা হইলে পৃথিবী হইল। এই অধিষ্ঠানে ভূত সকল ও ভূত সকলের পতি সম্বৎসর দীক্ষিত হইলেন। ভূতদিগের পতি গৃহপতি ছিলেন, উষা পত্নী। এই যে ভূত সকল তাহারাই ঋতু; এই যে ভূত সকলের পতি সে সম্বৎসর। আর এই যে পত্নী উষা সে ঔষসী। এই ভূত সকলও তাহাদিগের পতি সম্বৎসর উষাতে বীজক্ষেপ করিলেন। সম্বৎসরে কুমার জন্মিল। সে কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে প্রজাপতি বলিলেন, "কুমার কেন কাঁদিতেছ? অনেক শ্রমে ও তপস্যায় তোমার জন্ম।" সে বলিল, "আমার পাপ যায় নাই, আমার নাম নাই, আমাকে নাম

দাও।” ‘এই নিমিত্ত পুত্র জন্মিলে তাহার নামকরণ করিবে; ইহাতে তাহার পাপনাশ হয়; এইরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় নাম দিবে; ইহাতেও পাপনাশ হয়। প্রজাপতি কুমারকে বলিলেন, “তোমার নাম রুদ্র হউক।” তাহার যখন এই নামকরণ হইল, অগ্নি তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ অগ্নিই রুদ্র, রোদন করিয়াছিল, বলিয়া রুদ্র। সে বলিল, “আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।” প্রজাপতি বলিলেন, “তুমি সর্ব্ব হইলে।” তাহাকে যখন এই নাম দেওয়া হইল, জল তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ জলই সর্ব্ব, জল হইতে এ সকল জন্মিয়াছে। সে বলিল, “আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।” প্রজাপতি বলিলেন, “তুমি পশুপতি হইলে।” যখন তাহাকে এই নাম দেওয়া হইল, ওষধি তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ ওষধিই পশুপতি; এই নিমিত্ত পশুরা ওষধি পাইলে পরাক্রান্ত হয়। সে বলিল, “আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।” প্রজাপতি বলিলেন, “তুমি উগ্র হইলে।” যখন তাহাকে এই নাম দেওয়া হইল, বায়ু তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ বায়ুই উগ্র, এই নিমিত্ত যখন প্রবল বাতাস বহিতে থাকে, লোকে বলে যে উগ্র বহিতেছে। সে বলিল, “আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।” প্রজাপতি বলিলেন, “তুমি অশনি হইলে।” তাহাকে যখন এই নাম দেওয়া হইল, বিদ্যুৎ তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ বিদ্যুৎই অশনি, এই নিমিত্ত যে বিদ্যুতের আঘাতে মরে, লোকে বলে অশনির (অর্থাৎ বজ্রের) আঘাতে মরিয়াছে। সে বলিল, “আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।” প্রজাপতি বলিলেন, “তুমি ভব হইলে।” যখন তাহাকে এই নাম দেওয়া হইল, পর্জ্জন্য তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ পর্জ্জন্যই ভব, পর্জ্জন্য হইতেই সকল হয়। সে বলিল, “আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।” প্রজাপতি বলিলেন, “তুমি মহাদেব হইলে।” তাহাকে যখন এই নাম দেওয়া হইল. চন্দ্রমা তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ প্রজাপতিই চন্দ্রমা, প্রজাপতিই মহাদেব। সে বলিল, “আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।” প্রজাপতি বলিলেন, “তুমি ঈশান হইলে।” তাহাকে যখন এই নাম দেওয়া হইল, আদিত্য তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ আদিত্যই ঈশান, আদিত্যই এসকল শাসন করিতেছেন। সে বলিল, “আমি এত হইয়াছি; আমাকে আর নাম দিও না।” অগ্নির এই আটটী মূর্ত্তি, কুমার নবম।”

শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে যে উপাখ্যানটী উদ্ধৃত হইল, তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, রুদ্রের রূপে অগ্নিরই প্রবলতা, কিন্তু তথায় সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতিরও স্থান আছে। প্রাচীন কালে যে সকল দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল, সকলই সময়ে সময়ে

ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিতেন। সূর্য্য কথন কথন দেশ দগ্ধ করিতেন। বায়ু সময়ে সময়ে বৃক্ষ উন্মূলিত, গৃহ ভগ্ন ও নৌকা জলমগ্ন করিতেন। অগ্নি কথন কথন লোকের সর্ব্বস্বান্ত করিতেন। অশনির আঘাতে সময়ে সময়ে লোকের প্রাণ যাইত। প্রবল জলপ্লাবনে কথন কথন জনপদ সকল বিনষ্ট হইত। ভয়ঙ্কর শিলা বৃষ্টিতে কথন কথন বিলক্ষণ অপকার করিত। মনোহর চন্দ্রমাও সময়ে সময়ে রাহুগ্রস্ত হইয়া ভয়বিস্তার করিতেন। এইরূপে প্রত্যেক দেবতারই কথন কথন উগ্রভাব লক্ষিত হইত। সুতরাং ক্রমে সর্ব্বত্রই রুদ্রমূর্ত্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। সকলের উত্রতার সমষ্টি লইয়া রুদ্রের বিরাট মূর্ত্তি বিরাজমান হইল। ইহাতে কালে কালে সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি কেন না তাঁহার নিকটে ক্ষুদ্র হইয়া পড়িবে? কি প্রকারে বৈদিক দেবতাদিগের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া ভারতবর্ষে শিব ও বিষ্ণুর প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়, স্থির করা সহজ নয়; কিন্তু এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, সমুদায় প্রাচীন দেবতার উগ্র-ভাব লইয়া শিবের এবং সৌম্যভাব লইয়া বিষ্ণুর সৃষ্টি, এবং এই কারণে লোকে ক্রমে অন্য দেবতা অপেক্ষা তাঁহাদিগের প্রতি অধিক ভক্তি দেখাইতে আরম্ভ করে। হয় ভয় নয় ভালবাসা এই দুইটীর মধ্যে কোন একটীর বশবর্ত্তী হইয়া সাধারণতঃ লোকে অতিমানুষিক শক্তির উপাসনা করিতে যায়। ইহার মধ্যে একটী হইতে শৈবধর্ম্মের, এবং অপরটী হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তি।

কিন্তু বর্ত্তমান কালের শিব কেবল বৈদিক রুদ্র নহেন। তিনি লিঙ্গমূর্ত্তিতে পূজিত। অথচ বৈদিক ঋষিদিগের কোন উপাস্য দেবতাই লিঙ্গমূর্ত্তি বলিয়া বর্ণিত নহেন, এবং আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অতি প্রাচীন কালে অনার্য্য জাতি দিগের মধ্যে লিঙ্গোপাসনা প্রচলিত ছিল। সুতরাং ভারতবর্ষীয় অনার্য্য জাতিদিগের নিকট হইতে আর্য্যেরা এপ্রকার শিব পূজা পদ্ধতি পাইয়াছিলেন, ইহা অনেক দূব সম্ভব। শৈব উপাসনা যে অনার্য্য-ভাবাপন্ন, নিম্নে তদ্বিষয়ের কয়েকটী প্রমাণ প্রদত্ত হইতেছে।

(১) বেদে লিঙ্গোপাসকদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ আছে। ঋগ্বেদে লিখিত আছে,

"স শর্ধদর্যো বিষুণস্য জন্তোর্মা শিশ্নদেবা অপিগুঋতং নঃ।"

অর্থাৎ "ইন্দ্র শত্রুদিগকে শাসন করুন যেন লিঙ্গোপাসকেরা আমাদিগের যজ্ঞের নিকট না আসিতে পারে।" ইহাতে বোধ হয়, যে, যে দস্যুগণ আর্য্য ঋষি দিগের যজ্ঞের বিঘ্ন করিত, তাহারা লিঙ্গো-পাসক ছিল। রামায়ণের অনেকস্থানে বর্ণিত আছে যে রাক্ষসেরা যজ্ঞ কালে মুনিদিগের প্রতি অনেক উৎপাত করিত। রাক্ষসেরা যে আর্য্যধর্ম্মদ্বেষী স্বতন্ত্রধর্ম্মা-ক্রান্ত অনার্য্য জাতি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং উত্তরকাল-

বর্ত্তী বর্ণনা দ্বারা বৈদিক শ্লোকার্থের সমর্থনই হইতেছে।

(২) স্মৃতিতে, ব্রাহ্মণদিগের শিবপূজা নিষিদ্ধ দেখা যায়। বশিষ্ঠ স্মৃতিতে লিখিত আছে,

শূদ্রাদীনান্তু রুদ্রাদ্যা অর্চ্চনীয়া প্রযত্নতঃ॥
যত্র রুদ্রার্চ্চনং প্রোক্তং পুরাণেষু স্মৃতিষ্বপি।
তদব্রহ্মণ্যবিষয় মেব মাহ প্রজাপতিঃ॥
রুদ্রার্চ্চনং ত্রিপুণ্ড্রঞ্চ পুরাণেষু চ গীয়তে।
ক্ষত্রবিট্ শূদ্রজাতীনাং নেতরেষাং তদুচ্যতে॥

অর্থাৎ

শূদ্রাদিদিগের যত্নপূর্ব্বক রুদ্রাদি অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। পুরাণে ও স্মৃতিতে যেখানে রুদ্রার্চ্চনার কথা আছে, তাহা ব্রাহ্মণের জন্য নহে, প্রজাপতি বলিয়াছেন। পুরাণে রুদ্রার্চ্চনা ও ত্রিপুণ্ড্রধারণ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদিগের জন্য উক্ত হইয়াছে, অপরের অর্থাৎ ব্রাহ্মণের জন্য নহে।

(৩) রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে রাক্ষস ও দৈত্যগণ মহাদেবের ভক্ত বলিয়া বর্ণিত, এবং মহাদেবকেও অনেক সময়ে তাহাদিগের প্রতি সদয় দৃষ্ট হয়।

(৪) ইতিহাস, পুরাণাদিতে দক্ষযজ্ঞভঙ্গের যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয় শিব পূর্ব্বে যজ্ঞভাগ পাইতেন না, অনেক মারামারির পরে তিনি দেবতা বলিয়া গৃহীত হন। রামায়ণে প্রথমে এ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। হরধনু সম্বন্ধে জনক বলিতেছেন,

"দক্ষযজ্ঞ বধে পূর্ব্বং ধনুরায়ম্য বীর্য্যবান্।
বিধ্বস্য ত্রিদশান্ রুদ্রঃ সলীল মিদমব্রবীৎ॥
যস্মাদ্ ভাগার্থিনো ভাগান্ নাকল্পয়ত মে সুরাঃ।
বরাঙ্গাণি মহার্হাণি ধনুষা শাতয়ামি বা॥
ততো বিমনসঃ সর্ব্বে দেবা বৈ মুনিপুঙ্গব।
প্রসাদয়ন্ত দেবেশম্ তেষাং প্রীতো ভবদ্ ভবঃ॥
প্রীতশ্চাপি দদৌ তেষাং তান্যঙ্গানি মহৌজসাং।
ধনুষা যানি যান্যসন্ শাতিতানি মহাত্মনা॥
তদেতদ্ দেব দেবস্য ধনুরত্নং মহাত্মনঃ।
ন্যাসভূতং তদা ন্যস্তং অস্মাকম্ পূর্ব্বকে বিভো॥

অর্থাৎ

"পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ নাশ কালে বীর্য্যবান্ রুদ্র ধনুরাকর্ষণ করিয়া দেবতাদিগকে পরাজয় করত উপহাস করিয়া এই বলিয়া ছিলেন, "দেবগণ, আমি ভাগার্থী হইলেও তোমরা আমাকে ভাগ দাও নাই; আমি ধনু দ্বারা তোমাদিগের মহার্হ বরাঙ্গ সকল কর্ত্তন করি।" অনন্তর, হে মুনিপুঙ্গব, দেবতা সকল বিমনা হইয়া মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিলে, তিনি প্রীত হইলেন। মহাদেব ধনু দ্বারা মহাতেজসম্পন্ন দেবতাদিগের যাহার যে অঙ্গ কাটিয়াছিলেন, প্রীত হইয়া প্রদান করিলেন। এই সেই ধনুরত্ন, মহাদেব ইহা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষের হস্তে ন্যস্ত করেন।"

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে

যে অন্য দেবগণকে রথারোহণে দক্ষযজ্ঞে যাইতে দেখিয়া উমা পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনিও কেন যাইতেছেন না। মহাদেব উত্তর করিলেন,

"সুরৈরেব মহাভাগে পূর্ব্বমেতদনুষ্ঠিতং।
যজ্ঞেষু সর্ব্বেষু মম ন ভাগ উপকল্পিতঃ॥
পূর্ব্বোপায়োপপন্নেন মার্গেণ বরবর্ণিনি।
ন মে সুরাঃ প্রযচ্ছন্তি ভাগং যজ্ঞস্য ধর্ম্মতঃ॥

অর্থাৎ

"হে মহাভাগে, দেবতাদিগের প্রাচীন অনুষ্ঠান এই যে কোন যজ্ঞেই আমার ভাগ নির্দ্দিষ্ট নাই। হে বরবর্ণিনি, পূর্ব্ব পদ্ধতি নির্দ্ধারিত মার্গানুসারে ধর্ম্মতঃই দেবতারা আমাকে যজ্ঞের ভাগ দেয় না।"

(৫) শিবের নির্ম্মাল্য গ্রহণ করা যায় না। বহ্বৃচ গৃহ্য পরিশিষ্টে লিখিত আছে,

অগ্রাহ্যং শিবনৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং।
শালগ্রাম শিলাস্পর্শাৎ সর্ব্বোযাতি পবিত্রতাং॥

অর্থাৎ "পত্র পুষ্প ফল জল প্রভৃতি শিবনৈবেদ্য গ্রহণীয় নহে। শালগ্রাম শিলাস্পর্শে সকল পবিত্র হয়।"

বরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে,

অভক্ষ্যং শিবনির্ম্মাল্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং।
শালগ্রামশিলাযোগাৎ পাবনং তদ্ভবেৎ সদা॥

অর্থাৎ "পত্র পুষ্প ফল জল প্রভৃতি শিব নির্ম্মাল্য অভক্ষ্য। শালগ্রামশিলা-যোগে তাহা সদা পবিত্র হয়।"

লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র শিবভক্ত কোন এক ব্যক্তির রচিত। তাহাতে মহাদেবকে জিজ্ঞাসিত হইতেছে,

দুর্ল্লভং তব নির্ম্মাল্যং ব্রহ্মাদীনাং কৃপানিধে।
তৎ কথং পরমেশান নির্ম্মাল্যং তব দূষিতং॥

"হে কৃপানিধে, তোমার নির্ম্মাল্য ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ। তবে, হে পরমেশ, তব নির্ম্মাল্য দূষিত কেন?"

মহাদেব উত্তর করিলেন যে তাঁহার কণ্ঠে বিষ আছে বলিয়া লোকে তাঁহার নির্ম্মাল্য ভক্ষণ করে না। উত্তরটি ঠিক হউক আর না হউক, মহাদেবের নৈবেদ্য যে গ্রহণ করা যায় না ইহা শিবভক্তেরাও স্বীকার করেন।

(৬) চণ্ডাল চর্ম্মকার প্রভৃতি অতি হেয় জাতিও স্বহস্তে শিবপূজা করিতে পারে। কিন্তু দ্বিজসহায়তা ব্যতিরেকে অন্য দেবতার পূজা হয় না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে শিবপূজাপদ্ধতি অনার্য্য-ভাবাপন্ন, এবং তন্নিমিত্তই অনার্য্য বংশ সম্ভূত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ আপনা আপনি মহাদেবকে অর্চ্চনা করিতে ও নৈবেদ্যাদি দিতে অধিকারী। আর বোধ হয় এই কারণেই শাস্ত্রে শিবনির্ম্মাল্য গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(৭) পুরাণাদিতে শিবের যে প্রকার মূর্ত্তি বর্ণিত আছে, তাহা সভ্য আর্য্যজাতিদিগের কল্পিত বলিয়া প্রতীত হয় না। গলায় হাড়ের মালা, অঙ্গে ভস্ম মাখা, মস্তকে সর্প, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম অথবা দিগম্বর, সঙ্গে ভূত প্রেত, সিদ্ধি ও ধুতুরা সেবনে চক্ষু রক্তবর্ণ ও বিকৃতাকার; উপাস্য দেবতার ঈদৃশ রূপ আর্য্য ঋষিদিগের চিন্তা সমুদ্ভূত না হইয়া অসভ্য দস্যুদি-গের কল্পনার ফল হইবারই সম্ভাবনা।

কি প্রকারে অনার্য্য মহাদেব বৈদিক রুদ্রের সহিত এক বলিয়া গণ্য হইল, স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। কিন্তু অনুমান হয় যে স্বভাবসাদৃশ্য এরূপ একতার প্রতিপাদক হইয়াছিল। অনার্য্য মহাদেব এবং বৈদিক রুদ্র, উভয়েই ভীম মূর্ত্তি, উভয়েই উগ্রপ্রকৃতি। আর সাঁওতালদিগের উপাস্য গিরিদেব ও প্রাচীন অনার্য্য মহাদেব যদি একই দেবতা বলিয়া ধরা যায়, রুদ্রের গিরিশ নাম দ্বারাও একতা সংস্থাপনের একটি উপায় লক্ষিত হয়। যখন প্রাচীন আর্য্যগণ ভারতভূমি জয় করিয়া অনেক দস্যু প্রজা প্রাপ্ত হইলেন, এবং যখন উক্ত প্রজারা সমাজের নিম্ন শ্রেণীতে দাসরূপে স্থান পাইল, তখন ধর্ম্ম বিষয়ক অনেক বিবাদের পবে প্রজাদিগের প্রীতি লাভ দ্বারা রাজ্যমধ্যে শান্তি সংস্থাপন বাসনায় দ্বিজগণ এতদ্দেশীয় আদিম নিবাসীদিগের পবমপূজনীয় মহাদেবকে রুদ্র মূর্ত্তি বলিয়া উপাস্য দেবতা দলভুক্ত করিয়া লন, এপ্রকাব কল্পনা নিতান্ত অমূলক বোধ হয না। যদি এরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি অপেক্ষা শিব কেন বড় হইয়া উঠেন, তাহার আর একটি কারণ বুঝা যায়। অনার্য্য ভারতবাসীদিগের সংখ্যা আর্য্যদিগের অপেক্ষা অধিক; সুতরাং অনার্য্য জাতিগণ হিন্দু সমাজ ভুক্ত হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক লোকের নিকটে শি .বর সমাদরাধিক্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। একে ত রুদ্র সর্ব্বত্র স্বীয় ক্রোধ-প্রজ্বলিত মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া ইন্দ্র চন্দ্র রবি বহ্নি অপেক্ষা আপনার প্রতাপ বিস্তার করিতেছিলেন, তাহাতে আবার ভারতীয় লিঙ্গোপাসকদল তাঁহাকেই তাহাদিগের মহেশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিল, রুদ্রের ক্ষমতা কেন না অনিবার্য্য ও বহুবিস্তীর্ণ হইয়া উঠিবে? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে জড়জগৎ ও জীবমণ্ডলী এই দুইটি হইতে দেবোপাসনা ও লিঙ্গোপাসনা এই দুইটি উপাসনা পদ্ধতির উৎপত্তি। এই দুই প্রকার উপাসনার সংযোগে শৈব উপাসনা সংগঠিত, সুতরাং ভারতবর্ষে যে শিবপূজা বহুকাল প্রবল রহিয়াছে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কোন্ সময়ে আর্য্য ঋষিগণে লিঙ্গোপাসনার প্রতি মনোযোগ দিতে আরম্ভ করেন, নিশ্চয় বলা যায় না। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি পুরুষ ও বেদান্ত দর্শনের মায়াবাদে যে লিঙ্গোপাসনার আভাস আছে, কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই প্রতীতি হইবে। সুতরাং বৌদ্ধদেব জন্মিবার পূর্ব্বে যে শিব শক্তির সমাদবের সূচনা হইয়াছিল, এরূপ বিবেচনা কবা অন্যায় নহে।

শিব যে অনেক দেবতার সমষ্টি শিবানীর প্রতি দৃষ্টি করিলেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কালী ও করালী এই দুইটি অগ্নি জিহ্বার নাম।* পার্ব্বতী, হৈমবতী, গিরিজা, এসকল গিরিশায়ী বায়ুপত্নীব নাম। গৌরী নামটি সূর্য্যজায়া উষা হইতে প্রাপ্ত। প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি, শক্তি, এসকল নাম লিঙ্গোপাসনা হইতে সমুৎপন্ন তাহার সন্দেহ নাই।†

---

*কালী করালী মনোজবাচ সুলোহিতা যাচ সুধূম্রবর্ণা স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরূপীচ দেবী লেলায়মানা দহনস্য জিহ্বাঃ।

মুণ্ডক উপনিষদের টীকা

† এই প্রবন্ধ, এবং "মিল, ডার্বিন এবং হিন্দুধর্ম্ম" শির্ষক প্রবন্ধ যে ভিন্ন২ লেথক প্রণীত, ইহা বুদ্ধিমান্‌কে বলিয়া দেওয়া বাহুল্য।

বং সং।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

বৈদিক ধর্ম্ম আর্য্যজাতির প্রাথমিক ধর্ম্ম। বেদ হিন্দুগণের বিশ্বাসের মূলভিত্তি এবং সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের সমস্ত কার্য্যকলাপ বৈদিক ধর্ম্মানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই বেদে কাহার অবিশ্বাস করিবার ক্ষমতা নাই। কেন না বেদ ঈশ্বরের বাক্য—মানবীয় বাগ্‌যন্ত্র হইতে নিঃসৃত হয় নাই সুতরাং যিনি বেদে অবিশ্বাস করেন তিনি নাস্তিক, ঘোর পাষণ্ড,—সমাজশত্রু। বৈদিক আচার ব্যবহারে হিন্দুগণের বিশ্বাস ক্রমেই অটল হইল এবং যজ্ঞার্থে প্রত্যহ অসংখ্য২ পশুর প্রাণ বধ হইতে লাগিল। সোমরস পান এবং পশু বধ করা প্রতি গৃহস্থের কর্ত্তব্য। এ সকল না করিলে বৈদিক ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা নাই। আর্য্যগণ ধর্ম্ম সাধন করিতে গিয়া নিষ্ঠুরতার একশেষ উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন। এ সময় সমাজের বিপ্লব নিতান্ত আবশ্যক, বিপ্লব না হইলে সমাজের মঙ্গল হওয়া দুরপরাহত। সাধারণে ধর্ম্মান্ধ হইয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয় বটে কিন্তু অসাধারণ তেজস্বী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির এ সকল দেখিয়া হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন হয়। এসময় মহাতেজা বিপ্লবকারী অতিদুর্লভ। সাধারণ লোকে তাঁহার উদয় সহজে বুঝিতে সক্ষম নহে। বৈদিক কার্য্য কলাপ অনুষ্ঠানে আর্য্যগণ প্রবৃত্ত হওয়াতে সমাজের অহিত হইতে লাগিল। সাধারণ লোক ধর্ম্মান্ধ, ব্রাহ্মণগণ সমাজের এক মাত্র কর্ত্তা এবং তাঁহারাই সমাজকে যেদিকে ইচ্ছা সেই পথে চালাইতে লাগিলেন। নৈসর্গিক নিয়ম অনুসারে সমাজ কখন এক অবস্থায় থাকিতে পারে না। মনুষ্যের মনও পরিবর্ত্তনশীল সুতরাং ভারত সমাজের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। মনুষ্যের মনোমধ্যে অভিনব চিন্তার অবতারবৎ সমাজের পরিত্রাতা শাক্য সিংহ উদয় হইলেন। ইনি বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিন্দা করিতে তথা সমাজের অভিনব প্রণালী বদ্ধ করিতে প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায় জ্ঞানের শাণিত অসিহস্তে উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে ইহাঁর প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিবরণ প্রকাশ করা এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য এবং তাহাই নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

বৌদ্ধধর্ম্ম অতি প্রাচীন। বাল্মীকি রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ডীয় নবোত্তর শততম সর্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

যথাহি চোরঃ স তথাহি বুদ্ধ
স্তথাগতং নাস্তিক মত্র বিদ্ধি।
তস্মাদ্ধিয়ঃ শক্যতম প্রজানাং
ন নাস্তিকে নাভিমুখো বধঃ স্যাৎ॥

অর্থাৎ যেমন বৌদ্ধ তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ, নাস্তিককেও তদ্রূপ দণ্ড করিতে হইবে,

অতএব যাহাকে বেদবহিস্কৃত বলিয়া পরিহার করা কর্ত্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না।* এতৎপ্রমাণে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় রহিল না। ইহা ভিন্ন বায়ু, কল্কি পুরাণে গণেশ শম্ভু প্রভৃতি উপপুরাণে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং বুদ্ধ অবতারের উল্লেখ আছে। শাক্য সিংহ শেষ মর্ত্ত্য বুদ্ধ। ইহাঁর পূর্ব্বে ৫৫ বুদ্ধ বর্ত্তমান ছিলেন; তাহার মধ্যে পদ্মোত্তর হইতে সমপুজিত পর্য্যন্ত ৪৯ জন বুদ্ধ স্বর্গে ও বিপশ্চিত, শিখি, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কণক মুনি ও কাশ্যপ মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতঃপর শেষ বুদ্ধ শাক্য সিংহ "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" মর্ত্ত্যলোকে বোধিসত্ত্বের উন্নতি জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মহাজ্ঞানী ও সর্ব্বসুখপ্রদ ধর্ম্মের একমাত্র উপদেশক যথা ললিত বিস্তারে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে যে—

জ্ঞান প্রভং হত তম সুপ্রভাকরং শুভ
পদং শুভ বিমলাগ্রতেজসম্।
প্রশান্ত কায়ং শুভ শান্ত মানসং মুনিং
সমাশ্রিযান্ত শাক্যসিংহম্।
জ্ঞানোদধিং শুদ্ধ মহানুভাবং ধর্ম্মেশ্বরং
সর্ব্ববিদং মুনীশম্ ইত্যাদি॥

অভিধান মধ্যে শাক্য সিংহের নামান্তর যথা—খজিৎ, শ্বেতকেতু, ধর্ম্মকেতু, মহামুনি, পঞ্চজ্ঞান, সর্ব্বদর্শী, মহাবোধী, মহাবল, বহুক্ষণ, ত্রিমূর্ত্তি, সিদ্ধার্থ, শাক্য, সর্ব্বার্থ সিদ্ধি, শৌদ্ধোদনি, অর্কবন্ধু, মায়াদেবী সুত: গৌতম। হেমচন্দ্র তাঁহার এই কয়েকটী নাম উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

শাক্যসিংহ, অর্কবান্ধব, রাহুলেষু, সর্ব্বার্থ সিদ্ধ, গৌতমানেম্ব মায়াসুত, শুদ্ধোদন সুত।

অমর কোষের নামগুলি প্রসিদ্ধ। তাহার সিংহলে পালি ভাষায় অনুবাদ যথা "শুদ্ধোদনিচ গৌতম, শাক্য সিংহো তথা শাক্য মুনিচ অরিচ বন্ধুচ।"

শাক্য সিংহ এই নামটী নামকরণের নাম নহে। শাক্যবংশের শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার ঐ নাম। "শাক্য বংশ" ইহাও আভিজনিক সংজ্ঞা নহে। ইক্ষ্বাকু বংশীয় কোন ব্যক্তি পিতৃশাপে আক্রান্ত হইয়া কপিলাশ্রমে কিছুকাল পর্য্যন্ত এক শাক বৃক্ষে (শেগুন) আশ্রয় লইয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহা হইতে ঐ ইক্ষ্বাকু বংশীয় পুরুষের নাম শাক্য বলিয়া প্রথিত হয়। তদ্বংশীয়েরাও তদবধি শাক্য বলিয়া বিখ্যাত। আচার্য্য ভরত "শাক্য মুনি" এই নামের ব্যুৎপত্তি স্থলে লিখিয়াছেন, যথা "শাক্য বংশ্যত্বাৎ শাক্যঃ শাক্যশ্চাসৌ মুনিশ্চেতি শাক্যমুনিঃ তথাহি —শাকো বৃক্ষ বিশেষঃ তত্রভবা বিদ্যমানাঃ শাক্যোঃ পিতুঃ শাপেন কেচিদিক্ষাকু বংশীয়া গৌতমবংশজকপিল মুনেরাশ্রমে শাকবৃক্ষে কৃতবাসাশ্চ শাক্যো উচ্যতে তদুক্ত "শাক বৃক্ষ প্রতি-

* রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ড শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

চ্ছন্নং বাসং যস্মাৎ প্রচক্রিরে। তস্মাদিক্ষাকু বংশ্যাস্তে ভুবি শাক্যা.ইতিশ্রুতাঃ।" শাক্যের অপর প্রসিদ্ধ নাম গৌতম। এই নাম দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে গৌতম বংশীয় মনে করিয়া থাকেন কিন্তু সেটা তাঁহাদিগের ভ্রম। শাক্য সিংহ প্রকৃত ইক্ষাকুবংশীয়, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা গৌতম বংশীয় কপিল নামক মুনির আশ্রমে গিয়া লুক্কায়িত ভাবে শাকবৃক্ষে বাস করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহারা শাক্য ও গৌতম নামে বিখ্যাত হন। ইনিও সেই বংশে জন্মিয়াছেন বলিয়া ঐ নামে খ্যাত।

শাক্য সিংহের পিতার নাম শুদ্ধোদন। মাতার নাম মায়াদেবী। শুদ্ধোদন কপিল বস্তু* নগরের রাজা ছিলেন। আর্য্য অভিধানে লিখিত আছে শুদ্ধোদন রাজা অতি ন্যায়বান্ ছিলেন এবং পবিত্রান্ন ভোজন করিতেন যথা "শুদ্ধোদন যতো ভুংক্তে ন্যায়বান্ শুদ্ধমোদনম্।" ললিত বিস্তারে লিখিত আছে শাক্য সিংহ জম্বু দ্বীপের ১৮ স্থান ও ১৮কুল অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে শাক্য কুলকে নির্দ্দোষ জানিয়াছিলেন—মগধে বিদেহ কুল, কোশলায় কৌশল কুল, বংশরাজ কুল, বিশালা নগরে, প্রদ্যোতন কুল, মথুরা, হস্তিনায়,পাণ্ডব কুল ইত্যাদি। তিনি পাণ্ডব বংশকেও সদোষ বিবেচনা করিয়াছিলেন— "পাণ্ডব কুলপ্রসূতৈঃ কৌরব বংশোঽতি ব্যাকুলী কৃতো যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মস্য পুত্র ইতি কথয়ন্তি ভীম সেনো বায়োঃ—ইত্যাদি—" একুলের দোষ হইল যে পাণ্ডবেরা কুরুদিগকে ব্যাকুল করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা জারজ। এই রূপ সকল বংশেই দোষ, কেবল মাত্র শাক্য বংশ নির্দ্দোষ।

শাক্য কপিল বস্তু নগরে বসন্ত কালে শুক্ল পক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে মায়া দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্ বোধিসত্ত্ব যে কালে তুষিত পরিত্যাগ করিয়া মায়াদেবীর দক্ষিণ কুক্ষে প্রবেশ করেন, সেই সময় তিনি নিদ্রিতাবস্থায় এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যথা—

"হিম রজত নিভশ্চ ষড়্বিষাণঃ সুচরণ চারুভুজঃ সুরক্তশীর্ষা উদয় মুপগতো গজো প্রধানো ললিত গতি দৃঢ় বজ্রগাত্র সন্ধিঃ।" অর্থাৎ তুষার বা রজতের ন্যায় শ্বেত বর্ণ, ছয়টি দন্ত যুক্ত, মনোজ্ঞকর, সুরক্ত শীর্ষদেশ, একটী গজ মনোহর গতিতে তাঁহার উদরে প্রবেশ করিল। তৎকালে তিনি কিরূপ সুখে ছিলেন,তাহা বর্ণন করা যায় না "নচ মম সুখ জাতু এবরূপং দৃষ্টমপিশ্রুতং নাপি চানুভূতম্।" ভাবিলেন একি! কখনু আমার একপ সুখোদয় হয় নাই, আর এরূপ রূপও কখন দেখি নাই বা শুনি নাই এবং ধারণ করি নাই। নিদ্রা ভঙ্গে তিনি রাজাকে স্বপ্ন বিবরণ সমুদায় অবগত করাইলেন। রাজা গণক দিগকে ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা উত্তর করিল, আপনার

* নেপাল দেশের পর্ব্বত সন্নিকটে।

সকল প্রাণীর হিতকারী একটী রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র জন্মিবে এবং তৎকালে এইরূপ দৈব বাণী হইল যথা—"তুষিত পুরি চ্যবিত্বা বোধিসত্বো মহাত্মা নৃপতি তব সুতত্বং মায়াকুক্ষোপন্নঃ।" অর্থাৎ হে নৃপতি তুমি শঙ্কিত হইও না, মহাত্মা বোধিসত্ব তুষিত পুর পরিত্যাগ করিয়া তোমার পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন, বলিয়া এই মায়া দেবীতে উপপন্ন হইয়াছেন। মায়াদেবী সুখে বিবিধ সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিলে অষ্ট প্রকার নিমিত্ত ঘটিয়াছিল যথা—তৃণ কণ্টকাদির কাঠিন্য ছিল না, দংশ মশকাদির দৌরাত্ম্য ছিল না—হিমালয় পর্ব্বতের সমস্ত বিহঙ্গগণ আসিয়া রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে রব করিয়াছিল, রাজা শুদ্ধোদনের আগারে সর্ব্বকালীন ফল পুষ্প একদা প্রকাশ হইয়াছিল—শুদ্ধোদনের গৃহে আহার করিলেও আহারীয় দ্রব্য ক্ষয় হয় নাই এবং তাঁহার অন্তঃপুরে যে সকল বাদ্য যন্ত্র ছিল তাহা সমুদায় আপনা আপনি বাদিত হইয়াছিল ইত্যাদি। শেষ বুদ্ধের জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ বিবিধ অলৌকিক বিবরণ ললিত বিস্তরে লিখিত আছে, তাহার এখানে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া উঠে।

ইউরোপীয় পণ্ডিত গণের মতে শাক্য সিংহ খ্রীষ্ট জন্মিবার ৬২৩ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা মায়া দেবীর তাঁহার জন্মের এক সপ্তাহের পরে মৃত্যু হয় এবং তিনি তাঁহার মাতার ভগ্নী দ্বারা অতি যত্নের সহিত প্রতি পালিত হইয়াছিলেন। রাজার পুত্র মুখ নিরীক্ষণে দিন২ আনন্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং শাক্য অচির কাল মধ্যে বহু বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বভাবতঃ গম্ভীর প্রকৃতি, বালকগণের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে একদণ্ডও অতিবাহিত করিতেন না। তাঁহার কিছুমাত্র বালসুলভ চপলতা ছিল না এবং সময়ে২ তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। রাজা তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে সংসারে সুখী করিবার জন্য নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একদা মহন্মক প্রভৃতি কতকগুলি শাক্য রাজা শুদ্ধোদনকে বলিল, মহারাজ! দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন, যে "যদি কুমারোঽভিনিষ্ক্রমিষ্যতি তথা গতোভবিষ্যতি অর্হন্ সম্যক্ সম্বুদ্ধঃ, উত নাভি নিষ্ক্রমিষ্যতি রাজা ভবিষ্যতি চক্রবর্ত্তীচ বিজেতা ধার্ম্মিকো ধর্ম্মরাজঃ সপ্তরত্ন সমন্বাগতঃ" (১২ অধ্যায় ললিত বিস্তর)

যদি আমাদের কুমার প্রব্রজ্যা করেন, তাহা হইলে ইনি সম্যক্ জ্ঞানী বুদ্ধ এবং আর্হত হইবেন। আর যদি গৃহাশ্রমী হন, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন। অতএব কুমারকে অচিরাৎ বিবাহিত করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে শাক্যবংশের চক্রবর্ত্তিত্ব আর লোপ হইবে না।

রাজা শুদ্ধোদন কন্যার অন্বেষণ করিবার আদেশ মাত্র শতশত শাক্য কন্যাদানের নিমিত্ত উদ্যত হইল। কুমারকে তদ্বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি কহিলেন, সপ্তম দিবসে উত্তর দিব। ভগবান্ শাক্য সিংহ মনেং বিচার করিতে লাগিলেন, আমি কাম ভোগের অনন্ত দোষ জ্ঞাত আছি। যে আমি ধ্যান নিমীলিত নেত্রে ধ্যেয় সুখে উপবন মধ্যে বাস করিব; সেই আমি কি স্ত্রীগৃহে বাস করিতে পারি? না তাহাতে আমার শোভা পায়? আবার ভাবিলেন, না, সত্বগুণের পরিপাক হইলে কিরূপ হয়, তাহা আমাকে দেখাইতে হইবে, লোককে শিক্ষা দিতে হইবে, পঙ্কজ কর্দ্দমের মধ্যেই বৃদ্ধি পায়; জল মধ্যেই শোভা পায়; অতএব যদি কোন বোধিসত্ব পরিবাব লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি তন্মধ্যে কদাচিৎ থাকিয়াও বিনেয় হইতে বা থাকিতে অথবা করিতে পারেন। পূর্ব্বং বোধিসত্বেরাও ভার্য্যাপুত্র পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন। অতএব লোক শিক্ষার নিমিত্ত আমাকে ভার্য্যাগ্রহণ স্বীকার করা আবশ্যক। ইহার মূল

"বিদিতং ময়ানন্ত কাম দোষাঃ শরণ সর্ব্ববাস শোক দুঃখমূলা ভয়ঙ্কর বিষপত্র সন্নিকাসা জ্বলননিভা অসিধারাতুল্যরূপাঃ, কামগুণে নমেস্তি চ্ছন্দং রাগো নচাহং শোভে স্ত্র্যাগার মধ্যে যোন্বহমুপবনে বসেয়ং তুষ্ণীম্ ধ্যানসমাধিসুখেন শান্তচিত্ত ইতি।"

"সঙ্কীর্ণ পঙ্কি পদ্মানি বিবৃদ্ধিমেন্তি,
আকীর্ণ রাজ্ঞু জলমধ্যে লভাতি পূজাম্,
যদি বোধিসত্ব পরিবার বলং লভন্তে,
তদসত্ব কোটি নিযুতান্যমৃতে বিনেন্তি॥
যেচাপি পূর্ব্বক অভূন্বিদুবোধিসত্বাঃ,
সর্ব্বেভি ভার্য্যসুত দর্শিতইস্ত্রীগারাঃ
নচ রাগ রক্ত নচ ধ্যান সুখেভিভ্রষ্টা
হন্তানু শিক্ষয়ি অহংপিগুণেষু তেষাং।
(১২ অঃ)"

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া সপ্তম দিনে বলিলেন,

"ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং কন্যাং বৈশ্যাং শূদ্রাং তথৈবচ। যস্যা এতে গুণাঃসন্তি তাং মে কন্যাং প্রবেদয়॥"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র বা বৈশ্য যে কোন জাতির কন্যা হউক, যাহার পূর্ব্বোক্ত গুণ সকল আছে, সেই কন্যার সহিত আমার বিবাহ দাও।

রাজা শুদ্ধোদন, নিজনগরে প্রচার করিলেন,

"ন কুলেন ন গোত্রেণ কুমারো মম বিস্মিত গুণে সত্যে চ ধর্ম্মে চ তত্রাস্য রমতে মনঃ।"

আমার কুমার কুল, গোত্র বা রূপলাবণ্যে মোহিত হন না; গুন, সত্য, ও ধর্ম্মেই কুমারের মন, ইহা বিবেচনা করিয়া কন্যার অনুসন্ধান কর।

অনন্তর অনুসন্ধান দ্বারা দণ্ডপাণিশাক্যের দুহিতা গোপা নাম্নী কামিনী শাক্যের অভিলষিত গুণবতী হইলেন। সুতরাং ভগবান্ শাক্য তাঁহারই পাণিগ্রহণ করিলেন। "অথ দণ্ডপাণেঃ শাক্যস্য

দুহিতা শাঁক্য কন্যা সা দাসী শত পরিবৃতা” ইত্যাদি

কিছুকাল দম্পতি অতি সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন; কিন্তু শাক্য সিংহ সতত গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার হৃদয়মধ্যে সর্ব্বদা সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে চিন্তা উত্থিত হইত। তিনি মনশ্চক্ষুদ্বারা দেখিতেন।
“সর্ব্ব অনিত্যা, অকামা, অধ্রুবা নচ
শাশ্বতাপি, ন কল্পা মায়ামরীচি সদৃশা,
বিদ্যুৎ ফেণোপমাশ্চপলা ॥

রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের সংসার বৈরাগ্য দেখিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ক্রমেই তাঁহার সংসারের সুখে বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। একদা তিনি বহুজন সমভিব্যাহারে রথারোহণে নগরের পূর্ব্ব তোরণ দিয়া কুসুম নিকেতনে গমন করিতেছিলেন; এমত সময়ে পথিমধ্যে এক জন দন্তহীন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে তাহার এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সারথি কহিল, রাজকুমার! এ ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়স জন্য এতাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ ব্যক্তি কোন বিশেষ রোগগ্রস্ত নহে। ক্রমে যৌবনাবস্থা গত হইলে আমাদিগের সকলেরই এইরূপ অবস্থা ঘটিবে।

তচ্ছ্রবণে রাজকুমার কহিলেন, হায়! আমরা কি মূঢ়, যৌবনগর্ব্বে মনুষ্য শরীর পরিণামে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহা এক বারও চিন্তা করি না। সারথি! রথবেগ সম্বরণ কর, আমি সংসারের দুরন্ত কশাঘাত সহ্য করিতে ইচ্ছা করি না। সাংসারিক সুখ ক্ষণভঙ্গুর, তাহাতে লিপ্ত থাকিয়া কে বৃদ্ধ বয়সের এতাদৃক্ কষ্ট সহ্য করিবে? অন্য একদিবস শাক্য সিংহ রথারোহণে নগরের দক্ষিণ তোরণ সম্মুখে স্বজন পরিত্যক্ত বন্ধুহীন, বহুরোগগ্রস্ত জীর্ণ শীর্ণ কলেবর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে তাহার এতাদৃক্ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সারথি কর যোড়ে তাহার অবস্থার প্রকৃত কারণ বিজ্ঞাপন করিল; তাহা শুনিয়া রাজকুমার কহিলেন, “হায়! শারীরিক অবস্থা কতদূর পরিবর্ত্তশীল, এবং রোগের তাড়নায় মনুষ্যের এতাদৃক্ হীন অবস্থা হইয়া থাকে। কোন্ জ্ঞানী এই সকল দেখিয়া সংসারের সুখে লিপ্ত থাকিতে বাসনা করেন? এই বলিয়া রাজকুমার উদ্দেশ্য স্থানে গমন না করিয়া নগর মধ্যে প্রত্যাগত হইলেন। এই রূপ তৃতীয় বার রথারোহণে নগরের পশ্চিম তোরণ দিয়া বিলাস কাননে গমন করিবার সময় পথিমধ্যে বস্ত্রাবৃত এক মৃতশরীর দেখিতে পাইলেন। তাহার চতুর্দ্দিকে স্বজন বান্ধবেরা হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। তদ্দর্শনে রাজকুমারের মনে সংসারের প্রতি বিলক্ষণ বিরক্তি প্রকাশ পাইল। তিনি সারথিকে কহিলেন, যৌবন গর্ব্ব বৃদ্ধ বয়সে শেষ হইবে, শারীরিক স্বাস্থ্য

ব্যাধি দ্বারা বিনাশ পাইবে এবং জীবনও কিছু কালের মধ্যে বিনাশ হইবে। এ সকল দেখিয়া সংসারের সুখে কে মুগ্ধ হইতে বাসনা করে? যদি বৃদ্ধ বয়স, রোগ যন্ত্রণা এবং মৃত্যু সংসারের মধ্যে না থাকিত, তাহা হইলেই এই স্থান চিরসুখের হইত।" তাহার পর মুক্ত কণ্ঠে কহিলেন, "সারথি! নগর মধ্যে গমন কর, আমি এক্ষণে রথ হইতে অবতরণ করিয়া সংসারের কষ্ট হইতে মুক্তির উপায় চিন্তা করিব।"

অবশেষে চিন্তা করিতে২ নগরের উত্তরাভিমুখে বিলাস ভবনে গমন করিবার সময় এক শান্ত মূর্ত্তি, রোগ শোক বিমুক্ত ভিক্ষুকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ব্যক্তি কে?" সারথি কহিল, "রাজকুমার! এ ব্যক্তি ভিক্ষু, সংসারের সকল বন্ধন ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত। এ ব্যক্তি সকল রিপুকে পরাজয় করিয়া, আনন্দ চিত্তে ভিক্ষান্নে জীবন অতিবাহিত করিতেছে।" রাজকুমার কহিলেন, "সংসারের মধ্যে এই ব্যক্তিই সাধু, জ্ঞানিগণের এই পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। আমিও এই পথ অবলম্বন করিব, এবং অন্যান্য লোককেও এই ভিক্ষুর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিব। ইহাতে আমাদিগের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।" এই বলিয়া রাজকুমার বাটী প্রত্যাগত হইলেন। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের ক্রমেই সংসারের বিরাগ হৃদয়ে বদ্ধমূল দেখিয়া, তাঁহার চিত্ত বিনোদনের জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের ভাব কিছুতেই পরিবর্ত্ত হইল না। তিনি সংসারের সকল সুখ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি মুক্ত কণ্ঠে কহিলেন, জীবনে ধিক্; জরাগ্রস্ত হইবার সম্ভব এমত যৌবনে ধিক্; ব্যাধিতে জর্জ্জরিত হয় এমত স্বাস্থ্যে ধিক্; এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়এমত জীবনকেও ধিক্—হায়!

ধিগ্যৌবনেন জরয়া সমভিদ্রুতেন।
আরোগ্য ধিগ্বিবিধব্যাধি পরাহতেন॥
ধিগ্জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন।
ধিক্ পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতি প্রসঙ্গে॥

তিনি কহিলেন, যদিও ব্যাধি, মৃত্যু না থাকিত, তথাপি তিনি সংসার পঞ্চ স্কন্ধ*জন্য একমাত্র দুঃখ স্থান বলিয়া পরিত্যাগ করিতেন; কিন্তু এক্ষণে জরা ব্যাধি মৃত্যু নিশ্চয়ই জীবনকে অধীন করিবে। এজন্য দুঃখ হইতে পরিত্রাণার্থ উপায় করা কর্ত্তব্য। যথা।

যদি জরা ন ভবেয়া নৈব ব্যাধির্ন মৃত্যু
স্তথাপিচ মহদ্দুঃখংপঞ্চস্কন্ধং ধরন্তো।
কিংপুন র্জরা ব্যাধি মৃত্যু নিত্যানুবন্ধা
সাধু প্রতি নিবর্ত্ত্যা চিন্তয়িষ্যে প্রমোচং॥

* দুঃখংসংসারিণঃ স্কন্ধাস্তেচপঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ বিজ্ঞানং বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারো রূপ মেবচ। বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং রূপ এই পঞ্চ স্কন্ধ, ইহাই সাংসারিক আত্মার দুঃখ হেতু।

এই রূপ ভাবিয়া তিনি পিতাকে সকল বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন। শুদ্ধোদন তখন সজল নেত্রে পুত্রকে রাজভোগের সকল সুখ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া সুখে রাজ্য ভোগ করিবার জন্য নানা অনুনয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি কহিলেন যদি জরা আক্রমণ না করিয়া শুভ্রবর্ণ যৌবন চির অবস্থিতি করে, তাহা হইলেই তিনি সুখে সংসারে থাকিতে পারেন যথা

"ইচ্ছামি দেব জর মহনমাক্রমেয়া।'
শুভ্রবর্ণ যৌবন স্থিতোভবি নিত্য কালং॥'
আরোগ্য প্রাপ্ত ভবিনোচ ভবেতব্যাধি।'
রমিত আয়ুশ্চ ভবিনোচ ভবেত মৃত্যুঃ॥

রাজা এসকল শুনিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কহিলেন; "হে পুত্র! যে চারিটী বিষয় প্রার্থনা করিলে, তাহা আমার প্রদান করিবাব ক্ষমতা নাই।" রাজকুমার তখন পিতার নিকট সংসার হইতে গমন করিবার নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা করিলেন। নৃপতি শোকপূর্ণ আননে পুত্রকে অভীষ্ট সিদ্ধি জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়া অগত্যা বিদায় দিলেন।

এক গভীর রজনীযোগে শাক্য সিংহ ২৯ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার স্ত্রী এবং একমাত্র শিশু পুত্র রাহুলকে পরিত্যাগ করিয়া ঘোটকারোহণে রাজভবন হইতে প্রস্থান করিলেন। সমস্ত রাত্রি ভ্রমণের পর প্রভাত কালে ঘোটক পরিত্যাগ করত অনোমানদীতীরে স্নানাদি করিয়া ভিক্ষুবেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে বৈশালীতে† আসিয়া এক ব্রাহ্মণের সমীপে শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তথায় মুক্তির উপযোগী কোন শিক্ষা প্রাপ্ত না হওয়াতে অগত্যা তথা হইতে তাঁহাকে প্রস্থান করিতে হইল। তাহার পর রাজগৃহের এক ব্রাহ্মণের নিকট আর্য্য শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। এস্থান হইতে পঞ্চজন সহাধ্যায়ী সমভিব্যাহারে উর্ব্বিলব নামক গ্রামে ৬ বর্ষকাল কঠিন পরিশ্রমের সহিত সমাধি, মহা প্রধান প্রভৃতি যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত কষ্টেও তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইল না। ক্রমেই তাঁহার সহাধ্যায়িগণ পরিত্যাগ করিলে, তিনি একাকী নিঃসহায়ে পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপর বুদ্ধিদ্রুম মূলে ধ্যানে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল, এবং তিনি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য পবিত্র বৌদ্ধ জ্ঞান লাভ করিলেন।

৫৮৮ খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের বিমল জ্ঞান লাভ করিয়া বারানসীতে ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তথায় তাঁহার পূর্ব্বের পঞ্চ সহাধ্যায়ী এবং কতিপয় ব্যক্তি এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। ভারতবর্ষের নৃপতিগণ তাঁহার যশঃ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মগধাধিপতি মহারাজ

† বৈশালী—বিশালা বদরী অর্থাৎ এক্ষণে যাহা হরিদ্বারের উত্তর পূর্ব্বাংশে বদরীকাশ্রম বলিয়া প্রসিদ্ধ, তন্নিকটবর্ত্তী নগরের নাম বৈশালী।

বিম্বসারের প্রযত্নে রাজগৃহে বক্তৃতা কালে বহুব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। কালান্তক বিহার তাঁহার উদ্দেশে এক ধনাঢ্য বণিক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল; তথায় তিনি কিছুকাল বক্তৃতা করিয়া অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ সময় তাঁহার ধর্ম্মের গৌরব দিন২ বৃদ্ধি হইতে লাগিল; এবং দেশ বিদেশ হইতে বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া বেদবিধি পরিত্যাগ করত বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শাক্য সিংহ তাঁহার প্রধান শিষ্য সারিপুত্র মৌদ্গল্যায়ন, এবং কাত্যায়ন সমভিব্যাহারে কিছুকাল মগধেশ্বরের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। পরে উক্ত নৃপতি অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইলে, তিনি শ্রাবস্তীতে* বাস করেন; তথায় অনাথ পিণ্ডদ নামক বণিক তাঁহার জন্য একটী সুরম্য বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। শাক্যসিংহের বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহ হইতে লাগিল। সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ, যুদ্ধপ্রিয় ক্ষত্রিয়গণ, বাণিজ্য ব্যবসায়ী বৈশ্যগণ, সকলেই তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। কোশলাধিপতি এবং প্রসন্নজিৎ নৃপতি তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন। দ্বাদশ বর্ষ পরে তিনি কপিল বস্তুতে গমন করিয়া তাঁহার পিতৃস্বসা, স্ত্রী এবং শাক্য বংশীয় অন্যান্য লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই রূপ ধর্ম্ম প্রচারে কালাতিপাত করিয়া বুদ্ধদেব ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে ৫৪৩ খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ব বৎসরে কুশী নগরে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এসময় তাঁহার অসংখ্য শিষ্য উপস্থিত ছিল। তাহারা সকলেই বোধিসত্বের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। এবং মৃত্যুশয্যা হইতে বুদ্ধদেব তিনবার স্বশিষ্য বর্গকে ধর্ম্মের কুটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কেহই উত্তর করিল না। সে সময় কাহারও ধর্ম্মবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। অবশেষে মৃত্যু কালে ভগবান্ কহিলেন, "ভিক্ষুগণ! আমি শেষবার তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি; সংসারের সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, এজন্য তোমরা নির্ব্বাণ কামনায় যত্নশীল হও।" ভগবান নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে সাধারণ ভিক্ষুগণ উচ্চস্বরে বিলাপ ও অনুতাপ করিতে লাগিল; কিন্তু অর্হতগণ পৃথিবীর সকল বস্তু ক্ষণভঙ্গুর ভাবিয়া শোকবেগ সম্বরণ করিলেন। চন্দন কাষ্ঠের চিতার উপর তাঁহার মৃতশরীর নববস্ত্রাবৃত করিয়া স্থাপিত হইলে, মহা কাশ্যপ তথা ৫০০ শত ভিক্ষু উহা তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপরে সকলে ভগবানের চরণ বন্দনা করিয়া চিতা প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। নশ্বর শরীর ধ্বংস হইয়া ভস্মাবশিষ্ট রহিল। ভিক্ষুগণ সেই ভস্মরাশি ধাতুনির্ম্মিত পাত্রে পূর্ণ করিয়া সুগন্ধ

* শ্রাবস্তী ইহা দাক্ষিণাত্য প্রদেশে অবস্থিত। এই নগর এত প্রাচীন যে ইহার উল্লেখ মহাভারতেও দৃষ্ট হয়।

পুষ্পে আচ্ছাদিত করত নৃত্যগীত করিতে২ নগরমধ্যে আনয়ন করিল। উহা তথায় মহাসম্মানের সহিত সপ্তদিবস রক্ষিত হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার ক্ষুদ্র২ অস্থি খণ্ড রাজগৃহ, বৈশালী, কপিল বস্তু, অলকাপুর, রামগ্রাম, উথদ্বীপ, পাওয়া এবং কুশীনগর এই ৮স্থানে প্রোথিত করিয়া তাহার উপর অষ্টস্তূপ নির্ম্মিত হইল। বুদ্ধদেবের উপর এত ভক্তি এবং অনুরাগ যে তাঁহার দন্ত কেশাদি লইয়া বহুব্যয় করিয়া তাহা সংরক্ষণ জন্য বৃহৎ২ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐসকল মন্দির বিশেষ২ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত এবং একাল পর্য্যন্ত বিখ্যাত।

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। চৈতন্য দেবের ন্যায় তাঁহার মত শিষ্যবর্গ কর্ত্তৃক মৃত্যু অন্তে জগতের হিতের জন্য প্রচারিত হয়। তাঁহার প্রসিদ্ধ শিষ্য ত্রিতয় "ত্রিপেটক" রচনা করেন। প্রথম অধ্যায় অভিধর্ম্ম কাশ্যপ দ্বারা, দ্বিতীয় অধ্যায় সূত্র আনন্দ দ্বারা এবং তৃতীয় অধ্যায় বিনয় উপালী দ্বারা, খৃষ্ট জন্মিবার ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়া ৫০০ শত সুপণ্ডিত ভিক্ষুগণ সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছিল। ত্রিপেটক প্রচারের পরে তিনটী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সঙ্গমে আচার্য্যগণ ধর্ম্মের গুহ্য কথা সকল মীমাংসা করিয়া বিবিধ গ্রন্থ প্রচার করেন। আষাঢ় মাসে কাশ্যপ ৫০০ শত সুপণ্ডিত স্থবির ও ভিক্ষুগণকে আহ্বান করত সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবান্ মায়াময় মর্ত্ত্যদেহ পরিত্যাগ কালে আনন্দকে কহিয়াছিলেন যে, "আমি গত হইলে আমার প্রচারিত ধর্ম্ম ও বিনয় তোমাদিগের পথপ্রদর্শক হইবে। এক্ষণে হে জ্ঞানিগণ! আমাদিগের তদালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য"। এতদ্বাক্যে সকলেই সম্মত হইলেন। এবং মগধরাজ অজাতশত্রু শতপাণি শিখর মূলে একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া সকলকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। তথায় আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মালোচনা হইয়া ৭ মাস পরে (খৃঃ পূঃ ৫৪৩ বৎসরে) প্রথম সঙ্গম শেষ হয়। ইহার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গম কালাশোক কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিল। এই সকল সঙ্গমে বৌদ্ধধর্ম্মের সমূহ উন্নতি হয়। এসময় বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির সীমা ছিল না। হিন্দুগণ আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন; রাজা প্রজা সকলেই এই নব ধর্ম্মাবলম্বী। বৈদিক কার্য্যকলাপের ক্রমেই হতাদর হইতে লগিল; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞার্থে পশুবধের শোণিতস্রোত ক্রমেই বন্ধ হইল।

অশোক নৃপতি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান উন্নতিকারক। ইনি বিন্দুসরের পুত্র এবং চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। বৈরনির্য্যাতনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকাতে ইহাঁকে সকলে প্রচণ্ডাশোক বলিত। তৎপরে ইনি পিতার অবর্ত্তমানে ২৬৩ খৃঃ পূঃ মগধের সিংহাসনে আরূঢ় হইলে পর

বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি করাতে সকলেই ইহাঁকে ধর্ম্মাশোক বলিত। ইনি মহাপরাক্রমশালী নৃপতি। চারিবৎসরের মধ্যে অশোক সমুদায় ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন মহাচীন পর্য্যন্ত ইহাঁর করতলস্থ হইয়াছিল। এমন কি পাণ্ডবেরাও অশোকের ন্যায় ভারতবর্ষে একাধিপত্য করিতে পারেন নাই। ইনি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মে তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ইনিই বৌদ্ধগণের "দেবানাম্ প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী।" অসংখ্য প্রচারকেরা ইহাঁর অনুজ্ঞানুসারে গ্রামে২ নগরে২ এবং পুরস্ত্রীবর্গের নিকটও ধর্ম্মপ্রচার করতঃ অল্পকাল মধ্যেই ভারতবর্ষের সকল জাতিকেই বৌদ্ধমতাবলম্বী করিয়াছিলেন।

অশোক ৮৪ সহস্র স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করেন। এই সকল স্তম্ভ ভারতবর্ষের বিবিধ নগরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমরা কয়েকটী প্রসিদ্ধ অশোক-স্তম্ভ দেখিয়াছি। তাহার মধ্যে ফিরোজ সাহেব নামে খ্যাত লাটটী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এই সকল স্তম্ভের অঙ্গে পালিভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিবিধ অনুজ্ঞা খোদিত আছে। ইহা ভিন্ন কটকে ধাউলী, গুজরাটে গির্ণারে শিখরে এবং আফগানিস্থানে কপর্দ্দ গিরি অঙ্গে, অশোকের যশোঘোষণা খোদিত ছিল। এই সকল লিপি আলোচনায় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক ঐতিহাসিক সত্য অবগত হইয়াছেন। জুনগড়ের পার্ব্বতীয় লিপিমধ্যে আন্তিয়োকস্, টলেমী, আন্তিগোনো এবং মগা নামক যবন নৃপতির নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অশোকের খৃঃ পূঃ ২২২ বৎসরে মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে ভারত বর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আর উন্নতি হয় নাই। অশোকপুত্র মহেন্দ্র সিংহলে ৩০৭ খৃঃপূঃ বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। তিনি শিষ্য দিগকে প্রশ্নানুরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন। শিষ্যেরা তদর্থ সকল ধারণ পূর্ব্বক বহু বিস্তার করিয়া প্রকাশ করিতেন। ইহাতে ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন "তদ্বিনেয়াঃ প্রচক্রিরে।" সম্ভব বটে; বুদ্ধের বাক্য সকল গম্ভীর অর্থবান্ এবং সুপরিপাটী। বুদ্ধদেবের বাক্য কিরূপ গাম্ভীর্য্যার্থপূর্ণ, তাহা পাঠকগণের গোচরার্থে আমরা বহু অন্বেষণ করিয়া কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

"ইদম্প্রত্যয়ফলমিতি। উৎপাদাদ্বা তথাগতানা মনুৎপাদাদ্বা স্থিতৈবৈষাং ধর্ম্মাণাং, ধর্ম্মিতা ধর্ম্মস্থিতিতা ধর্ম্মনিয়ামকতা প্রতীত্য সমুৎপাদানুলোমতা ইতি—অথ পুনরয়ং প্রতীত্য সমুৎ পাদো-দ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি হেতূপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ, যদিদং বীজাদঙ্কুরোঽঙ্কুরাৎ পত্রং পত্রাৎ কাণ্ডং কাণ্ডা-

ম্নালং নালদ্গের্ভো গর্ভাচ্ছুকং শূকাৎ পুষ্পং পুষ্পাৎ ফলমিতি; অসতি বীজেঽঙ্কুরো ন ভবতি যাবদসতিপুষ্পে ফলন্নভবতি, সতিস্তু বীজেঽঙ্কুরো ভবতি, যাবৎ পুষ্পে সতি ফলমিতি তত্রবীজস্য নৈবং ভবতি জ্ঞানং অহমঙ্কুরং নির্ব্বর্ত্তয়ামি অঙ্কুরস্যাপি নৈবং ভবতি জ্ঞানং অহং বীজেন নির্ব্বর্ত্তিত ইতি, এবং যাবৎ পুষ্পস্য নৈবং ভবতি জ্ঞানমহং ফলং নির্ব্বর্ত্তয়ামীতি ফলস্যাপি নৈবং ভবত্যহং পুষ্পেনাভিনির্ব্বর্ত্তিতমিতি, তস্মাৎ সত্যপি চৈতন্যে বীজাদীনামসত্যপি চান্যোন্যাস্মিন্নধিষ্ঠাতবি কার্য্য কারণ ভাব নিয়মোদৃশ্যতে, ইত্যুক্তো হেতূপনিবন্ধঃ। প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ প্রতীত্য সমুৎপাদস্য উচ্যতে প্রত্যয়ো হেতুনাং সমবায়ঃ, হেতুং হেতুং প্রতি অয়ন্তে হেত্বন্তরাণীতি তেষাময়মানানাং ভাবঃ প্রতীত্য সমবায় ইতি যাবৎ। ষণ্ণাং ধাতুনাং সমবায়ং বীজহেতুরঙ্কুরো জায়তে, তত্র পৃথিবী ধাতু বীজস্য সংগ্রহে কৃত্যং করোতি, যথাঙ্কুরঃ কঠিনোভবতি, অপ্ ধাতু বীজং স্নেহয়তি, তেজো ধাতুর্বীজং পরিপাচয়তি, বায়ু ধাতু বীজমভিনির্হরতি যতোঽঙ্কুরো বীজান্নির্গচ্ছতি। আকাশ ধাতু বীজস্যাবরণং কৃত্যং করোতি রূপ ধাতুরপি বীজস্য পরিণামং করোতি, তদেতেষাং অবিকৃতানাং ধাতুনাং সমবায়ে বীজে রোহত্যাঙ্কুরো জায়তে নান্যথা। তত্র পৃথিবী ধাতো নৈবং ভবত্যহং বীজস্য পরিণামং করোমীতি: অঙ্কুরস্যাপি নৈবং ভবত্যহমেভিঃ প্রত্যয়ৈ নির্ব্বর্ত্তিত ইতি।

তথাধ্যাত্মিকঃ প্রতীত্য সমুৎপাদো দ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি, হেতূপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ। তত্রাস্য হেতূপনিবন্ধো যথা, যদিদমবিদ্যা প্রত্যয়াঃ সংস্কারা যাবজ্জাতি প্রত্যয়ং জরা মরণাদীতি অবিদ্যাচেন্নাভবিষ্যং নৈবং অঙ্কুরো অজনিষ্যন্ত এবং জরা মরণাদয় উদপৎস্যন্ত যাবজ্জাতিশ্চেন্নাভবিষ্য নৈবং তত্রাবিদ্যায়া নৈবং স্ববত্যহং সংস্কারানভি নির্ব্বর্ত্তয়ামীতি সংস্কারাণামপি নৈবং ভবতি বয়মবিদ্যয়া নির্ব্বর্ত্তিতা ইতি। এবং যাবজ্জাত্যা অপি নৈবং ভবত্যহং জরা মরণাদ্যভি নির্ব্বর্ত্তয়ামীতি জরামরণাদীনামপি নৈবং ভবতি বয়ং জাত্যা অভি নির্ব্বর্ত্তিতা ইতি অথচ সৎস্ববিদ্যাদিষু স্বয়মচেতনেষু চেতনানন্তরানধিষ্ঠিতেষ্বপি সংস্কারাদীনামুপৎত্তি বীজাদিষ্বিব সৎস্বচেতনেষু চেতনান্তরাপধিষ্ঠিতেষ্বপাঙ্কুরাদীনাং, ইদং প্রতীত্য প্রাপোদ মুৎপদাস্ত ইতি। এতাবন্মাত্রস্য দৃষ্টত্বাৎ—চেতনাধিষ্ঠানস্যানুপলব্ধে। সোয়মাধ্যাত্মিকস্য প্রতীত সমুদায়স্য হেতূপনিবন্ধঃ। অথ প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ পৃথিব্যপ্তেজো বায়্বাকাশ বিজ্ঞান ধাতুনাং সমবায়াদ্ভবতি কায়ঃ। তত্রকায়স্য পৃথিবী ধাতুঃ কাঠিন্যমভি নির্ব্বর্ত্তয়তি অপ্‌ধাতুঃ স্নেহয়তি কায়ং তেজো ধাতুঃ কায়স্য শিত পীতে পরিপাচয়তি বায়ু ধাতুঃ কায়স্য শ্বাস প্রশ্বাসাদি করোতি আকাশ ধাতুঃ কায়স্য শুশিরভাবং করোতি যাশ্চ নামরূপাঙ্কুরমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি পঞ্চ বিজ্ঞানার্থ সংযুক্তং সাস্রবঞ্চ মনোবিজ্ঞানং

সোঽয়মুচ্যতে বিজ্ঞান ধাতুঃ। যদাধ্যাত্মিকাঃ পৃথিব্যাদি ধাতবো ভবন্ত্য বিকলা স্তদা সর্ব্বেষাং সমবায়াদ্ভবতি কায়স্যোৎপত্তিঃ তত্র পৃথিব্যাদি ধাতূনাং নৈবং ভবতি বয়ং কাঠিন্যাদি নির্ব্বর্ত্তয়াম ইতি কায়স্যাপি নৈবং ভবতি বিজ্ঞান মহমেভিঃ প্রত্যয়ৈরভিনির্ব্বর্ত্তিত ইতি—অথচ পৃথিব্যাদি ধাতুভ্যোঽচেতনেভ্যশ্চেতনান্তরানধিষ্ঠিতেভ্যোঽঙ্কুরস্যেব কায়স্যোৎপত্তিঃ; সোঽয়ং প্রতীত্য সমুৎপাদো দৃষ্টব্যান্যথয়িতব্যঃ। তত্রৈতেষ্বেব ষট্‌সু ধাতুসু মাতৃসংজ্ঞা, পিতৃসংজ্ঞা, নিত্যসংজ্ঞা, সুখ সংজ্ঞা, সত্যসংজ্ঞা, পুদ্গলসংজ্ঞা, মনুষ্যসংজ্ঞা মাতৃ দুহিতৃ সংজ্ঞা, অহঙ্কারমমকারসংজ্ঞা। সেয়মবিদ্যাঽস্য সংসারানর্থসম্ভারস্য মূলকারণং তস্যামবিদ্যায়াং সত্যাং সংস্কার রাগদ্বেষ মোহাবিষয়েষু প্রবর্ত্তন্তে—বস্তুবিষয়া বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞানং বিজ্ঞানশ্চত্বারোরূপিণঃ, উপাদানস্কন্ধা স্তন্নাম, তান্যুপাদায় রূপমভিনির্ব্বর্ত্ততে। তদেকত্বমভিসংক্ষিপ্য নামরূপং নিরূপ্যতে। শরীরস্যৈব কলল বুদ্বুদাদ্যবস্থা নামরূপ সম্মিশ্রিতা, তানীন্দ্রিয়াণি ষড়ায়তনং নাম রূপেন্দ্রিয়াণাং, ত্রয়াণাং সন্নিপাতঃ স্পর্শ স্পর্শাদ্বেদনা সুখাদিকা, বেদনায়াং সত্যাং কর্ত্তব্য মেতৎ সুখং পুনর্ম্ময়া ইত্যধ্যবসিতং তৃষ্ণা ভবতি—"ইত্যাদি। *

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের জ্ঞানপূর্ব্বক রচয়িতা কেহ নাই; ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ বুদ্ধদেব, শিষ্যদিগের নিকট জগতের কার্য্যকারণ ভাব ঘটিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধমতে সকল বস্তুই প্রতীতিনিষ্পন্ন। তজ্জন্য তাহারা কার্য্যমাত্রকেই প্রতীত্য নামে ব্যবহার করে। সমুদায় কার্য্যে দুই প্রকার কারণ অনুস্যূত আছে। একের নাম হেতূপনিবন্ধ; অপরের নাম প্রত্যয়োপনিবন্ধ, হেতূপনিবন্ধ এই যে, কার্য্যোৎপত্তি কালে যাহাতে মাত্র হেতুভাব থাকে, যেমন অঙ্কুরোৎপত্তির প্রতি বীজে হেতুভাব। প্রত্যয়োপনিবন্ধ এই যে, কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ দ্রব্যের সমবায় (সংযোগ) থাকে যথা উক্ত অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্ব্বে পার্থিবাদি কার্য্য দ্রব্যে সমবায় ছিল। এই হেতূপনিবন্ধ ও প্রত্যয়োপনিবন্ধ নামক কারণদ্বয় বাহ্য জগতে আছে; আধ্যাত্মিক কার্য্যেও আছে। তন্মধ্যে বাহ্য প্রতীত্য সমুৎপত্তি বিষয়ে (ঘট পট বৃক্ষাদি উৎপত্তি বিষয়ে) এই রূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে পত্র, ক্রমে কাণ্ড, নাল, গর্ভ, শূক (পুষ্প বা ফলের কোষ) পুষ্প ও ফল জন্মে। এই একটি হইতে আর একটির জন্ম হওয়াকে হেতূপনিবন্ধ বলাযায়। বীজ না থাকিলে অঙ্কুর জন্মে না; পুষ্প না থাকিলে ফল জন্মে না; পুষ্প থাকিলে ফল হইতে পারে; বীজ থাকিলে অঙ্কুর হইতে পারে; কিন্তু বীজ যে অঙ্কুরকে জন্মায়; তাহাতে বীজের এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি অঙ্কুরকে জন্মাইতেছি।

অঙ্কুরেরও এমন জ্ঞান হয় না, যে, আমি বীজ হইতে জন্মলাভ করিয়াছি। পুষ্প, ফল,সকলেরই এইরূপ জানিবা; অতএব বীজাদির চৈতন্য না থাকিলেও, চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও, কার্য্যকারণ ভাবের ব্যঘাত নাই। বরং কার্য্যকারণ ভাব নিয়মিতরূপেই আছে। অঙ্কুর কার্য্যের হেতুভাব পক্ষে যেমন, প্রত্যয়ভাব পক্ষেও (কারণ দ্রব্যের সংযোগ ঘটনা পক্ষে) সেইরূপ। পৃথিবী ধাতু, জলধাতু, বায়ুধাতু, তেজোধাতু, আকাশধাতু, ও রূপধাতু, (বৌদ্ধেরা মূল পদার্থকে ধাতু বলে) এই ছয়টি ধাতুর সমবায় অর্থাৎ সংযোগ বিশেষ দ্বারা উক্ত অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পৃথিবী ধাতু সংগ্রাহ কার্য্য করে (যে কার্য্য দ্বারা অঙ্কুরের কাঠিন্য জন্মে) জলধাতু অঙ্কুরের স্নেহভাব সম্পাদন করে (যাহাতে অঙ্কুর সরস থাকে বীজের উচ্ছূনতা জন্মে) তেজোধাতু বীজকে পরিপাক করে (যে ব্যাপারে বীজাংশ অঙ্কুর ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে) বায়ুধাতু অভিনির্হার করে, (যদ্বলে অঙ্কুর বীজ হইতে বহিস্কৃত হয়) আকাশধাতু বীজকে অনাবরণ করে, (যাহাতে বীজমধ্যে অঙ্কুর স্থানপ্রাপ্ত হয়) রূপধাতু বীজকে রূপান্তরে নিয়োজিত করে, (ইহার প্রভাবেই অঙ্কুর দৃশ্যমান হয়) এইরূপ ষড়্ধাতুর সমবায় বলেই অঙ্কুর কার্য্যে আত্মলাভ করে। সমবায় না থাকিলে আত্মলাভ করে না। এখানেও পৃথিবীধাতুর এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি অঙ্কুরিত করিবার নিমিত্ত বীজকে সংগ্রহ করিতেছি। বাহ্য প্রতীত্য সমুৎপাদ মধ্যে (বাহ্যস্থ কার্য্য সমূহ মধ্যে) ও রূপভাব কোথাও দৃষ্ট হয় না। যেমন বাহ্য কার্য্যের জ্ঞান পূর্ব্বক উৎপত্তি নাই, তেমনই আধ্যাত্মিক কার্য্যেরও নাই।

আধ্যাত্মিক কার্য্য সমুৎপাদেরও পূর্ব্ব প্রকার দ্বিবিধ কারণ আছে। অবিদ্যা, সংস্কার, যাবজ্জাতি, জরা মরণ প্রভৃতির উত্তরোত্তর হেতু হেতুমদ্ভাব, আর পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ুঃ, আকাশ, ও বিজ্ঞান,এই ষড়্বিধ কারণ দ্রব্যের সমবায় ভিন্ন দেহোৎপত্তি হইতে পারে না। অবিদ্যা ব্যতিরেকে সংস্কার জন্মে না, সংস্কার ব্যতিরেকে যাবজ্জাতি, যাবজ্জাতি ব্যতিরেকে জরা মরণ হয় না। এখানেও যখন অবিদ্যা সংস্কার জন্মায়, তখন অবিদ্যার জ্ঞান হয় না যে, আমি সংস্কার উৎপন্ন করিতেছি; সংস্কারেরও জ্ঞান হয় না যে, আমি অবিদ্যা হইতে জন্মলাভ করিয়াছি বা করিতেছি। অতএব বীজাদির ন্যায় অবিদ্যা প্রভৃতিরও চৈতন্য না থাকিলেও অন্য চেতনাবান্ পুরুষের অধিষ্ঠান না থাকিলেও সংস্কারাদির জন্ম লাভ দৃষ্ট হয়। এই অধ্যাত্মিক হেতূপনিবন্ধ পক্ষে যেরূপ, প্রত্যয়োপনিবন্ধপক্ষেও সেইরূপ; পূর্ব্বোক্ত ষড়্ধাতুর সমবায় বশতঃ শরীরের উৎপত্তি। পৃথিবী ধাতু শরীরের কাঠিন্য সম্পাদন করে; জল ধাতু স্নেহিত

করে। তেজো ধাতু ভুক্তাগ্ন পানাদি পরিপাক করে, বায়ু ধাতু শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করে, আকাশ ধাতু ছিদ্রভাব জন্মায়। বিজ্ঞান ধাতু, নাম রূপাদির কারণ। এই বিজ্ঞান পঞ্চস্কন্ধাত্মক; এই যড়্ধাতু অবিকল ভাবে সংহত হইলেই শরীরের উৎপত্তি হয়, নচেৎ হয় না। এস্থলেও পৃথিবী ধাতুর কখনই জ্ঞান হয় না যে, আমি শরীরের কাঠিন্য সম্পাদন কবিতেছি। শরীব হইতেই বিজ্ঞানের বা বিজ্ঞানান্তরের উৎপত্তি হয়; কিন্তু শরীর কখনই জানে না যে, আমি বিজ্ঞানের উৎপত্তি করিতেছি। অতএব পৃথিব্যাদি সমস্ত ধাতু স্বয়ং অচেতন হইলেও চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও শরীরের উৎপত্তি হয়, অন্যথা হয় না। ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সুতরাং অন্যথা কবিবার পথও নাই।*

উক্ত ধাতু ষট্‌কের সমবায় ভাবকে লোকে দেহ, পিণ্ড, নিত্য, সুখ, সত্ত্ব, পুদ্‌গল, মনুজ ইত্যাদি নানা নামে ব্যবহার করে। এবং তাহার স্ত্রী, পুত্র, পিতৃ, মাতৃ, দুহিতৃ প্রভৃতি নানা নাম কল্পনা করে। উহাকে অনর্থ শতসন্তার সংসার বলে; এই সংসারের মূল কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে বিষয়ের প্রতি রাগ, দ্বেষ, মোহ জন্মে। বস্তু আকার ধারী বিজ্ঞানবিষয়। বস্ত্বাকার বিজ্ঞান চারি প্রকার। রূপ বিশিষ্ট উপাদান স্কন্ধ নাম প্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানদ্বয়ের একীভাব, নাম রূপের আশ্রয়। শরীরের কলল ও বুদ্বুদাদি অবস্থা, নাম রূপ, মিশ্রিত ইন্দ্রিয় সকল, ষড়ায়তন, নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগকে স্পর্শ বলে। স্পর্শ হইতে বেদনা(অনুভব শক্তি)বেদনা হইতে তৃষ্ণা (এই সুখ পুনশ্চ করিব ইত্যাকাব ভাবনা) জন্ম গ্রহণ করে।

সংক্ষেপতঃ বৌদ্ধ লক্ষণ এই রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"তথাহি কৃত্যাদেবী* বাক্যং
লোকে ভগবতো লোক নাথাদারভ্য
কেবলম্।
যে জন্তবো গত ক্লেশান্ বোধিসত্ত্বান চেহিতান্। সাগসেপি নকুপ্যন্তি ক্ষময়া চোপকুর্ব্বতে। বোধিং স্বস্থৈব নেষ্যন্তি তে বিশ্বধবণোদ্যমাঃ।"

অর্থাৎ ভগবান্ লোকনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া, যে সকল জীব গত ক্লেশ (মুক্ত) হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তুমি বোধিসত্ত্ব বলিয়া জান। অপরাধ করিলেও যাঁহারা কোপ করেন না, প্রত্যুত ক্ষমাগুণে উপকার করেন, অন্যকে গতক্লেশ করিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা বোধিসত্ত্ব, তাঁহারাই বিশ্বধারণে উদ্যত।

বৌদ্ধগণের মতে তাদৃশ ধর্ম্ম কখন প্রকাশ হয় নাই, যথা "বোধিসত্ত্বস্য পূর্ব্বমশ্রুতেষু ধর্ম্মেষু—" এবং বুদ্ধদেবকে

*এতাবতা এই বলা হইল যে জগতের কোন চৈতন্যবান্ স্বতন্ত্র কর্ত্তা নাই।

* কৃত্যাদেবী বৌদ্ধানাং অভিচারোৎপন্না ধর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী দেবী।

তাহারা "জরা, মরণবিঘাতী ভিষগ্বর ই বোদ্ধগতঃ" জ্ঞান করিত। তাহাদিগের মতে মনুষ্য জন্ম কেবল কষ্টদায়ক এবং জন্মিলেই সকল জীবকে জরা ব্যাধি এবং মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে, সুতরাং জ্ঞানিগণের নির্ব্বাণ কামনা করা একান্ত কর্ত্তব্য, বৌদ্ধমাত্রেরই পূর্ব্বজন্ম এবং পরজন্মে বিশ্বাস আছে, এবং তাহাদের মতে নিজ ২ কর্ম্ম দ্বারা জীব মাত্রে বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ করে। কথিত আছে, শাক্য সিংহ স্বয়ং হস্তী, মৃগ প্রভৃতি পশুযোনি হইতে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংসার কেবল কষ্টময়; এবং জীব নিজকর্ম্ম দ্বারা সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

নিরীশ্বর সাংখ্য কপিল, ঈশ্বরের সত্তা অস্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোন বিচার উপস্থিত করে নাই বটে, কিন্তু সাংখ্যের ন্যায় ইহারাও নাস্তিক। বুদ্ধের উপদেশ মধ্যে কোন স্থানেই ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নাই। বৌদ্ধেরা প্রায় স্বাভাবিকবাদী; তাহারা বলে স্বভাব সৃষ্টি হয় নাই; চিরকাল এক অবস্থায় আছে। ইকার্ট, টলর, বুক্নর প্রভৃতি জর্ম্মণ তত্ত্ববিদ্‌গণের এই মত, অধিকন্তু তাঁহারা ঈশ্বরের সত্তা লোপ করিবার জন্য নানা কৌশলময় তর্কপরিপূর্ণ গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। যিশুখ্রীষ্টের ন্যায় শাক্য সিংহ বৌদ্ধগণকে এই দশ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন; যথা জীবহিংসা করিও না, চুরী করিও না, পরদার করিও না, মিথ্যা বলিও না এবং মাদক দ্রব্য সেবন করিও না। এই পাঁচটী ভিন্ন ভিক্ষুগণকে এই ৫টী আজ্ঞা দিয়াছেন; যথা দ্বিতীয় প্রহর বেলা অতীত হইলে আহার করা অকর্ত্তব্য, নাট্যক্রীড়া ও সঙ্গীতাদি হইতে বিরত থাকা কর্ত্তব্য, অলঙ্কারাদি এবং সুগন্ধদ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নহে, দুগ্ধফেণনিভশয্যায় শয়ন অনুচিত এবং সুবর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করা উচিত নহে। বুদ্ধের নীতি অতি চমৎকার, তাহা পাঠ করিলে বৌদ্ধধর্ম্মের উপর ভক্তির উদ্রেক হয়। আধুনিক সভ্যগণ কহেন, যীশুপ্রণীত উপদেশ একমাত্র সুখশান্তির উপায় স্বরূপ, কিন্তু বুদ্ধের উপদেশ তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ উৎকৃষ্ট, তাহার প্রমাণ একবার "ধর্ম্ম পদ" গ্রন্থপাঠে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাবৃহস্পতি আধুনিক তত্ত্বদর্শী অগষ্ট কোমৎ বৌদ্ধগ্রন্থের বিশেষ আদর করিয়াছেন এবং উহা প্রত্যক্ষ দর্শনবাদিগণকে এক ২ বার পাঠ জন্য দিন নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করাই বৌদ্ধগণের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভিক্ষুগণ তজ্জন্য নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। মাধবাচার্য্য কহেন "কৃত্তিঃ কমণ্ডলুর্মৌণ্ড্যং চীরং পূর্ব্বাহ্ন ভোজনম্। সঙ্ঘো রক্তাম্বরত্বঞ্চ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুভিঃ।

অর্থাৎ চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীর, পূর্ব্বাহ্ন ভোজন, সমূহাবস্থান, ও রক্তাম্বর এই কয়েকটি বৌদ্ধ দিগের যতি ধর্ম্মের অঙ্গ*। ইহারা মালা জপিবার সময় এই মাত্র পালি ভাষায় কহিয়া থাকে"অনিত্য দুঃখম্ অনাত্য" ইহাকে ত্রিলক্ষণ কহে। বৌদ্ধেরা কোন প্রকার উপাসনা করে না, কেবল বিহারে বুদ্ধ মূর্ত্তির সমীপে ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া থাকে। রোমান্ কাথলিকগণ পাদ্রির নিকট যেমন প্রতি সপ্তাহে আপনার পাপকার্য্য সকল স্বীকার করিয়া আইসে, তদ্রূপ পূর্ব্ব কালে বৌদ্ধগণ ধর্ম্মসঙ্ঘমধ্যে স্থবিরগণ সমীপে স্ব স্ব পাপ স্বীকার করিত। প্রিয়দর্শী এজন্য মাসে দুইবার সভা করিতে স্তম্ভের লিপিতে অনুজ্ঞা দিয়াছেন। সিংহলে ভিক্ষুগণ বিহার মধ্যে ভক্তি সহকারে নিম্ন লিখিত পালি প্রতিজ্ঞা পাঠ করে যথা—খুদক পাঠ।

"নমতসভাগবত অর্হত সম সমবুদ্ধস:

বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।
ধর্ম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি।
"দ্যুতম্পি বুদ্ধম শরণম্ গচ্ছামি।
দ্যুতম্পি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
দ্যুতম্পি ধর্ম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
দ্যুতম্পি সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীত্তম্পি বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীত্তম্পি ধর্ম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীত্তম্পি সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি।

শরণ্যতম্।"

বৌদ্ধ আচার্য্য প্রণীত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে; কিন্তু আমাদিগের আর্য্যশাস্ত্র ব্যবসায়িগণ তাহার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই। তাঁহারা প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক এবং সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ মধ্যে যেটুকু বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবরণ আছে তাহাই জানেন মাত্র; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদিগের কোন২ বঙ্গদেশীয় সামান্য নৈয়ায়িক, ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী এবং কিয়দংশ কুসুমাঞ্জলি পড়িয়াই বৌদ্ধমতে দোষারোপ করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন। তাঁহারা মূল বৌদ্ধসূত্র সকল পাঠ করিলে এরূপ বালসুলভ চাপল্য প্রকাশ করিতে কখনই সাহসী হইতেন না। বৌদ্ধদিগের সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অনেক কাল হইতে দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল। আকবর বাদসাহের অনুজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণ গণ দ্বারা আবুলফজল বহু অনুসন্ধানে এক খানিও বৌদ্ধসূত্র সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণকে ধন্যবাদ দিতেছি, তাঁহাদিগের প্রযত্নে নেপাল হইতে অসংখ্য সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

নেপালের বৌদ্ধগণ কহেন ৮৪ সহস্র বৌদ্ধগ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলি নবধর্ম্ম নামে খ্যাত—অষ্ট সাহস্রিক, গণ্ডব্যূহ, দশভূমীশ্বর, সমাধিরাজ, লঙ্কাবতার, সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরিক, তথাগত গু-

* সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ। ৺ জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় অনুবাদ।

হৃক, ললিত বিস্তর, সুবর্ণ প্রভাস। বৌদ্ধ ধর্ম্মের গ্রন্থ সকল দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা উদান, নিদান, ইত্যুক্ত, জাতক, বৈপুল্য অদ্ভুত ধর্ম্ম, অবাদান, উপদেশ। প্রসিদ্ধ কতিপয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ যথা—প্রজ্ঞা পারমিতা, সারিপুত্রকৃত অভিধর্ম্ম দেবপুত্র কৃত অভিধর্ম্ম, ধর্ম্মস্কন্ধ-পাদ, কারণ্ডব্যূহ, ধর্ম্মবোধ, ধর্ম্মসংগ্রহ, সপ্ত বুদ্ধস্তোত্র, বিনয় সূত্র, মহানা সূত্র, মহানা সূত্রালঙ্কার, জাতক মালা, চৈত্য মাহাত্ম্য, অনুমান খণ্ড, বুদ্ধশিক্ষাসমুচ্চয়, বুদ্ধচরিত কাব্য,বুদ্ধকপাল তন্ত্র, সঙ্কীর্ণতন্ত্র প্রভৃতি; এই সকল গ্রন্থ অধিকাংশ অনেক অনুসন্ধানে হজসন্ সাহেব নেপালীয় বৌদ্ধগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"বোধিচিত্ত বিবরণ" নামক বৌদ্ধগ্রন্থ প্রণেতা ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন, বৌদ্ধের বহুতর শিষ্যের মধ্যে "সৌত্রান্তিকো বৈভাষিকো, যোগাচারো মাধ্যমিকশ্চেতি চত্বারঃ শিষ্যাঃ "সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার, ও মাধ্যমিক এই চারিজন শিষ্যই তদীয় ধর্ম্মের আচার্য্য। উক্ত সৌত্রান্তিক প্রভৃতি শব্দগুলি ওস্থানে নাম মাত্র বোধক কি তাহার শাস্ত্রপ্রস্থান বোধক স্থির করা যায় না। আমাদের যেমন ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্র প্রস্থানবোধক, গ্রন্থ কর্ত্তাদিগের নাম ভিন্ন, ঐসকল শব্দ তৎসদৃশ কি না, বলাযায় না।

যাহাহউক উক্ত চারি ব্যক্তি হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। নচেৎ বুদ্ধের উপদেশ কখনই বিভিন্ন মতাক্রান্ত নহে। উক্ত বোধিচিত্ত বিবরণ গ্রন্থকার ধর্ম্মকীর্ত্তি এই রূপ বলেন যথা

"দেশনা লোকনাথানাংসত্বাশয় বশানুগাঃ।
বিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈ র্বহুভিঃ
পুনঃ॥
গম্ভীরোত্তান ভেদেন কচিচ্চোভয়
লক্ষণা।
ভিন্নাপি দেশনা ভিন্না শূন্যতা দ্বয়
লক্ষণা॥

লোক নাথ অর্থাৎ বুদ্ধদেবের উপদেশ একরূপ হইলেও তদীয় শিষ্যদিগের অবস্থা ও বুদ্ধি একরূপ না হওয়াতেই বুদ্ধ শাস্ত্র বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। বুদ্ধমতের মূল প্রস্রবণ এক হইয়াও আচার্য্য গণের ভিন্ন২ মত দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে। এমন কি শাক্যসিংহের মত কিরূপ ছিল তাহা সহজে আচার্য্য গণের গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারা যায় না। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে চারিজন প্রধান আচার্য্যের মত সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র; তাহাতে বুদ্ধের নিজের মত যাহা সারিপুত্র, আনন্দ উপালী প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র আভাস দেওয়া হয় নাই। কৃষ্ণমিশ্র, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে যে বৌদ্ধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অতি ঘৃণিত, বিকৃত ভাবাপন্ন। বোধ হয়

তিনি "প্রজ্ঞাপারমিতা" প্রভৃতি সূত্রগ্রন্থ কখনই পাঠ করেন নাই; কেবল অন্য ধর্ম্মাবলম্বী প্রণীত অধুনিক সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠে, তাঁহার ভ্রম হইয়াছে। বুদ্ধের নিজের মত অতি পবিত্র, এজন্য হিন্দুগণ তাঁহাকে নারায়ণের অবতার বলিয়া থাকেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম সিংহল হইতে ক্রমে চীন, তিব্বত, মোঙ্গলিয়া, জাপান, শ্যাম, উত্তর সাইবেরিয়া এবং লাপলাণ্ড পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। অন্য কোন ধর্ম্মের এতদূর উন্নতি হয় নাই। এখনও পৃথিবীতে ৪৫৫০০০০০০০ ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী আছেন।

সিংহলে ও চীনদেশে এক্ষণে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ আদর আছে। চীন দেশের বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল সংস্কৃত ভাষা হইতে অনুবাদিত। সিংহলে বৌদ্ধ গ্রন্থের বহুল প্রচার, তথাকার গ্রন্থ সকল পালি ভাষায় লিখিত। সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার, তথা পালি ভাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থ নিচয়ের বিবরণ স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত হইবে। আমরা পাঠক বর্গকে উক্ত প্রস্তাবে পালিভাষার মূল গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় উপহার দিব।

শ্রীরাম দাস সেন।

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

সপ্তম প্রস্তাব।

বৈশ্যবর্গ—কৃষি এবং বাণিজ্য।

ব্রাহ্মণ ও রাজন্যবর্গ এবং তাঁহাদের আনুষঙ্গিক বিষয় সমস্ত যথাসম্ভব বিবৃত করিয়া এক্ষণে বৈশ্যবর্গ এবং তদানুষঙ্গিক বিষয় সকলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। বৈশ্যেরা আর্য্যসন্তান, আর্য্য সম্প্রদায়ের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত, বেদে অধিকারযুক্ত এবং আর্য্যসন্তান হইলে নিকৃষ্ট বর্ণের নিকট যে যে মান মর্য্যাদা ও প্রভুত্ব পাওয়া যায় ইহারাও সেই সকলের অধিকারী। এই কথাগুলি আমি রামায়ণের অনুসরণ করিয়া বলিতেছি না, আর্য্যজাতির অতি প্রাচীনতম গ্রন্থাবলীর অনুসরণ করিয়া বলিতেছি, এবং এ নিয়ম, এ রীতি যখন পরবর্ত্তী সময়েও প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, তখন যে উহা রামায়ণেরও সাময়িক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণেরা সমাজের শিরোরত্ন ভাবে জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রভৃতির শিক্ষা দ্বারা, এবং রাজন্যবর্গ রাজ্যপালন, দেশরক্ষা,

শান্তিস্থাপন ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা সামাজিক কল্যাণের যথাসম্ভব অংশ সাধন করিয়া স্ব স্ব ভার হইতে মুক্ত হইতেন। বৈশ্যেরা সেই সামাজিক কল্যাণের কোন অংশ কি পরিমাণে সাধনের ভার যুক্ত ছিলেন তাহা বিবেচ্য। মনু চতুর্ব্বর্ণের বৃত্তি নির্দ্দেশ নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকে কহিয়াছেন,

"ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণং।
বৈশ্যস্যতু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য
সেবনং॥
১১ অঃ ২২৬।

ব্রাহ্মণের তপ জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের তপ রক্ষণ, বৈশ্যের তপ বার্ত্তাশাস্ত্র এবং শূদ্রের তপ সেবন।—(১)

বৈশ্যেরা বাল্মীকির সময়ে সমাজের জন্য কখন বা কৃষিকার্য্যসাধন ও পশুপালন, কখন বা তাহার তত্ত্বাবধারণ এবং সাধারণতঃ বাণিজ্য ব্যবসায় করিতেন। বিশেষ বিদ্যা ও গুণবত্তা দেখাইতে পারিলে, কখন কখন বা রাজমন্ত্রিত্বেও অভিষিক্ত হইতে পারিতেন। এবং মনুর গ্রন্থের সহ রামায়ণের যদি কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়, তবে ইহাদিগের সামাজিক মর্য্যাদা, গার্হস্থ ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার মনুপ্রোক্তমত অবিকল না হউক প্রায় তদ্রূপ ইহা জ্ঞাতব্য।

এস্থানে একটি বিষয় বিবেচ্য। পূর্ব্বগত প্রস্তাব সকলের মধ্যে একাধিক স্থলে, মনুর বিধানিত নিয়ম মালা রামায়ণোক্ত বিষয়গুলি পরিস্ফুট করণে এবং সমর্থনে নিযুক্ত হইয়াছে এবং হইবে। কিন্তু ইহা যুক্তিসিদ্ধ কি না? বর্ত্তমান সময়ে অস্মদ্দেশীয় পুরাবৃত্ত সমালোচক দিগের মধ্যে এই এক নূতন সৌখিনত্বের উদয় হইয়াছে যে, আদিমকালীয় আর্য্যগণ জগৎস্থ পূর্ব্বাপর সকল জাতি অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহা যে কোনরূপে হউক প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং তাহা সমর্থনার্থে প্রমাণ স্থলে ইস্তক আর্য্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া, নাগাইত ভবভূতিপ্রণীত উত্তররামচরিত এবং শ্রীহর্ষপ্রণীত নৈষধচরিত পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রন্থ হইতেই বচন উদ্ধৃত করা হইয়া থাকে, যেন ঐ সকলই এক সময়ের গ্রন্থ, এবং একই সময়ের চিত্র প্রদর্শন করিতেছে। এরূপ লেখক এবং সমালোচক দিগের বিবেচনা করা উচিত যে, যুগপরিবর্ত্তনে রীতি নীতির ভূয়ঃপরিবর্ত্তন হইয়া থাকে;— একযুগের এমন অনেক বিষয় যাহা সুকাজ বলিয়া আদৃত ও গৃহীত হয়, যুগপরিবর্ত্তনে তাহাই আবার অকর্ত্তব্য বোধে ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। এতদ্রূপ যুগ হইতে যুগান্তরের পরিবর্ত্তন সাধারণ বা অগণনীয় নহে। অতএব

(১) বৈশ্য নামের ব্যুৎপত্তি এরূপ "বিশ্ to enter (fields &c) ক্বিপ affix and ষ্যঞ added"—Wilson. ইহার দ্বারা বৈশ্যবৃত্তি বিশেষরূপে জ্ঞাপিত হইতেছে।

যে সময়ের বিষয় আলোচনা করা যায়, তাহার প্রমাণস্থলীর মূল ভাগে, সেই সময়েরই প্রমাণ বচনাবলী প্রয়োজন যুক্তিসিদ্ধ। বাল্মীকির সময় সমালোচনায় সেই নিয়মই পূর্ব্বাপর নিরপেক্ষ ভাবে অবলম্বিত হইয়াছে। মনু প্রভৃতি যে যে গ্রন্থাবলীর বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সহ মূল প্রস্তাবের যথাসম্ভব অন্তরতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। তথাপি দেখিতে পাওয়া যাইবে যে পরস্পরের মধ্যে অন্তরতা রাখার চেষ্টা সত্বেও, মনুপ্রোক্ত বচন ও বিধান অধিক পরিমাণে এবং অধিক ঘনিষ্টতার সহিত গৃহীত হইয়াছে ও হইবে। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে মনুর সঙ্গে রামায়ণের কি সম্বন্ধ। রামায়ণের চতুর্থ কাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গে যৎকালে বিনাপরাধে শক্রতা করার নিমিত্ত বালি রামকে ভর্ৎসনা করিতেছে, তখন রাম নিয়মত বাক্যে বালির পাপের উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছেন বলিয়া আত্মদোষ ক্ষালন করিতেছেন।

"শ্রূয়তে মনুনা গীতৌ শ্লোকৌ চারিত্র বৎসলৌ।
গৃহিতৌ ধর্ম্মকুশলৈ স্তথা তচ্চরিতং ময়া ॥"

এখন দেখা যাইতেছে যে মনুর নাম রামায়ণের পরবর্ত্তী বা সমসাময়িক হওয়া দূরে থাকুক, উক্ত শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত যে তাহা বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। ফলতঃ মনুর নাম বহু প্রাচীন, ঋগ্বেদের প্রাচীনতম সূক্তে উক্ত। কিন্তু রাম এখানে যে মনুর কথা কহিতেছেন, তিনি স্মৃতিকর্ত্তা মনু, এবং রাম রাজধর্ম্মপালনার্থে তাঁহার অনুগামী। রামের আপন মুখ হইতে উক্ত হওয়ায় সেই স্মৃতি তাঁহার অর্থাৎ বাল্মীকির পূর্ব্বে প্রণীত। এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুকে স্মৃতিকারক বলিয়া উল্লেখ ব্যতীত বহুস্থলে মনুসংহিতা স্থিত বিধানমালা সহ বাল্মীকির সাময়িক ব্যবহারের অনেক সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছি ও করিব। এসকলের দ্বারা কি সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে মনু সংহিতা সে সময়েরও সমাজ পরিচালক ছিল? তৎপক্ষে উপরি উক্ত প্রমাণ যথেষ্ট বলিয়া আপাততঃ গ্রহণ করিতে পারা যায় না, যাহা হউক এতদ্বিষয় প্রবন্ধশেষে বাল্মীকির কাল নির্ণয়ে সবিস্তারে বিবেচ্য। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে এই মনুসংহিতা বাল্মীকির পূর্ব্বের, সমসাময়িক বা পরবর্ত্তীই হউক, কিন্তু তাহাতে প্রোক্তরূপ ব্যবহার বাল্মীকির সময়ে যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই কারণেই মনুসংহিতা এই প্রবন্ধে এত বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বৈশ্যবর্গের সহ কৃষিকার্য্যের সম্বন্ধ একটি প্রধান সম্বন্ধ। যে দেশে সপ্তসিন্ধু এবং গঙ্গাদেবী দুহিতৃগণ সহ হিমগিরি পরিত্যাগ করিয়া শতমুখে সাগরগামিনী হইয়াছেন, যে দেশে কমলাসনা লক্ষ্মী দেবীর জন্ম ও প্রভব, সে দেশে

যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই কৃষিবিষয়ে লোকের আগ্রহাধিক্য এবং সময়োচিত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা বলা দ্বিরুক্তি মাত্র। আর্য্যজাতির অতি প্রাচীনতম ঐতিহাসিক তত্ত্বময় ঋগ্বেদে ভূয়োভূয়ঃ কৃষি কার্য্যের উল্লেখ, তাহার শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন, এবং "কিনাশ" শব্দে নামিত কৃষক ও "কুল্যা" শব্দে জল প্রণালীরও অস্তিত্ব সূচন হইয়াছে। (২) তদ্ব্যতীত কৃত্রিম জল প্রণালীরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। [৩] বহুস্থানে ধান [৪] এবং যবের [৫] নাম উক্ত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের এক স্থানে কথিত আছে "ব্রীহিম্ অত্তং যবম্ অত্তং অথো মাসম্ অথো তিলম্—"[৬] ১৪০-২১৬ ইত্যাদি।

এই সকলের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে বৈদিক সময়ে কৃষি কার্য্যের যথেষ্টই উন্নতি সাধন হইয়াছিল, এবং নানা উপায়ে ও পরিশ্রমে রত্নপ্রসবিনী বসুন্ধরা হইতে আর্য্যেরা বহুরত্ন দোহন করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এক্ষণে বাল্মীকির সাময়িক কৃষিকার্য্যের অবস্থা দেখা যাউক। এই সময়ে দেশের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বৈদিক সময়ের ন্যায়, এখানেও কৃষির অস্তিত্ব, কৃষিপ্রণালী বা তথাবিধ বিষয়ের নিমিত্ত রামায়ণ হইতে প্রমাণ বচন উদ্ধৃত করা বাহুল্য মাত্র এবং কিয়দংশে হাস্যজনক। বাল্মীকির সাময়িক সমাজের ন্যায় অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজে কৃষিকার্য্য রাজনিয়মে কতদূর রক্ষিত, কৃষিজীবীরা কিরূপ ব্যবহৃত, এবং কৃষিকার্য্য কিরূপ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল তাহাই দেখা আবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হয়। এই প্রবন্ধের চতুর্থ প্রস্তাব হইতে, দ্বিতীয় কাণ্ডের ১০০ সর্গের অংশ বিশেষের অনুবাদ এস্থলে গ্রহণ করিলাম। তথায় রামের অন্বেষণে ভরত চিত্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে, স্বদেশ সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ক প্রশ্ন মধ্যে রামকর্তৃক ভরত ইহাও জিজ্ঞাসিত হইতেছেন " সীমন্তে ক্ষেত্র সকল হলকর্ষিত ও শস্য সুপ্রচুর; যথা নদীজলেই কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, সেই সুসমৃদ্ধ জনপদ ত এক্ষণে উপদ্রব শূন্য? কৃষক ও পশুপালকেরা ত তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে?

(২) ঋগ্বেদ ১০-৩৪-১৩, ১০-১১৭-৭, ১০-৪৩-৭ ইত্যাদি।

(৩) "যাঃ আপো দিব্যাঃ উত বা শ্রবন্তি খনিত্রিমাঃ উত বা যাঃ স্বয়ং জাঃ।" এই স্থান সম্বন্ধে অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত কহেন "from this it is not unreasonable lands under cultivation may have been practised"—Muir.

(৪) ঋগ্বেদ ৩ ৩৫-৩, ৬ ২৯ ৪ ইত্যাদি।

(৫) ঋগ্বেদ ১-৬৬-৩ যব সম্বন্ধে Messrs Böhtlink and Roth বলেন, যব অর্থে বৈদিক সময়ের উৎপন্ন সকল প্রকার শস্যকেই বুঝাইত। এস্থল মুর সাহেব কর্তৃক উদ্ধৃত অংশ হইতে সঙ্কলিত হইল।

(৬) Muirs Sanscrit test নামক পুস্তক হইতে গৃহীত বচন।

এবং উহারা স্বস্ব কার্য্যে রত থাকিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে ত কালযাপন করিতেছে? ইষ্ট-সাধন ও অনিষ্ট নিবারণ পূর্ব্বক তুমি ত উহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাক?" (৭) এইটি কৃষকদিগের পক্ষে যেমন অনুকূলবাক্য, এমনটি রামায়ণের অন্যত্রে দুর্লভ। কিন্তু এটি খাটি বাল্মীকির মুখ নিঃসৃত বাক্য বলিয়া সন্দেহহীন হওয়া যায় না, বা তাহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারা যায় না, তৎপক্ষে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। (৮) পুনশ্চ রামায়ণের দ্বিতীয়কাণ্ডে সপ্তষষ্ঠি সর্গে রাজশাসনের শিথিলতায় কৃষিকার্য্যের দুরবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, এবং ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গে রামের বনবাস এবং ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তা হেতু কৃষিজীবী ও পশুপালকগণ যথেষ্ট পরিমাণে আশ্রয় পাইবে না বলিয়া ব্যাকুল হইয়াছিল। ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকলের দ্বারা অনুমিত হয় যে, রাজশাসনের শিথিলতা বা রাজা অকর্ম্মণ্য অথবা অল্পাশয় হইলে, কৃষিজীবীর উপর অত্যাচারীর অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইত। সে যাহাহউক, সমস্ত বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, দেশে যখন "রামরাজ্য" প্রবর্ত্তিত হইত, তখন ত কৃষির প্রতি তৎকালোচিত বুদ্ধি অনুরূপ যত্ন এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণ হইতই; তদ্ব্যতীত অন্য সময়েও যথাযথ হইতে ত্রুটি হইত না। রাজারা স্বয়ং আত্মহিসাবে লোকদ্বারা পশুপাল রক্ষা এবং কৃষিকার্য্য করাইতে ত্রুটি করিতেন না। মনুসংহিতায় দৃষ্ট হইবে যে, সকল শ্রেণীর আর্য্যেরাই কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে যথাসম্ভব মমতা করিতেন, এবং তাহার উন্নতিসাধন পক্ষে যত্নপরায়ণ ছিলেন। ইহার আদরও এতদূর ছিল যে, আবশ্যক মতে ব্রাহ্মণেও লাঙ্গল ধরিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। রামায়ণের এক স্থানে উক্ত হইয়াছে,

"তত্রাসীৎ পিঙ্গলো গার্গ্যস্ত্রিজটো নামবৈ দ্বিজঃ।
ক্ষতবৃত্তির্বনে নিত্যং ফালকুদ্দাল লাঙ্গলী॥
২।৩২।২৯

এখন জিজ্ঞাস্য, যেন কৃষি কার্য্য আদৃত বা সুরক্ষিত হইল, কিন্তু কৃষিজীবী কি সর্ব্বদা তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিতে এবং ধনশালী হইতে পারিত? বোধ হয় সর্ব্বস্থানে নহে। তাহা হইলে সাধারণ প্রজাবর্গের অসম্পন্ন অবস্থা লক্ষিত হয় কেন? কৃষিকার্য্যের প্রতি উর্দ্ধ হইতে আদর, যত্ন, এবং সুরক্ষণ সংযোজন হইলেই যদি কৃষিজীবী আপন পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল ভোগ করিতে পারিত, তবে নীলকরের প্রজার এ দুর্দ্দশা কেন? নীলকরেরা ত নীলের চাসের

(৭) এস্থানের মূলাংশ বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না। যাহাদের দেখিতে ইচ্ছা হইবে ২।১০০।৪৩-৪৮ এবং রামানুজের টীকা দেখিবেন।

(৮) বঙ্গদর্শন ৩ সংখ্যা ১১৭ পৃষ্ঠা টীকা দেখ।

উপর কম আদর, কম যত্ন, কম রক্ষণ করে না।

কৃষি এবং কৃষিজীবীর অবস্থা অন্য প্রকারে দেখা যাউক। রামায়ণ দৃষ্টে স্পষ্টতঃ দেখা যাইবে যে তখন ভারতবর্ষে বহুধনের সমাগম হইয়াছে। স্ফাটিক গবাক্ষ (৯) যুক্ত ইন্দ্রভবন তুল্য অত্যুচ্চ অট্টালিকা, সুরম্য উদ্যান মালা, রথ শিবিকা প্রভৃতি যান, মণি মাণিকের ছড়া ছড়ি, দেশীয় ও বিদেশীয় শিল্পজাত বহুবিধ দ্রব্য সকল, ইহাদের ভূয় উল্লেখে কে না অনুমান করিবে যে রামায়ণের সময়ে উত্তর ভারত অত্যন্ত ধনশালী হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাহাই। কেবল রামায়ণের প্রমাণ যদি অত্যুক্তি বলিয়া অভ্রান্ত ভাবে গ্রহণ করিতে না পারাযায়, তবে মনুসংহিতা দেখ, বাল্মীকিবর্ণিত সমাজের ন্যায় অনুরূপ উন্নত সমাজের চিহ্ন পাওয়া যাইবে, এবং ইহা কিয়দংশে রামায়ণের সময়ের উপর বর্ত্তিতে পারে। আবার বৈদেশিক ইতিহাস আলোচনা দ্বারা জানা যাইবে যে আসিরীয়া দেশীয় রাণী শমিরমা [যাহার প্রাদুর্ভাব কাল বাল্মীকির সময় হইতে অল্পই এদিক ওদিক,] অন্যান্য দেশ জয় করিয়া ভারতের গৌরব এবং ধনশালিত্ব শ্রবণে ভারতজয়ে অগ্রসর হয়েন। ঐরূপ বাল্মীকির অনতি দীর্ঘকাল পরবর্ত্তী দরায়ুস একমাত্র সপ্তসিন্ধুর কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন, তাহা বাহ্লিক প্রভৃতি ঘৃণাস্পদ এবং হীনজাতি দ্বারা অধিকাংশ অধিবেশিত হইলেও এত ধনশালী ছিল, যে তথা হইতে বাৎসরিক কর ৩৬০ ট্যালেণ্ট অর্থাৎ ১০০৮০০০ টাকা আদায় হইত। (১০) হিরোডোটসের পরবর্ত্তী টিসিয়স সপ্তসিন্ধুবিষয়ক বর্ণনায় কহিয়াছেন যে তাঁহার জ্ঞাতসারে যত দেশ আছে, সপ্তসিন্ধু প্রদেশ সে সকল অপেক্ষা স্বচ্ছন্দতা ও সৌভাগ্যযুক্ত এবং ধনশালী। যখন একমাত্র পঞ্জাবের অংশবিশেষ সম্বন্ধে ধনবত্তার এত গৌরব, তখন সর্ব্বগরিমার স্থল অনুগঙ্গ মধ্যদেশ যে আরও ধনশালী ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং শমিরমার সাময়িক ও হিরোডোটস এবং টিসীয়স কর্ত্তৃক বর্ণিত ধনশালিতার পূর্ব্বসম্বন্ধ স্বচ্ছন্দে রামায়ণের সময়ের সহিত যোজনা করিতে পারা যায়।

(৯) রামায়ণ ৪র্থ কাণ্ড ১সর্গ ৩৮ শ্লোক। ইউরোপ ভূমে প্লিনির সময়ের অব্যবহিত পরে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হয়।

(১০) Hero: III 94. হিরোডোটসের মতে (Hero: III 98) ভারতবর্ষ অতি পূর্ব্বতম দেশ। তৎপরে মরুস্থান। ইহাতে বোধ হয় দরায়ুসের রাজ্য হিরোডোটস যাহা নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা পঞ্জাবের অংশ মাত্র। উপরোক্ত মরুস্থান বোধ হয় পঞ্জাব হইতে আরম্ভ রাজপুতানার মরুস্থান। তাহার পর (III 10) পঞ্জাবের অর্থাৎ কথিত দেশের দক্ষিণে লোকের বাস এবং তাহারা দরায়ুসের অধীন নহে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই সকল হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে দরায়ুসের ভারতীয় রাজ্যের বিস্তার কত সঙ্কীর্ণ ছিল।

দেশ এরূপ ধনশালী হওয়ার প্রধান কারণ বাণিজ্য। বাণিজ্যের পূর্ব্বগামী সচরাচর শিল্প অথবা তদভাবে কৃষি, কিন্তু কৃষি উভয়েরই পূর্ব্বগামী। সুতরাং কৃষির শ্রীবৃদ্ধির উপর পূর্ব্বকথিত সর্ব্বপ্রকার ধনশালিতা প্রধানতঃ নির্ভর করে। স্মরণ থাকে যেন এ নিয়ম উর্ব্বর ভূমি যুক্ত প্রদেশের প্রতিই প্রযুক্ত হইতেছে। একসমাজ যতগুলি লোকদ্বারা সঙ্ঘটিত, তাহার যে অংশ কৃষক, কৃষিদ্বারা তাহাদের ভরণ পোষণ হইয়াও যদি সমাজস্থ অবশিষ্টলোকের পোষণার্থে কৃষিজাত দ্রব্য উদ্বর্ত্ত থাকে, তবেই তদ্দ্বারা সমাজ রক্ষা এবং ভাবী ধনশালিতার উপায় বৃদ্ধি হয়। এই সময়ে কৃষিকার্য্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় বস্তু সম্বন্ধে সামান্য শিল্পের উদ্ভব হয় বটে, কিন্তু কৃষি কার্য্যের ন্যায় লাভযুক্ত না হওয়ায়, শিল্পীরা বহুপরিশ্রমে কৃষিকরণোপযোগী কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিলেই, কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত হয়। ইউনাইটেড ষ্টেটে অবিকল এই অবস্থা গিয়াছে, এবং এখনও অনেক পরিমাণে চলিতেছে। এতদ্দ্বারা সমাজ পোষণোপযোগী দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াও যখন অনেক অধিক থাকে, তখন সেই সকল শিল্পও বাণিজ্যার্থে, বা তন্নিমিত্ত অপরাপর দ্রব্য উৎপন্নে এবং তাহাও তদ্রূপ নিয়োগ হেতু, নিয়োজিত হয়, এবং তদ্দ্বারা দেশ ধনশালী হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বোক্ত কারণানুসারে ভারতের ঐশ্বর্য্য গণনা করিলে, ইহা অবশ্যই অনুমেয় যে তৎকালে ভারতের কৃষিকার্য্য সময়োচিত বিপুলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কথিত আছে যে, যে দেশে যত খাদ্যের উৎপত্তি হয়, সে দেশে কেবল উপস্থিত জীবন সমূহের পোষণার্থে উপযুক্তাংশ মাত্র রাখিলে, অপরাংশ হয় উপস্থিত ব্যক্তিগণের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করে, নতুবা সে সুখ স্বচ্ছন্দতার খর্ব্বতা সাধনে রাজ্যে লোক বৃদ্ধি করিয়া থাকে। বৈদিক সময়ের সহিত তুলনা করিলে, বাল্মীকির সময়ে সেরূপ লোকবৃদ্ধির আধিক্য বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। ম্যালথস যে হারে যত দিনে লোক বৃদ্ধির নিয়ম নিরূপণ করিয়াছেন, সে নিয়মানুসারে বৈদিক সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বাল্মীকির সময়ের মধ্যে উত্তর ভারতবর্ষ লোকে পরিপূর্ণ হওয়া উচিত। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সমস্ত স্থান যেমন আর্য্যরাজভুক্ত হইয়াছে, তেমন সমস্ত স্থান লোকসঙ্কুল হয় নাই। ভরতকে আনয়নার্থে দূত যে পথে কেকয় রাজভবনে গিয়াছিল, এবং ভরত যে পথে অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই নিবিড় ও দুরতিক্রম্য জঙ্গলে পূর্ণ। আবার যমুনার দক্ষিণ তীর হইতেই নিবিড় বনের সঞ্চার। গুহদ্বারস্থিত অঙ্করাজভবনে গমন কালীন, দশরথকে এমত জঙ্গল জনশূন্য স্থান দিয়া যাইতে হইয়াছিল, যে কর্ণেল টড তাহাতে মোহযুক্ত হইয়া ভ্রম প্রমাদে পড়িয়া অঙ্গকে তিব্বত বা আভা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র জনক ভবনে গমন কালীন কতই জনশূন্য স্থান অতিক্রম করিয়াছিলেন। এখন দেখ, সেই সকল স্থানে এতই লোকের আধিক্য হইয়াছে, যে তাহাদের জন্য আজি কালি অন্যত্রে উপনিবেশ স্থাপনের আন্দোলন হইতেছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে বাল্মীকির সময়ের লোক সংখ্যা কত অল্প। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে জীবনোপায় বৃদ্ধির সঙ্গে বাল্মীকির সময়ে অনুরূপ লোক বৃদ্ধি না হইয়া বিলাস বৃদ্ধি হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাহাই। বলিতে কি যেরূপ অপরিমিত, সুশৃঙ্খল বিলাস, এবং স্বচ্ছন্দতা তৎকালে দেখা যায়, সে সময় বিবেচনা করিলে, তাহা আশ্চর্য্য জনক। কিন্তু এ বিলাস, এধন, এ স্বচ্ছন্দতা কোথায় প্রবাহিত হইত?—ধনীর ঘরে, রাজার ঘরে; কিন্তু ধনী দেশশুদ্ধ লোক নহে। বিশ্বব্যাপিনী রোমরাজ্য যেমন দুই সহস্র মাত্র পরিবারের সুখোৎপাদন করিত, ভারতেও তেমনি তাৎকালিকী ঐশ্বর্য্য কয়েক পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয়। কাঙ্গালের দশা সব কালেই সমান। রাজকর ষষ্ঠাংশ, (১১) অতএব যেখানে ৬টাকার দ্রব্য উপার্জন করিয়া একটাকা রাজাকে দিতে হইবে, সেখানে তাহাদের স্বচ্ছন্দতার সম্ভাবনা কোথায়? এতদ্ব্যতীত অন্য কোন রূপ কর, যুদ্ধব্যয় এবং মহাজনের দেনাও সম্ভবতঃ ছিল, তাহার পর রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচার, বা প্রজার অবশিষ্টাংশ ধন রক্ষায় অমনোযোগিতা, প্রজার নির্দ্ধনতার অপর কারণ। এই শেষোক্ত কারণ বোধ হয় বিশেষ রূপেই প্রবল ছিল। যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায় যে কৃষক আপন আবশ্যকীয় ব্যতীত কিছু বেশি ধন উপার্জন করিলেই, তাহা ভয় প্রযুক্ত ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিত। একাধিকস্থলে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। একস্থান হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"সমুদ্ধৃতনিধানানি পরিধস্তাজিরাণিচ।
উপাত্ত ধন ধন্যানি হৃতসারাণি সর্বশঃ॥"

রাম বনে যাইতেছেন, বলিয়া দুর্ভাগোরা আশঙ্কা করিতেছে যে, যে ধন ভূগর্ভে প্রোথিত আছে তাহা পর্য্যন্তও অপরাপর ধন ধান্য সহ কেকয়ী পুত্রের রাজত্বকালে অপহৃত হইবে। এখানে কেকয়ীর চরিত্র দৃষ্টে কেকয়ী পুত্রের গুণ অবধারণ করিয়াই তাহারা এত আশঙ্কা যুক্ত হইতেছে। ভাল রাজার আমলে, মাটিতে পুঁতিলেও বা কিছু রক্ষা হইত, এবার তাহাও হইবে না। যেখানে ধন প্রথমতঃ পূর্ব্ব প্রদর্শিত কারণে সঞ্চিত হওয়াই কঠিন, দ্বিতীয়তঃ যদি বা হইল, তাহা প্রকাশ রাখাই দায়, সেখানে নিম্নশ্রেণীর স্বচ্ছন্দতা বা ঐশ্বর্য্য সম্ভবেনা। তাহাদের পরিশ্রমের ফল অপরে ভোগ করিয়া থাকে।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, অপর শ্রেণীর লোক, যাহারা সামান্য শিল্প

(১১) বঙ্গদর্শন (৩) খণ্ড ২৫২. পৃষ্ঠা দেখ।

দ্বারা কেবল জীবিকা নির্ব্বাহ করিত এবং অপর লাভজনক কাজে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত উপযুক্ত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিত না, তাহাদেরই সম্ভবতঃ হীনাবস্থায় থাকার কথা। কিন্তু কথিত আছে যে, কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য তিনই বৈশ্যের হাতে, তবে কেন কৃষিজীবী বা পশুপালকের দশা তদ্রূপ হইত। এস্থলে উত্তর করি যে, কৃষি, পশুপালন এবং বাণিজ্য এ তিনই, এক ব্যক্তি সব সময়ে স্বহস্তে করিতে পারে না। যদিওবা কাহার ঐ তিন বিষয়ে একীভূত বিষয় ছিল, প্রথমতঃ তাহার কথা স্বতন্ত্র, ঐশ্বর্য্যে তাহাকে ঐ তিন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ অপর লোক দ্বারা সেই সেই কার্য্য সম্পন্ন করাইত। এমন স্থলে যাহারা স্বহস্তে কাজ করিত, এবং কৃষি দ্বারাই দিনান্তে যাহার অন্ন, তাহাদেরই অবস্থাকল্পে উপরে সমস্ত কথিত হইল। স্বাধীন কৃষক হইলেও, তাহার সঙ্গে একজন বাণিজ্য ব্যবসায়ীর লাভালাভের তারতম্য দেখ। একজন কৃষিজীবী ৬টাকার ধানউপার্জ্জন করিয়া রাজাকে এক টাকা দিবে, আর একজন বণিক ৫০টাকার সুবর্ণ উপার্জ্জন করিয়া সেই এক টাকা দিবে। এই তারতম্য হেতু, ইহাও জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, যে আদম স্মিথ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত মুদ্রার মূল্যাবধারণ তত্ত্ব তৎকালে এবং মনুর সময়ে আর্য্যদিগের নিকট সম্পূর্ণই অপরিজ্ঞাত ছিল। সামান্য শিল্প বা তথাবিধ ব্যবসায়ীদিগের অবস্থাও কৃষিজীবিগণ হইতে উন্নত ছিল না।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতি বঙ্গ কাব্যকাননের পিকবর। তাঁহার সঙ্গীতধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই সরস কবিতাকুসুমের বাসন্তসৌরভ বাঙ্গালায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সুধাময় ঝঙ্কার শুনিয়াই কত ভাবুক বিহঙ্গ ও মধুকর সুমধুর তানে গান করিতে আরম্ভ করিয়াছে; কত শত ভক্তের হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে; কত প্রেমিকের পুলকিত তনু অতুলআনন্দানিল হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়াছে। যখন অমৃতময় স্বর লহরী বিস্তার করিয়া কোকিল ঋতুরাজের আগমন বার্ত্তা দেয়, সে কি বলে বুঝি না বুঝি, তাহার স্বরে মন মোহিত হয়, হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে; সেইরূপ যখন বিদ্যাপতির গীত শ্রবণ করি, ভাল করিয়া বুঝি না বুঝি, তাহাতে মন মুগ্ধ হয়, হৃদয়ের অন্তরতম তন্তুপর্য্যন্ত বাজিয়া উঠে। এই কলকণ্ঠ ভাবুক পিকবরের

জীবনবৃত্তান্ত জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? আমরা অনুসন্ধান দ্বারা যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছি, এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিব। আমরা যাহা বলিব, হয়ত তাহাতে অনেকের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে, অনেকের চিরসঞ্চিত বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে। একাল পর্য্যন্ত যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত আমরা ঐকমত্য রাখিতে পারিব না।

বিদ্যাপতি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এপর্য্যন্ত কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারেন নাই। তবে ইহা জানা আছে যে তিনি চৈতন্য দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও কবি চণ্ডীদাসের সমসাময়িক লোক ছিলেন, এবং তিনি শিব সিংহ নামক রাজা ও লছিমা নাম্নী রাজ্ঞীর আশ্রয় পাইয়াছিলেন, আর রূপনারায়ণ নামে তাঁহার একজন বন্ধু ছিল। বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিগণের লেখা হইতে এসকল কথা সংগ্রহ করা যায়। চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে,

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহা প্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥ মধ্যখণ্ড।

চৈতন্য চরিতামৃতের এই এবং অন্যান্য কয়েকটী স্থল পাঠ করিয়া জানিতে পারা যায় যে চৈতন্য দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা শ্রবণ করিতে ভাল বাসিতেন। ভাল বাসিবারই কথা। চৈতন্য যেমন কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমিক, কৃষ্ণরসের রসিক, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসও তেমনই কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমিক, কৃষ্ণরসের রসিক ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত যে প্রীতির উৎস বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতায় তাহা বেগবতী নদী হইয়াছে, প্রেমের পাগল গৌরচন্দ্র কেননা তাহার রসপান করিতে উৎসুক হইবেন? নরহরিদাস লিখিয়াছেন,

জয় বিদ্যাপতি কবিকুল চন্দ।
রসিক সভাভূষণ সুখ কন্দ॥
শ্রীশিব সিংহ নৃপতি সহ প্রীত।
জগত ব্যাপি রহু বিশদ চরিত॥
লছিমা গুণহি উপজে বহুরঙ্গ।
বিলসয়ে রূপনারায়ণ সঙ্গ॥
বৃন্দাবন নব কেলি বিলাস।
করু কত ভাঁতি যতনে পরকাশ॥
শ্রীগোকুল বিধু গৌর কিশোর।
গণ সহ যাক গীতরসে ভোর॥
নরহরি ভণ অক কি কহব তায়।
অনুখন মন জনু রহে তছু পায়॥

পুনশ্চ,

বিদ্যাপতি কবি ভূপ।
অগণিত গুণ জন রঞ্জন, ভণব কি সুখময়
পিরীতি মুরতি রসকূপ॥
শিশু সময়াবধি অধিক পরাক্রম
বিরচল দেবচরিত বহু ভাঁতি।
কোই করল উপদেশ পরম রস উলসিত,
তাহে নিরত রহু মাতি॥

শ্রীশিব সিংহ নৃপতি লছিমা প্রিয় অতুল
বিমল যশ বিদিত হি ভেল।
শ্যামর গৌরী কেলিমলি সংপুট
যতনে উঘাতি ভুবন ধনি কেল॥
মরি মরি যাক গীত নব অমিয়
পিবি পিবি জীবই সে রসিকচকোর।
নর হরি তাক পরশ নাহি পাওল
বুঝব কি ওরস মরুমতি মোর॥

বৈষ্ণব দাস লিখিয়াছেন,

জয় জয় দেব কবি, নৃপতি শিরোমনি,
বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস, রসশেখর,
অখিল ভুবনে অনুপাম॥
যাকর রচিত মধুর রস নিরমল
গদ্য পদ্য ময় গীত।
প্রভু মোর গৌর চন্দ্র আস্বাদিলা
রায় স্বরূপ সহিত॥
যবহু যে ভাব উদয় দুহুঁ অন্তরে,
তব গায়হি দুহুঁ মেলি।
শুনইতে দারু পাষাণ গলি যায়ত,
ঐছন সুমধুর কেলি॥
আছিল গোপতে, যতন করি পহুঁ মোর
জগতে করল পরকাশ।
সোরস শ্রবণে, পরশ নাহি হোয়ল,
রোয়ত বৈষ্ণব দাস॥

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন,

কবিপতি বিদ্যাপতি মতি মানে।
যাক গীত, জগতচিত চোরায়ল,
গোবিন্দ গৌরী সরস রস গানে॥
ভুবনে আছয়ে যত ভারতী বাণী।
তাকর সার, সার পদসঞ্চয়ে,
বাঁধল গীত কতহুঁ পরিমাণি॥
যো সুখ সম্পদে শঙ্কর ধনিয়া।
সো সুখসার, হার, সব রসিকহি,
কণ্ঠহি কণ্ঠ পরায়ল বনিয়া।
আনন্দে নারদ না ধরয়ে থেহা।
সে আনন্দরস, জগভরি বরিখল,
সুখময় বিদ্যাপতি রসমেহা॥
যত যত রসপদ কয়লহি বন্ধে।
কোটিহি কোটি, শ্রবণপর পাইয়ে,
শুনইতে আনন্দে লাগই ধন্ধে॥
সোরস শুনি নাগর বরনারী।
কিয়ে কিয়ে করে চিত, চমকয়ে ঐছন,
রসময় চম্পু বিথারি॥
গোবিন্দদাস মতি মন্দে।
এত সুখ সম্পদ, বহইতে আনমন,
যৈছন বামন ধরবহি চন্দে॥

আমরা বৈষ্ণব কবিদিগের যে কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম, তদ্দৃষ্টে এই কয়েকটী কথা জানা যাইতেছে, (১) বিদ্যাপতির রচিত গীত শ্রবণে অনেক ভক্তের হৃদয় আনন্দে উচ্ছসিত হইয়াছে; (২) চৈতন্য সর্ব্বদাই ঐ সকল গীত শুনিতেন; (৩) শিবসিংহ নৃপতি ও লছিমা দেবীর সহিত বিদ্যাপতির সম্ভাব ছিল; (৪) রূপনারায়ণের সহিত তাঁহার সখ্য ছিল। এক্ষণে দেখা যাউক, বিদ্যাপতির লিখিত কবিতা হইতে তাঁহার কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির কোন কোন গীতে এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়,

কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে ॥

কোথাও এরূপ,

ভণ বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতী
এসব এরূপ জান।
রায় শিব সিংহ, রূপনারায়ণ।
লছিমা দেবী পরমাণ ॥

কুত্র এ প্রকার,

ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন সব যুবতী
ইহ রসকূপ যে জান।
রাজা শিব সিংহ, রূপ নারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ ॥

কোন স্থলে ঈদৃশ,

ভণয়ে বিদ্যাপতি, অপরূপ মূরতি,
রাধা রূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ, রূপ নারায়ণ,
একাদশ অবতারা ॥

কুত্র বা এবম্বিধ,

রাজা শিবসিংহ লছিমা দেবী সঙ্গ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহুঁ নিশঙ্ক ॥

কোথাও এপ্রকার,

বিদ্যাপতি কহ ভাখি।
রূপনারায়ণ সাখি ॥

এইরূপ বিদ্যাপতি লিখিত অনেক কবিতা হইতে জানিতে পারা যায় যে রাজা শিব সিংহ, লছিমা দেবী ও রূপনারায়ণের সঙ্গে তাঁহার সম্ভাব ছিল।

বাঙ্গালা ভাষায় পুরুষপরীক্ষা নামক একখানি গদ্য পুস্তক আছে; উহার প্রারম্ভ এই প্রকার, "অমরবৃন্দ কর্তৃক স্তুত ব্রহ্মা যাঁহাকে স্তব করেন এবং দেবতাদিগের পূজিত চন্দ্রশেখর যাঁহাকে পূজা করেন ও নারায়ণ দেবগণের ধ্যান প্রাপ্ত হইয়াও যাঁহাকে ধ্যান করেন এতাদৃশী যে পরম দেবতা তাঁহার চরণে আমি কোটি কোটি প্রণাম করি। সুর সমূহের মান্য ও মেধাবিশ্রেষ্ঠ এবং পণ্ডিত সমুদায়ের মধ্যে প্রথম গণনীয় যে শ্রীদেব সিংহ রাজার পুত্র শ্রীশিব সিংহ রাজা তিনি জয়যুক্ত হউন।

"অভিনব প্রজ্ঞা বিশিষ্ট বালকেরদিগের নীতিশিক্ষার নিমিত্ত এবং কামকলা কৌতুকাবিশিষ্ট পুরস্ত্রীগণের হর্ষের নিমিত্ত শ্রীশিব সিংহ রাজার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি নামে কবি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন যে রসজ্ঞান দ্বারা নির্ম্মল বুদ্ধি যে পণ্ডিত সকল তাঁহারা নীতিবোধানুরোধক যে এই সকল বাক্যের গুণ তন্নিমিত্তে কি আমার এই রচিত গ্রন্থ শ্রবণ করিবেন না অর্থাৎ অবশ্য শ্রবণ করিবেন। যে গ্রন্থের লক্ষণোক্ত পরীক্ষার দ্বারা পুরুষ সকলের পরিচয় হয় এবং যে গ্রন্থের কথা সকল লোকের মনোরমা সেই পুরুষ পরীক্ষা নামে পুস্তক রচনা করা যাইতেছে।"

এইরূপ বাঙ্গালা গদ্যে কবি বিদ্যাপতি পুরুষ পরীক্ষা রচনা করিয়াছেন, ইহা অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু এটী ভ্রম। ভ্রম বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহও করিয়াছেন, অথচ কোন পক্ষেই কিছু প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। আমরা কেন ভ্রম

বলিতেছি, নিম্নে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি,

(১)পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি হস্তলিখিত বাঙ্গলা পুরুষপরীক্ষা আছে। পুস্তক খানি এক্ষণে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে রহিয়াছে। ঐপুস্তকের উপরে লিখিত আছে,

"শ্রীযুক্ত বিদ্যাপতি পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংস্কৃত বাক্যে সংগৃহীতা পুরুষপরীক্ষা॥ শ্রীহরপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষাতে রচিতা।"

(২) ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের ইতিহাস (Annals of the College of Fort William) নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানা যায় যে হরপ্রসাদ রায় মূল সংস্কৃত হইতে পুরুষ পরীক্ষা বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। উহা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কৌন্সিলের অভিপ্রেতানুসারে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহে শ্রীরামপুর মিসিনরী যন্ত্রে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়।*

(৩) আমরা সংস্কৃত পুরুষ পরীক্ষা গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। উহার মঙ্গলাচরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। উহা হইতে যে পূর্ব্বপ্রদত্ত বাঙ্গালা পুরুষপরীক্ষা সূচনা অনুবাদিত, পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

মঙ্গলাচরণ

"ব্রহ্মাপি যাং নৌতি নুতঃ সুরেণ
যামর্চিতোপ্যর্চয়তীন্দুমৌলিঃ।
যাংধ্যায়তি ধ্যানগতোপিবিষ্ণু
স্তমাদিশক্তিং শিরসা প্রপদ্যে॥

* In a "Catalogue of Literary works, the publication of which has been encouraged by Government at the recommendation of the council of the college of Fort William, since the period of disputation, held in 1814," we find the following:—

"পুরুষ পরীক্ষা Pooroosah Pureekha or the Test of man, a work containing the moral doctrines of the Hindus, translated into the Bengalee Language, from the Sanskrit, by Huruprasad, a Pundit attached to the College of Fort William, for the use of the Bengalee class. It is a delineation of eminence of character, in many situations of human life, and consists of forty-eight stories, illustrative thereof. Some of these discribe men eminent for moral virtue; others, men eminent for heroic or daring actions; others are represented as examples of high qalifications; and others, of extraordinary folly or wisdom, virtue or vice.—The whole forming an useful miscellany of Eastern manners and opinions."

p. 474. Annals of the College of Fort William.

In Appendix—No. II of the same work, giving a "Catalogue of Oriental and other works, which have been published under the patronage of the College of Fort William, since its Institution, in 1800," we find the following:

"পুরুষ পরীক্ষা Poorоosha Pureekha, translated from the original Sanscrit, by Huruprusuda Raya. Serampore, printed at the Mission Press, 8vo. 1815."

বীরেষু মান্যঃ সুধিয়াং বরেণ্যো
বিদ্যাবতামাদিবিলেখনীয়ঃ।
শ্রীদেবসিংহক্ষিতিপালসূনু
র্জীয়াচ্চিরং শ্রীশিব সিংহ দেবঃ॥

"শিশূনাংসিদ্ধ্যর্থং নয় পরিচিতে নূতনধিয়াং
মুদে পৌরস্ত্রীণাং মনসিজকলাকৌতুক
যুষাম্।
নিদেশান্নিঃশঙ্কং সপদি শিবসিংহ
ক্ষিতিপতেঃ
কথানাং প্রস্তাবং বিবচয়তি বিদ্যাপতি
কবিঃ॥

নয়ানুবোধেন গুণেন বাপি
কথ্যরসস্যাপি কুতূহলেন।
বুধোপি বৈদগ্ধ্যবিশুদ্ধচেতাঃ
প্রবন্ধমাকর্ণয়তাং ন কিম্মে॥
পুরুষাঃ পরিচীয়ন্তে যুক্তেবস্যাঃ পরীক্ষয়া।
তৎপুরুষপরীক্ষায়াং কথা সর্ব্বজনপ্রিয়া॥"

পুরুষপরীক্ষা লেখক বিদ্যাপতি রাজা শিব সিংহের আশ্রিত; গীত রচয়িতা বিদ্যাপতিও রাজা শিব সিংহের আশ্রিত। সুতরাং পুরুষপরীক্ষা লেখক ও গীত রচয়িতা একই ব্যক্তি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অন্ততঃ যতক্ষণ অন্যরূপ প্রমাণ না পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ এইরূপ বিবেচনা করাই যুক্তি সিদ্ধ; কারণ বিভিন্ন পাত্রস্থলে গ্রন্থকর্ত্তা ও আশ্রয়দাতা উভয়ের নামের ঐক্য হওয়া অতীব অসম্ভব। পুরুষপরীক্ষা হইতে রাজা শিব সিংহের একটী পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তিনি রাজা দেব সিংহের পুত্র।

বিদ্যাপতি কবি চণ্ডীদাসের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। উভয়ের গুণের কথা শুনিয়া পরস্পর সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হন। উভয়ের মিলন সম্বন্ধে চারিটী কবিতা আছে; তন্মধ্যে আমরা দুইটী উদ্ধৃত করিলাম; একটী রূপনারায়ণের, অপরটী বিদ্যাপতির রচিত।

(১)

চণ্ডীদাস শুনি, বিদ্যাপতি গুণ,
দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি শুনি, চণ্ডীদাস গুণ,
দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল,
বিদ্যাপতি চলি গেল॥
চণ্ডীদাস তব, রহই না পারই,
চলল দরশন লাগি।
পন্থহি দুহুঁজন, দুহুঁ গুণ গাওত,
দুহুঁ হিয়ে দুহুঁ রহুঁ জাগি॥
দৈবহি দুহুঁ দোঁহা, দরশন পাওল,
লখই না পারই কোই।
দুহুঁ দোঁহা নাম, শ্রবণে তহি জানল,
রূপনারায়ণ গোই॥

(২)

সময় বসন্ত, যামদিন মাঝহি
বটতলে সুরধুনী তীর।
চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল,
পুলকে কলেবর গীর॥
দুহুঁজন ধৈরজ ধরই না পার।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল,
দুহুঁক অবশ প্রতিকার॥

ধৈরজ ধরি দুহুঁ, নিভৃতে আলাপই,
পুছত মধুর রস কি ?
রসিক হইতে কিয়ে, রস উপজায়ত,
রস হইতে রসিক কহি ?
রসিকা হইতে, রসিক কিয়ে হোয়ত,
রসিক হৈতে রসিকা ?
রতি হৈতে প্রেম,প্রেম হৈতে রতি কিয়ে,
কাহে মানব অধিকা ?
পুছত চণ্ডীদাস কবি বঞ্জনে,
শুনত রূপনারায়ণ।
কহ বিদ্যাপতি, ইহ বস কাবণ,
লছিমা পদ করি ধ্যান॥

আমরা যে দুইটী গীত উদ্ধৃত করিলাম না, তন্মধ্যে একটীর ভণিতা এইরূপ,

রূপনারায়ণ, বিজয় নারায়ণ,
বৈদ্যনাথ শিবসিংহ।
মিলন ভাবি, দুহুঁক করু বর্ণন,
তছু পদ কমলভৃঙ্গ।

সুতরাং এটীর রচয়িতা চারিজন, রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ, বৈদ্যনাথ ও শিবসিংহ; এবং এই চারি জনই বিদ্যাপতির মিত্র হইবার সম্ভাবনা। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বীরভূমস্থ নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাসের বাসস্থান ছিল। অতএব বিদ্যাপতির বাসস্থান বীরভূম জেলা হইতে অতিদূরবর্ত্তী ছিল না, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অন্যায় নহে।

এস্থলে আর একটী কথায় বিচার করা আবশ্যক হইতেছে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি উভয়েই এক সময়ের লোক; চণ্ডীদাসের লেখার সঙ্গে বর্ত্তমান বাঙ্গালার অল্পই প্রভেদ, কিন্তু বিদ্যাপতির কবিতায় হিন্দির ভাব অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। উভয়ের রচনা প্রণালীগত বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমরা উভয়েরই দুইটী করিয়া কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথম ও দ্বিতীয়টী চণ্ডীদাসের,এবং তৃতীয় ও চতুর্থটী বিদ্যাপতির।

(১)

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে,
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে,
যেমত যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী, খুলয়ে গাঁথনী,
দেখয়ে খসাঞা চুলি।
হসিত বদনে, চাহে মেঘপানে,
কি কহে দুহাত তুলি॥
একদিট করি, ময়ূব ময়ূরী,
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়,
কালিয়া বন্ধুর সনে॥

(২)

ধিক রহু জীবনে যে পরাধিনী জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক পরবশ হয়ে॥
এপাপ পরাণে বিধি এমতি লিখিল।
সুধার সাগর মোরে গরল হইল॥

অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভরিয়া কেন উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈলাম কোলে।
এ দেহ অনল তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি যাই যদি তরুলতাবনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু লতা পাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
অতএব এছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু মুঞি এ গরল বিষে॥
চণ্ডীদাসে বলে দৈব গতি নাহি জান।
দারুণ পিরীতি সেই ধবই পরাণ।

(৩)

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ দলবলে ধনী দেকে পড়ি গেল॥
কবহুঁ ঝাপয়ে অঙ্গ কবহুঁ বিথার
কবহুঁ বাঁধয়ে কুচ কবহুঁ উঘার॥
থির নয়ান নাহি অথির ভেল।
উরজ উদয় থল নালিম দেল॥
চঞ্চল চরণ চিত চঞ্চল ভাণ।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
বৈরজ ধরহ মিলায়ব আন।

(৪)

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হম রূপ নিহারনু
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥
যত যত রসিক জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক॥

যদিও চণ্ডীদাসের কোন কোন গীতে হিন্দির আধিক্য লক্ষিত হয়, এবং বিদ্যাপতির নামবিশিষ্ট কোন কোন কবিতা বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় রচিত, তথাপি সাধারণতঃ চণ্ডীদাসের লেখা বাঙ্গালা ও বিদ্যাপতির লেখা হিন্দিভাবাপন্ন। এরূপ হইবার কারণ কি বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। পূর্ব্বে কেহ কেহ বলিতেন যে বিদ্যাপতির সময়ে বাঙ্গালা ভাষা হিন্দি হইতে পৃথগ্‌ভূত হয় নাই; কিন্তু চণ্ডীদাসের রচনাপদ্ধতি দেখিলে এ বিশ্বাস কাহারও মনে স্থান পাইতে পারে না। চণ্ডীদাসের শব্দ বাঙ্গালা, চণ্ডীদাসের ছন্দ বাঙ্গালা। বিদ্যাপতির শব্দ হিন্দি, বিদ্যাপতির ছন্দ হিন্দি। কেহ কেহ অনুমান করেন যে কৃষ্ণবিষয়ক গীত রচনা করিতে গিয়া বিদ্যাপতি ব্রজভাষার অনুকরণ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার কবিতায় হিন্দির আধিক্য; চণ্ডীদাস তাঁহার ন্যায় বিদ্বান্ ছিলেন না বলিয়াই অনেক ব্রজবুলি প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। যাঁহারা এই মতের সমর্থন করেন, তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন যে

চৈতন্যের পরেও, এমন কি এখন পর্য্যন্ত, বঙ্গীয় কবিরা উক্ত প্রকার হিন্দিভাবাপন্ন কবিতা সময়ে সময়ে রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে আর একটী কথা ভাবিতে হয়। বিদ্যাপতির গীতে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে গিয়াই পরবর্ত্তী কবিরা হিন্দিভাবাপন্ন কবিতা লিখিয়াছেন। বিদ্যাপতির পূর্ব্বের কোন বাঙ্গালা কবিতা বা কবির উল্লেখ দেখা যায় না। সুতরাং বিদ্যাপতিকেই হিন্দি-ভাবাপন্ন কবিতা লিখিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার মাতৃভাষা যদি চণ্ডীদাসের ভাষার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইত, তিনি যে তাঁহার অধিকাংশ গীতগুলিকে ছন্দে ও শব্দে হিন্দিভাবাপন্ন করিতে যাইতেন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। আদি কবিরা স্বদেশীয় দিগের বোধগম্য করিয়াই গীত রচনা করেন; তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তিবশতঃ পরবর্ত্তী-কালের বা দূরতর প্রদেশের কোন কোন লেখক তাঁহাদিগের রচনা প্রণালী সর্ব্ব সাধারণের দুর্ব্বোধ হইলেও বিশেষ পাঠক শ্রেণীর জন্য অনুকরণ করিতে পারেন। সুতরাং বিদ্যাপতির ভাষার ন্যায় ভাষা যে প্রদেশে প্রচলিত ছিল, তিনি সে প্রদেশের অধিবাসী হইবার সম্ভাবনা। বিদ্যাপতি বীরভূম জেলায় চণ্ডীদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। আমরা দেখাইয়াছি যে চণ্ডীদাসের ভাষা বাঙ্গালা। অতএব বীরভূম হইতে উত্তর পশ্চিমা-ঞ্চলাভিমুখে গমন করিলে বিদ্যাপতির বাসস্থলে উপস্থিত হওয়া যায়, এরূপ অনু-মান নিতান্ত অসঙ্গত নয়। "খেলত," "ভেল," "কহব," "মাতল," "শ্রবণক," ইত্যাদি পদ প্রয়োগ দেখিয়াও বোধ হয় বিদ্যাপতি ভাগলপুর বা পাটনা বিভাগের লোক।

এপর্য্যন্ত বিদ্যাপতির বিষয়ে আমরা যাহা যাহা বলিলাম তাহাতে এই কয়েকটী কথা পাওয়া যাইতেছে; (১) তিনি চৈতন্যের পূর্ব্বে ও চণ্ডীদাসের সময়ে শিবসিংহ নামক কোন রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন, এবং উক্ত রাজার মহিষীর নাম লছিমা ও পিতার নাম দেব সিংহ ছিল: (২) রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ ও বৈদ্য-নাথ বিদ্যাপতির মিত্র ছিল; (৩) বিদ্যা-পতি অনেক পদাবলী ও সংস্কৃত পুরুষ পরীক্ষা রচনা করেন; (৪) তিনি পাটনা বা ভাগলপুর বিভাগের লোক হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে আমরা দেখাইব যে বিদ্যাপতির বাসস্থল মিথিলায় ছিল।

মৈথিল ভাষায় লিখিত বিদ্যাপতির রচিত অনেক গীত মিথিলায় প্রচলিত আছে; সে সকল গীতে শিবসিংহ, রূপ-নারায়ণ ও লছিমা দেবীর নামোল্লেখ আছে। আমরা উদাহরণস্বরূপ একটী গীত উদ্ধৃত করিলাম —

অরুণ পুরব দিশ, বহল সগর নিশ,
গগন মগন ভেল চন্দা।
মুনি গেল কুমুদিনী, তইও তোহর ধনি,
মুনল মুখ অরবিন্দা॥

কমল বদন, কুবলয় দুই লোচন,
অধর মধুরি নিরমাণে।
সকল শরীর, কুসুম তুঅ সিরজল,
কিঅ দই হৃদয় পথাণে॥
অসকতি কর, কঙ্কণ নহি পরিহসি,
হৃদয় হার ভেল ভারে।
গিরিসম গরুঅ, মান নহি মুঞ্চসি,
অপরুব তুঅ ব্যবহারে॥
অব গুণ পরিহরি, হরখি হরু ধনি
মানক অবধি বিহানে।
রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ,
বিদ্যাপতি কবি ভাণে॥

আর একটী গীতের ভণিতা এইরূপ

ভণই বিদ্যাপতি, সুনু ব্রজ যৌবতি,
ইথিক লক্ষ্মী সমানে।
রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ, লছিমাদেই
বিরমাণে॥

অপর একটী কবিতার ভণিতা এবম্বিধ,

ভণই বিদ্যাপতি, শুন ব্রজ নারি।
ধৈরজ ধরয়কু মিলত মুরারি॥

মিথিলায় পঞ্জীনামে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ আছে; তাহাতে রাজাদিগের ও ব্রাহ্মণগণের পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৪৮ শকে মিথিলাধিপতি হরিসিংহ দেবের রাজত্ব সময়ে উক্ত গ্রন্থের রচনারম্ভ হয়; উহাতে লিখিত আছে,

শাকে শ্রীহরিসিংহদেবনৃপতেঃ ভূপার্ক
তুল্যেজনি।
তস্মাদন্তমিতেঽব্দকে দ্বিজগণৈঃ পঞ্জী
প্রবন্ধঃ কৃতঃ॥

অর্থাৎ "১২৪৮ শাকে হরিসিংহ দেব নৃপতির সময়ে দ্বিজগণকৃত পঞ্জীপ্রবন্ধের জন্ম হয়।"

এই পঞ্জীগ্রন্থে বিদ্যাপতির পরিচয় আছে। তাঁহার পিতার নাম গণপতি, পিতামহের নাম জয়দত্ত, প্রপিতামহের নাম ধীরেশ্বর, বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম দেবাদিত্য, এবং অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম ধর্ম্মাদিত্য। তিনি মিথিলামহীপতি শিবসিংহের সভাসদ্ ছিলেন। পঞ্জী প্রবন্ধানুসারে, এই রাজা মৈথিল ব্রাহ্মণ-বংশীয়; লখিমা দেবী তাঁহার মহিষী; রাজা দেবসিংহ তাঁহার পিতা, এবং তিনি ১৩৬৯ শকে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সাড়ে তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন।

শিবসিংহ নৃপতি সুগওনা নামক গ্রামে বাস করিতেন। অদ্যাপি সেই গ্রামে তাঁহার ভ্রাতৃবংশীয়েরা হৃতরাজ্য হইয়া বাস করিতেছে। তৎস্থানিত বিস্তৃত অতি গভীর রাজপুষ্করিণী নামে অনেক তড়াগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের সদৃশ বৃহৎ জলাশয় দেশান্তরে প্রায় দেখা যায় না। মিথিলায় এই একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে,

"পোখরি রজোখরি অরু সভ্ পোখরা।
রাজা শিবসিংহ অরু সভ্ ছোকরা॥"

অর্থাৎ "রাজস্থানিত পুষ্করিণীই প্রকৃত পুষ্করিণী, আর সকল ডোবা; শিবসিংহই প্রকৃত রাজা, আর সকল সামান্য লোক।"

রাজা শিবসিংহ ও কবি বিদ্যাপতি

সম্বন্ধে মিথিলায় একটি উপাখ্যান পাওয়া যায়। কথিত আছে যে রাজা শিবসিংহকে দণ্ড দিবার জন্য দিল্লীশ্বর ধরিয়া লইয়া যান। বিদ্যাপতি এই সংবাদ শুনিয়া রাজাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত দিল্লীতে গমন করেন। যাইয়া দিল্লীপতিকে বলেন, আমি অদৃষ্ট দৃষ্টবৎ বর্ণনা করিতে পারি। এই কথা শুনিয়া দিল্লীশ্বর পরীক্ষার্থে তাঁহাকে কাষ্ঠপেটকে দৃঢ় বদ্ধ করিয়া কোন স্থানে রাখিয়া দেন। অনন্তর কতকগুলি নগরাঙ্গণাকে স্নান করাইয়া নিজ নিজ ভবনে পাঠান, এবং কবিকে সমীপে আনয়ন পূর্ব্বক যমুনাতীরবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে আদেশ করেন। বিদ্যাপতি নাকি ইষ্টদেবতার চরণারবিন্দপ্রসাদে, উহা অদৃষ্ট হইলেও, দৃষ্টবৎ মৈথিল ভাষায় এইরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন,

কামিনী করু অসনানে।
হেরইত হৃদয় উদিত পচবাণে॥
চিকুর গরল জলধারে।
জনি মুখশশি ডর রোঅহি অন্ধারে॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
জনি বিহ আনি মিলাওল দেবা॥
জনি সংশয় ভুজ ফাঁসে।
বান্ধি ধএল উড়ি লাগত অকাশে॥
তিতল বসন তন লাগু।
মুনিহুক মানস মনমথ জাগু॥
বিদ্যাপতি কবি গাবে।
বড় তপ গুণমতি পুনমতি পাবে॥

বিদ্যাপতির এই গীতটী বাঙ্গালা দেশেও চলিত আছে; কিন্তু ইহার সম্বন্ধে কোন গল্প কাহারও মুখে শুনা যায় না, এবং এদেশে ইহার যেরূপ আকার হইয়াছে নিম্নে প্রদত্ত হইল:

কামিনী করয়ে সিনান।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচ বাণ॥
চিকুরে গলয়ে জলধারা।
মুখশশি ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ারা॥
তিতল বসন তনু লাগি।
মুনি এক মানস মনমথ জাগি॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজ কুল আনি মিলায়ল দেবা॥
তেঞি শঙ্কা ভুজ পাশে।
বান্ধি ধরল জনু উড়ব তরাসে॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতী নারী রসিক জন পাওয়ে॥*

এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, বিদ্যাপতির অলৌকিক শক্তি সন্দর্শন করিয়া, দিল্লীশ্বর শিবসিংহকে মুক্ত করিলেন এবং কবিকে বীসপী নামক বৃহৎ গ্রাম প্রদান করিলেন। এই কারণে হউক বা না হউক, বিদ্যাপতি যে গ্রাম দান পাইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তদ্বংশীয়েরা অদ্যাপি উক্ত গ্রাম ভোগ করিয়া বাস করিতেছেন; তাঁহারা দিল্লীপতিদত্ত দানপত্র অদ্যাপি দেখাইয়া থাকেন। রাজা শিবসিংহ নিজভূম্যন্তর্গত সেই গ্রামের দিল্লীপতি দত্ত দানপত্র দৃঢ় করণার্থে আপনিও কবিকে একখানি দানপত্র দেন;

* প্রাচীনকাব্য সংগ্রহ। ১৫ পৃষ্ঠা।

তাহা হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে,।

অব্দে লক্ষ্মণসেন ভূপতি মিতে বহ্নিগ্রহ ব্যঙ্কিতে
মাসি শ্রাবণসংজ্ঞকে শুভতিথৌপক্ষে বলক্ষে গুরৌ।
বাগ্বত্যাস্সরিতস্তটে গজরথেত্যাখ্যা প্রসিদ্ধে পুরে
দিৎসোৎসাহ বিবর্দ্ধবাহুপুলকঃ সভায় মধ্যে সভম্॥
প্রজ্ঞাবান্ প্রচুরোর্ব্বরং পৃথুতরাভোগং নদীমাতৃকং
সারণ্যং সসরোবরঞ্চ বীসপীনামানমাসী মতঃ।
শ্রীবিদ্যাপতি শর্ম্মণে সুকবয়ে বাজাধিরাজঃ কৃতী
বীর শ্রীশিবসিংহ দেবনৃপতির্গ্রামং দদৌ শাসনম্॥

অর্থাৎ

"২৯৩ লক্ষ্মণ সেন ভূপতির অব্দে শ্রাবণ মাসে শুভতিথিতে শুক্লপক্ষে বৃহস্পতিবারে বাগ্বতী নদীর তীরে গজরথাখ্য প্রসিদ্ধপুরে রাজাধিরাজ কৃতী প্রজ্ঞাবান্ দানোৎসাহযুক্ত বীর শ্রীশিবসিংহ দেব নৃপতি সভামধ্যে বসিয়া সভ্য সুকবি বিদ্যাপতি শর্ম্মাকে প্রচুরোর্ব্বর বিস্তীর্ণ নদীমাতৃক সারণ্য সসরোবর বীসপী নামক গ্রাম সীমা পর্য্যন্ত শাসনস্বরূপ প্রদান করিলেন।"

পাঠকগণ দেখিবেন যে, রাজা শিব সিংহের দানপত্রে লক্ষ্মণ সেনের অব্দ ব্যবহৃত। বাঙ্গালার সেন রাজারা যে, মিথিলা অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা তদ্বিষয়ের সামান্য প্রমাণ নহে। মিথিলা হইতে আমরা আরও সংবাদ পাইয়াছি যে, বিদ্যাপতি কবি ৩৪৯ লক্ষ্মণসেনাব্দে মৈথিলাক্ষরে তালপত্রে শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, এবং উহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বিদ্যাপতির জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে গিয়া দুইবার লক্ষ্মণ সেনের অব্দের উল্লেখ দেখিয়া আমাদিগের জানিতে ইচ্ছা হয়, যে এক্ষণে ত্রিহুতে লক্ষ্মণ সেনের অব্দ প্রচলিত আছে কি না। অনুসন্ধান দ্বারা পরে আমরা অবগত হইয়াছি যে, মৈথিল পণ্ডিত সমাজে অদ্যাপি মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের অব্দ চলিতেছে। উহার চিহ্ন "লসং।" মাঘ মাসের প্রথম দিন হইতে উহার বৎসর পরিবর্ত্তন ঘটে। এক্ষণে ৭৬৭ লক্ষ্মণ সংবৎ চলিতেছে। এ সময়ে শকাব্দ ১৭৯৭ ও খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭৪ বর্ষ বহমান। সুতরাং শকাব্দ ১০৩০ ও খ্রীষ্টাব্দ ১১০৭ লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকাল হইতেছে। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান দ্বারা খৃঃ অঃ ১১০০ হইতে ১১২০ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব সময় ধরিয়াছেন। মিথিলায় প্রচলিত লক্ষ্মণাব্দ দ্বারা তাঁহার মতেরই সমর্থন হইতেছে।

১০৩০ শকাব্দে লক্ষ্মণাব্দের আরম্ভ। সুতরাং ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে ১৩২৩ শকাব্দ হইতেছে। যদি শেষোক্ত বৎসর রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতি কবিকে ভূমিদান

পত্র দিয়া থাকেন, তাঁহা হইলে ১৩৬৯ শকে শিবসিংহ রাজ্যাভিষিক্ত হন, মিথিলার পঞ্জীগ্রন্থে এরূপ উক্তি কেন দেখা যায়? ইহাতে ত তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত হইবার ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে দান করিতে দেখা যাইতেছে। মৈথিল পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে এই দানপত্র তাঁহার যৌবরাজ্যকালে প্রদত্ত। শিবসিংহ অনেক আয়াস সাধ্য কার্য্য করিয়াছিলেন, এ প্রকার জনশ্রুতি আছে। কিন্তু তিনি অত্যল্পকাল অর্থাৎ সাড়ে তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। ইহাতে প্রতীতি হয় যে সেই কার্য্য সকল তদীয় যৌবরাজ্য কালেই সম্পন্ন হইয়াছিল। মিথিলায় এইরূপ কিম্বদন্তীও আছে। পঞ্জী প্রবন্ধানুসারে শিবসিংহের পিতা দেবসিংহের রাজত্বকাল ৬১ বৎসর। সুতরাং রাজা হইবার ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে শিবসিংহ যুবরাজ ছিলেন, ইহা কোন ক্রমেই বিস্ময়কর নহে। ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে ভূমি দান পত্র পাইলেও রাজা শিবসিংহের রাজ্যাভিষেকের পরে বিদ্যাপতি যে জীবিত ছিলেন, পুরুষপরীক্ষার মঙ্গলাচরণ দৃষ্টে জানা যায়। আর বিদ্যাপতি ৩৪৯ লক্ষণাব্দে অর্থাৎ ১৩৭৯ শকাব্দে তালপত্রে শ্রীমদ্ভাগবত লিখিয়াছিলেন, এতদ্দ্বারাও সেই কথারই প্রমাণ হইতেছে।

বিদ্যাপতির মৃত্যু সম্বন্ধে মিথিলায় একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে। বিদ্যাপতি আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া গঙ্গাতীরে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, ভগবতী ভাগীরথী ভক্তবৎসলা, এমন সময়ে আমার নিকটে তিনি আসিবেন না কেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া তথায় উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ভাগীরথী ত্রিধারা হইয়া তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। দেখিয়া বিদ্যাপতি সানন্দে সেই খানেই শরীর ত্যাগ করিলেন। তাঁহার চিতা প্রদেশে একটী শিবলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল। সেই শিবলিঙ্গ ও নদীচিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। যে স্থান এই সকল কারণে প্রসিদ্ধ, সেস্থান ভাগীরথীর উত্তর কূলস্থ বাজিতপুর নগরের উত্তরভাগে বাঢ় নামক নগর হইতে পঞ্চক্রোশ দূরে অবস্থিত।

যে শিবসিংহের সভায় বিদ্যাপতি ছিলেন, সে শিবসিংহ নারায়ণ নামক সামান্য দ্বিজকুল সম্ভূত। তাঁহার পূর্ণনাম "রূপনারায়ণ পদাঙ্কিত মহারাজ শিবসিংহ।" তাঁহার পিতা মহারাজ দেবসিংহ, পিতামহ মহারাজ ভবেশ্বর, পিতৃব্য হরসিংহদেব। হরসিংহের চারিপুত্র, দর্পনারায়ণ পদাঙ্কিত মহারাজ নরসিংহ, জীবন নারায়ণ পদাঙ্কিত রত্নসিংহ, বিজয়নারায়ণ পদাঙ্কিত রঘুসিংহ, ও বীরনারায়ণ পদাঙ্কিত ভানুসিংহ। মহারাজ শিবসিংহের তিন মহিষী ছিল, পদ্মাবতী দেবী, লখিমা দেবী, ও বিশ্বাস দেবী; রাজার মৃত্যুর পরে ইহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া কথা আছে। অনন্তর নরসিংহদেব রাজা হন;

তাঁহার পরে তৎপুত্র হৃদয় নারায়ণ পদাঙ্কিত ধীরসিংহ ও হরিনারায়ণ পদাঙ্কিত ভৈরবসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পর রূপনারায়ণের রাজত্ব। এই সকল বৃত্তান্ত মিথিলার পঞ্জী প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত; এবং এতদ্দ্বারা রূপনারায়ণ, বিজয় নারায়ণ ও শিবসিংহ নামক বিদ্যাপতির তিনজন মিত্রের ও লখিমা দেবীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। রূপনারায়ণ নামটী অনেক স্থলেই শিবসিংহের বিশেষণ; কিন্তু কোন কোন স্থলে ভিন্ন ব্যক্তির নাম বলিয়া বোধ হয়।

আমরা বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থানে অনুসন্ধান করিয়া কোথাও সংস্কৃত পুরুষ পরীক্ষা পাই নাই। কিন্তু মিথিলায় আমরা উক্ত পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। উহার উপসংহারে যে কয়েকটী শ্লোক আছে, বাঙ্গালা পুরুষ পরীক্ষায় তাহার অনুবাদ নাই। এখানে সে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইল;

ভুক্ত্বা রাজ্যসুখং বিজিত্য হরিতো হত্বা-
রিপূন্ সংগরে।
হুত্বাচৈব হুতাশনং মখবিধৌ ভৃত্বা ধনৈ
রর্থিনঃ॥
বাগ্বত্যাঃ ভবসিংহদেব নৃপতি স্ত্যক্ত্বা শি-
বাগ্রে বপুঃ।
পূতো যস্য পিতামহঃ স্বরগমদ্দারদ্বয়াল
ঙ্কৃতঃ॥
সংকুরীপুর সরোবর কর্ত্তা হেমহস্তী রথ-
দান বিদগ্ধঃ।
ভাতি যস্য জনকো রণজেতা দেব সিংহ-
নৃপতি র্গুণরাশিঃ॥
যো গৌড়েশ্বর গর্জ্জনে খররণে ক্ষৌণীষু
লব্ধ্বা যশঃ।
দিক্কান্তাচয়কুন্তলেষু নয়তে কুন্দস্য দামা-
স্পদম্॥
তস্য শ্রীশিবসিংহ নৃপতে র্বিজ্ঞপ্রিয়স্যা-
জ্ঞয়া।
গ্রন্থং (অস্পষ্ট) নীতি বিষয়ে বিদ্যাপতি-
র্ব্যাতনোৎ॥

অর্থাৎ

"রাজ্য সুখভোগ করিয়া, দশদিক্ জয় করিয়া, যুদ্ধে রিপুদিগকে নিহত করিয়া, যজ্ঞ বিধিমতে অগ্নিতে হোম করিয়া, ধনদ্বারা অর্থীদিগকে তুষ্ট করিয়া, যাঁহার পিতামহ ভবসিংহ দেব নৃপতি বাগ্বতী নদীতীরে মহাদেবের অগ্রে শরীর পরিত্যাগ করিয়া পূত ও দারদ্বয় ভূষিত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন; সংকুরীপুরের সরোবর কর্ত্তা হেম হস্তী রথ দান তৎপর রণজয়ী গুণরাশি দেবসিংহ নৃপতি যাঁহার জনক ছিলেন; যিনি গৌড়পতির সহিত সংগ্রাম করিয়া যশোলাভদ্বারা দিক্ কান্তাচয়ের কুন্তলে কুন্দদাম দিয়াছেন; সেই বিজ্ঞপ্রিয় শিবসিংহ নৃপতির আজ্ঞায় নীতি বিষয়ক গ্রন্থ বিদ্যাপতি রচনা করিলেন।"

মৈথিল পদাবলী ও সংস্কৃত পুরুষ পরীক্ষা ব্যতীত বিদ্যাপতি রচিত অনেক গুলি সংস্কৃতগ্রন্থ মিথিলায় প্রচলিত আছে; যথা "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী" "দানবাক্যা-

বলী,” বিবাদসার,” “গয়াপত্তন,” ইত্যাদি। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর প্রারম্ভ এই প্রকার:—

“অভিবাঞ্ছিত সিদ্ধ্যর্থং বন্দিতো যঃ সুরৈরপি।
সর্ব্ববিঘ্নচ্ছিদে তস্মৈ গণাধিপতয়ে নমঃ। ।১।
ভক্ত্যানম্রসুরেন্দ্রমৌলি মুকুট প্রাগ্‌ভারতারস্ফুরন্
মাণিক্যদ্যুতিপুঞ্জরঞ্জিত পদদ্বন্দারবিন্দশ্রিয়ঃ।
দেব্যাস্তৎক্ষণদৈত্যদর্পদলনা সচ্চিৎপ্রহৃষ্টামর
স্বারাজ্যপ্রতিভূতবিষ্ণুকরণা গম্ভীরদৃক্ পাতু বঃ॥ ২।
অস্তিশ্রীনরসিংহদেব মিথিলা ভূমণ্ডলাখণ্ডলো
ভূভৃন্মৌলি কিরীট রত্নমিকর প্রত্যর্চ্চিতাঙ্ঘ্রিদ্বয়ঃ।
আপূর্ব্বাপরদক্ষিণোত্তরগিরি প্রাপ্তার্থি বাঞ্ছাধিক
স্বর্ণক্ষৌণিমণি প্রদান বিজিত শ্রীকর্ণকল্পদ্রুমঃ॥ ৩।
বিশ্বখ্যাতনয়স্তদীয়তনয়ঃ প্রৌঢ়প্রতাপোদয়ঃ
সংগ্রামাঙ্গণলব্ধবৈরিবিজয়ঃ কীর্ত্ত্যাপ্তলোকত্রয়ঃ।
মর্য্যাদানিলয়ঃপ্রকামমিলয়ঃ প্রজ্ঞাপ্রকর্ষাশ্রয়ঃ
শ্রীমদ্ভূপতি ধীরসিংহ বিজয়ী রাজত্যমোঘক্রিয়ঃ॥ ৪।
শৌর্য্যাবর্জ্জিত পঞ্চগৌড় ধরণীনাথোপনম্রীকৃতা
নেকোত্তুঙ্গতুরঙ্গ সঙ্গিত সিতচ্ছত্রাভিরামোদয়ঃ।
শ্রীমদ্ভৈরব সিংহদেব নৃপতির্যস্যানুজন্মাজয়
ত্যাচন্দ্রার্কমখণ্ডকীর্ত্তিসহিতঃ শ্রীরূপনারায়ণঃ॥ ৫।
দেবীভক্তি পরায়ণঃ প্রতিমুখ প্রারব্ধপারায়ণঃ
সংগ্রামে রিপুরাজ কংসদলন প্রত্যক্ষ নারায়ণঃ।
বিশ্বেষাংহিত কাম্যয়া নৃপবরোহনুজ্ঞাপ্য বিদ্যাপতিং
শ্রীদুর্গোৎসব পদ্ধতিংস তনুতে দৃষ্ট্বা নিবন্ধ স্থিতিম্॥ ৬।

এই কয়েকটী শ্লোক পাঠ করিয়া জানা যায় যে, রাজা নরসিংহ দেবের রাজত্বকালে রাজকুমার রূপনারায়ণের আদেশে বিদ্যাপতি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী রচনা করেন। ধীরসিংহ, ভৈরবসিংহ, ও রূপনারায়ণ নামক নরসিংহ দেবের পুত্রত্রয় উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন; রূপনারায়ণ কংস নামক কোন রাজাকে পরাজয় করেন; এবং ভৈরবসিংহ গৌড়ের রাজার সহিত যুদ্ধে জয়ী হন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শিবসিংহ রাজ্যাভিষিক্ত হইবার ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতি তাঁহার নিকটে ভূমি দানপত্র প্রাপ্ত হন। দান প্রাপ্তিকালে কবি

খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং সে সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের ন্যূন হইবার সম্ভাবনা নহে। অতএব শিবসিংহের সিংহাসনাধিরোহণকালে বিদ্যাপতির বয়স অন্যূন ৬৬ বৎসর, এরূপ বিবেচনা করা অন্যায় নহে। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী পাঠ করিয়া জানা যায় যে, রাজা নরসিংহ দেবের রাজত্ব সময়েও কবি বর্ত্তমান ছিলেন। পঞ্জীপ্রবন্ধানুসারে মহারাজ শিবসিংহের রাজত্বকাল ৩৷৷০ বৎসর; তৎপরে মহারাণী পদ্মাবতী ১৷৷০ বৎসর, লখিমা দেবী ৯ বৎসর ও বিশ্বাস দেবী ১২ বৎসর রাজত্ব করেন; তদন্তর নরসিংহ দেব রাজা হন। সুতরাং নরসিংহ দেবের রাজত্বারম্ভ সময়ে বিদ্যাপতির বয়স প্রায় ৯২ বৎসর হইবার কথা। অতএব অবগত হওয়া যাইতেছে যে, কবি অতি দীর্ঘজীবী ছিলেন। প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা সারা জীবন বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকে দীর্ঘায়ুঃ হইতেন। সে দিন কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি প্রায় শত বর্ষ বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি সতেজ ছিল।

পুরুষপরীক্ষা শিবসিংহের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৩৬৯ হইতে ১৩৭৩ শকাব্দ মধ্যে লিখিত। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী রাজা নরসিংহের সময়ে রচিত। নরসিংহ দেব ১৩৯৫ শকে সিংহাসনারোহণ করিয়া ৬ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। সুতরাং দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী ১৩৯৫ হইতে ১৪০১ শকাব্দ মধ্যে প্রকাশিত। কিন্তু গ্রন্থখানি অল্পদিন মধ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। রঘুনন্দন দুর্গোৎসবতত্ত্বমধ্যে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,

"অতএব দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীকৃতা মহার্ণব ধৃতেন দেবীপুরাণেন পশুঘাত বলিদানয়োঃ পৃথক্ ফলমভিহিতং। যথা,
দেবীংধ্যাত্বা পূজয়িত্বা অর্দ্ধরাত্রেঽষ্টমীষুচ।
ঘাতয়ন্তি পশূন্ ভক্ত্যা তে ভবন্তি মহাবলাঃ॥
বলিং যে চ প্রযচ্ছন্তি সর্ব্বভূত বিনাশনং।
তেষান্তু তুষ্যতে দেবী যাবৎ কল্পন্তু শাঙ্করং॥"
দুর্গোৎসবতত্ত্ব।

জ্যোতিস্তত্ত্বে "একাক্ষীন্দ্র শকাব্দকে" পদের প্রয়োগ দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, উক্ত তত্ত্ব ১৪২১ শকে লিখিত। দুর্গোৎসবতত্ত্ব যদিই বা পরবর্ত্তী সময়ে রচিত হইয়া থাকে, তাহাহইলেও দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী যে অল্পকাল মধ্যেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ হইতেছে।

বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আমাদিগের প্রায় বক্তব্য শেষ হইল। তিনি যে মৈথিল কবি, তদ্বিষয়ের প্রমাণার্থে আমরা যাহা যাহা বলিয়াছি, এস্থলে তাহার সারসংগ্রহ করা যাইতেছে। (১) মৈথিল ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির অনেক গীত মিথিলায় প্রচলিত আছে, এবং ঐ সকল গীতের

ভণিতায় রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ ও লখিমা দেবীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (২) মিথিলার পঞ্জীগ্রন্থে বিদ্যাপতির পরিচয় পাওয়া যায়। (৩) রাজা শিবসিংহ মিথিলার রাজা ছিলেন ও লখিমা দেবী তাঁহার মহিষী ছিলেন, ইহা পঞ্জীগ্রন্থ ও জনপ্রবাদ দ্বারা নির্ণীত হয়। (৪) বিদ্যাপতির কোন কোন কবিতা ও তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে মিথিলায় আশ্চর্য্য উপাখ্যান প্রচলিত আছে, বাঙ্গালা দেশে নাই। (৫) বিদ্যাপতি শিবসিংহ রাজার নিকটে বীসপী গ্রাম দান পাইয়াছিলেন; দানপত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; এবং উহার বলে কবির উত্তরাধিকারিগণ উক্ত গ্রাম ভোগ দখল করিয়া তথায় বাস করিতেছেন। (৬) বিদ্যাপতির হস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবত অদ্যাপি তদ্বংশীয়দিগের নিকটে মিথিলায় দেখা যায়। (৭) রাজা শিবসিংহের ভ্রাতৃবংশীয়েরা হৃতরাজ্য হইয়া মিথিলায় আছেন। (৮) বিদ্যাপতিলিখিত পুরুষ পরীক্ষা, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, ও অন্যান্য অনেক সংস্কৃত পুস্তক মিথিলায় প্রচলিত দেখা যায়, আর কোথাও পাওয়া যায় না। (৯) এই সকল পুস্তকে তাৎকালিক রাজাদিগের যেরূপ পরিচয় আছে, পঞ্জীগ্রন্থে মিথিলার রাজাদিগের সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। (১০) বিদ্যাপতি রচিত মৈথিল গীতের সহিত বঙ্গদেশ প্রচলিত তদীয় গীতের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়; অঙ্গনাগণের স্নান বিষয়ক উদ্ধৃত গীতদ্বয়ের তুলনা করিয়া দেখিলেই এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না। এ সকল প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ বিদ্যাপতিকে মৈথিল কবি বলিতে না চাহেন, তাঁহার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

কিন্তু বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলেও তাঁহাকে বাঙ্গালি বলা অন্যায় নহে। বল্লালসেন বাঙ্গালা দেশ পাঁচভাগে বিভক্ত করেন; তন্মধ্যে মিথিলা একভাগ। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের অব্দ বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলায় প্রচলিত ছিল, এখনও মিথিলায় প্রচলিত আছে। লক্ষ্মণ সেন বিজয়ী বাঙ্গালি রাজা হইলেও, বাঙ্গালিরা লক্ষ্মণ সংবৎ ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু মৈথিল পণ্ডিতেরা তাহা ভুলেন নাই। বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দু রাজ্যস্মারক লক্ষ্মণ-সংবৎ বল্লালের বাঙ্গালার যে বিভাগে অদ্যাপি প্রচলিত আছে, সে বিভাগকে বাঙ্গালার অংশ ও তন্নিবাসীদিগকে বাঙ্গালি বলিতে কেন সঙ্কুচিত হইব? এতদ্ব্যতিরিক্ত, বিদ্যাপতির হৃদয় বাঙ্গালি হৃদয়। তিনি যে রসের রসিক, সে রস তিনি বাঙ্গালি জয়দেবের নিকটে পাইয়াছিলেন এবং সে রস পরে চৈতন্যদেব ও তদ্ভক্তদিগের সময়ে মূর্ত্তিমান্ হইয়া বাঙ্গালা প্লাবিত করিয়াছিল। সুতরাং বিদ্যাপতির কবিতাকুসুম সাদরে বঙ্গকাব্যোদ্যানে গৃহীত হইয়াছে, ইহা অস্বাভাবিক নহে।

মিথিলা অতি প্রাচীন কাল হইতে বিদ্যাচর্চ্চার একটী প্রধান স্থান। এখানেই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া

রাজর্ষি জনকের নিকটে উপস্থিত হন। এখানেই ন্যায়মত প্রবর্ত্তক গৌতমের আশ্রম ছিল। এখানেই সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক টীকাকার পক্ষিলস্বামী প্রাদুর্ভূত হন। এখান হইতেই ন্যায় শিক্ষা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে চৌপাঠী সংস্থাপন করেন, এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, রঘুনাথ শিরোমণি, ও চৈতন্যদেবকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতিভা প্রদীপ্ত করেন; আর এখানে আসিয়া পক্ষধর মিশ্রকে পরাভূত করিয়া শারদ চন্দ্রিকা বিনিন্দিত নির্ম্মলবুদ্ধি শিরোমণি ন্যায় বিষয়ে নবদ্বীপকে ভারত শিরোমণি করেন। সুতরাং কেবল বিদ্যাপতির সরস কবিতা নহে, আরও অনেক কারণে বাঙ্গালা মিথিলায় নিকটে ঋণী।

উপসংহারকালে আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি যে, বর্ত্তমান মৈথিল রাজবংশসম্ভূত শ্রীযুক্ত বাবু বংশীধারী সিংহ মহাশয়ের নিকটে বিদ্যাপতির জীবন চরিত সংগ্রহ সম্বন্ধে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার সহায়তা ব্যতিরেকে কবির বিষয়ে অনেক কথা জানা দুঃসাধ্য হইত।

নিদ্রিত প্রণয়।

(রূপক)

হিমালয়ের কোন নিরালয় প্রদেশে একজন তেজস্বী তপস্বী বাস করিতেন, সেই মহাপুরুষ কোথা হইতে আসিয়া ছিলেন, এবং তিনি কতকালই বা এ নির্জ্জন বিজনস্থানে বাস করিতেছেন, এই সকল বিষয় কেহই বিশেষ জানিত না। কেহ কেহ বলিত যে তাঁহার বয়ঃক্রম শতবৎসরের বড় অধিক হইবে না। কেহ কেহ বলিত যে সৃষ্টির সমকালেই তিনি জন্মপরিগ্রহ করেন। কেহ বলিত যে তিনি ত্রেতাযুগে অযোধ্যাধিপতি যোধপ্রধান অশেষ যশোধাম শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন এবং দ্বাপরে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের উপরোধে দুর্দ্ধর্ষ দুর্ব্বাসা সহকারে যুধিষ্ঠির কুটীরে অতিথি হয়েন।

এইরূপে নানা জনে নানা কথা কহিত। দিগ্‌দিগন্তর হইতে মানবগণ তদীয় পাদযুগল পূজনার্থ আগমন করিত এবং জীবন মরণ সম্বন্ধে সতত তদীয় উপদেশ গ্রহণ করিত। রাজনীতি এবং দণ্ডনীতি বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণার্থ দূরদেশ হইতে নরপালগণ আগমন করিতেন, জ্ঞানীরাও

পরমার্থ বিষয়ে এবং পরমাত্মা সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ প্রার্থনা করিতেন। মহর্ষি সকলকে সাদর সদুত্তর প্রদান করিতেন; তদীয় অতীব গভীর নীতিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশকলাপ সংসারস্থ জনগণ হৃদয়ে সর্ব্বদা জাজ্বল্যমান থাকিত।

একদা বাসন্তীয় প্রভাত সময়ে যখন নবোদিত দিনকর স্বীয় কর দ্বারা হিমাকরের তুঙ্গ-তুহিন শিখর-নিকর পাতিত করিতেছিলেন, যৎকালে সুশীতল পরিমলসঙ্কুল নির্ম্মল মলয়ানিল হিমালয় নিলয়ে মন্দ মন্দ বিচরণ করিতেছিল, যখন বিমানবিহারী বিহঙ্গমবর্গের বিনোদ কলরবে তপোবন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, যখন পার্ব্বতীয় বন্য কুসুম সৌরভ দিগ্বিদিক পরিব্যাপ্ত হইতেছিল,—তখন যোগিরাজ এক পবিত্র লতামণ্ডপ মধ্যবর্ত্তী শিলাতলে উপবেশন করত এক মনে মুদ্রিতনয়নে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতেছিলেন। তৎকালে তদীয় শুভ্র মূর্ত্তি, গম্ভীরাকৃতি, এবং অচল প্রকৃতি নিরীক্ষণ করিলে বোধ হইত যেন স্বয়ং ভগবান্ ভবানীপতি ভবদেব কৈলাস ভূধরে মহাযোগে মগ্ন আছেন।

এদিকে ক্রমে ক্রমে কতিপয় যাত্রী নানা জনপদ হইতে সমাগত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত ভক্তিভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। ক্ষণকাল পরে মহর্ষি নয়নোন্মীলন করিলেন, এবং সকলকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন—"বৎসগণ! তোমাদের স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন কর আমি অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ করিতেছি।"

অনন্তর প্রথমতঃ এক কামিনী মুনি চরণে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল,—"মহর্ষে! মদীয় স্বামী বহুদূরস্থিত কতিপয় দ্বীপপুঞ্জের নৃপতি। তদীয় প্রগাঢ় প্রণয় পাশে আবদ্ধ হইয়া আমিই তাঁহাকে মদীয় পিতৃসিংহাসনে স্থানদান করিয়াছিলাম; বহু দিবসাবধি আমি তাঁহার একান্ত প্রণয়িনী ছিলাম কিন্তু দেখুন কি আক্ষেপের বিষয় তিনি আর আমাকে প্রণয়নয়নে নিরীক্ষণ করেন না; অধিক কি কহিব তিনি আমাকে সামান্য মহিলার ন্যায় অবহেলা করেন; অতএব প্রভো! কি উপায় অবলম্বনে তাঁহার প্রণয় আমি পুনরুদ্দীপন করিতে পারি, এবিষয়ে আপনি সৎপরামর্শ প্রদান করুন।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্যক্ শিষ্টাচারসহকারে মুনিবর সন্নিধানে এই প্রকারে আবেদন করিল।

"ঋষিরাজ! যুদ্ধপ্রিয় ক্ষত্রিয়কুলে এ অভাগার জন্মপরিগ্রহ হইয়াছে। এক অসাধারণ রূপলাবণ্যশালিনী কামিনীর প্রণয়ে আমি মুগ্ধ হওয়াতে সে কিছুকাল পরে আমাকে স্বামিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। আমি তাহার সেই আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া তদীয় প্রণয়লাভার্থ বহুল তুমুলবিঘ্নসঙ্কুল রণস্থলে বিজয়লাভপূর্ব্বক স্বীয় যশোরশ্মিতে পৃথিবীতল প্রদীপ্ত করিয়াছি। কিন্তু হায়!

অদ্যাপি আমি তদীয় প্রণয়রত্ন সম্পূর্ণ লাভ করণে কৃতকার্য্য হই নাই; এক্ষণে সেই কামিনী মৎপ্রতি অনুরাগিণী নহে।”

এইরূপে ক্ষত্রিয়নন্দন আত্মবেদন ঋষি সমক্ষে নিবেদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিল, “তাপসবর, মদীয় বিবরণ আদ্যোপান্ত আকর্ণন করিলেন, এক্ষণে কি প্রকারে আমি তাহার হৃদয়ে প্রণয়াগ্নি পুনঃ প্রজ্বালন করি এবিষয়ে আমাকে সুপরামর্শ প্রদান করুন।”

দ্বিতীয় ব্যক্তির বিজ্ঞাপন সমাপ্ত হইবা মাত্র তৃতীয় ব্যক্তি অতিমাত্র ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, “আমি বিপুল সম্পত্তির অধিপতি, এক্ষণে ভ্রাতৃপ্রণয় অপনয় শোকে একান্ত প্রপীড়িত। আমি আমার একমাত্র সহোদরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতাম, সমুদায় ঐশ্বর্য্য রাজকার্য্য তাহার সহিত সমানাংশে বিভাগ করিবা লইয়াছিলাম অধিক কি কহিব আমি সংসারস্থ যাবতীয় সুখ তদীয় সুখান্বেষণে বিসর্জ্জন করিয়াছি; কিন্তু আমার অদৃষ্টগুণে সে আমার পূর্ণ প্রীতি প্রতিশোধ প্রদানে একান্ত পরাঙ্মুখ, ঋষিরাজ! ভ্রাতৃপ্রীতি প্রাপণার্থ আমি এক্ষণে কি করি?”

অনন্তর চতুর্থ যাত্রী নিবেদন করিল, “মুনিকুলতিলক, আমি স্বয়ং একজন কবি, মদীয় প্রণয় জনৈক মানবে পর্য্যবসিত হয় নাই। যাবতীয় বিজ্ঞ এবং সাধুরাই আমার প্রণয়পাত্র এবং সেই সকলের চিত্ত বিনোদনার্থ আমি আমার হৃদয়ের গূঢ়ভাব সংগীতাবলীতে নিবদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু ইহা কি সামান্য খেদের বিষয়, যে আমি যাঁহাদের জন্য ঈদৃশ বিষদৃশ যত্নশীল তাঁহারা আমার বিষয়ে একবার জিজ্ঞাসা করেন না। মহর্ষে! এক্ষণে তাহাদের নিদ্রিত প্রণয় জাগরিত করণার্থ কি কর্ত্তব্য, অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিউন।”

অনন্তর এক সৌম্যমূর্ত্তি ধীরপ্রকৃতি পুরুষ ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বিজ্ঞাপন করিল, “আর্য্য, আমি একজন বিজ্ঞানানুসন্ধিৎসু বিদ্যাপথের পথিক। গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্রাদি পরিপূরিত নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যে সমস্ত নিয়ম কৌশল নির্ণয় করিয়াছি, পৃথিবীর অন্তবস্ত অন্ত্র উদ্ভেদ করিয়া যে সমস্ত মহামূল্য পদার্থপুঞ্জের অস্তিত্ব অবধারিত করিয়াছি, তরুলতা ওষধিপুঞ্জের পরীক্ষানন্তর যে সমস্ত উত্তমোত্তম ঔষধরাশি গবেষিত করিয়াছি, সে সমুদায়ই আমি যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছি, কিন্তু কৃতঘ্ন মানবগণ আমার কথা কর্ণকুহরে স্থান দান করে না,—ফলতঃ তাহারা আমাকে অবহেলা করে, সাধারণ প্রণয় আহরণার্থ এক্ষণে কি কর্ত্তব্য?”

অনন্তর এক অবলা অগ্রসর হইয়া বিজ্ঞাপন করিল। “পিতঃ! আমার কিঞ্চিন্মাত্রও মাহাত্ম্য, জ্ঞান, ধন, ঐশ্বর্য্য বা সৌন্দর্য্য নাই; আমি এক সামান্যা, সুদীনা, সহায়হীনা, সরলপ্রাণা কুমারী মাত্র হইয়াও, কি ধর্ম্মপরায়ণ বিদ্বান্, কি

হীনবল অজ্ঞান, আমি সকলের প্রতি সমভাবে সম্যক্ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকি। তাহাদিগকে বিপন্ন দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, বলিতে কি, আমি তাহাদের মঙ্গল চেষ্টায় আমার জীবন সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জনেও পরাঙ্মুখ নহি। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় তাহাদের মৎ-প্রতি অণুমাত্রও অনুরাগ বা স্নেহ নাই এবং সেই জন্যই আমি আমার অভিলাষা-নুরূপ কার্য্য করিতে পারি না, অতএব হে তাপসশ্রেষ্ঠ! এঅধীনীর প্রতি কৃপাবিতরণ পূর্ব্বক কি প্রকারে এ অবলা তাহাদের প্রণয়পাত্রী হইতে পারে তদ্বিষয়ে আপনি সৎপরামর্শ প্রদান করুন।"

অনন্তর এক শান্তশীলা যোষিৎ অগ্রসর হওত ক্ষিতিন্যস্তজানু হইয়া ধীর বিনয় বচনে একান্ত মনে আবেদন করিল। "হে ঋষিপ্রবর! মদীয় শোক অম্বুধির অবধি নাই। আমি একজন সামান্য মহিলা এবং একমাত্র সন্তানের জননী। পুত্রমুখ দর্শনাবধি আমার অপত্যস্নেহ অতি প্রবল। সত্য বটে আমি আমার অঙ্কধন সেই নন্দনকে রাজসিংহাসন, কি মান সম্ভ্রম, কি ভূমি সম্পত্তি, কি বিপুল জ্ঞানশিক্ষা প্রদান করিতে পারি নাই, কিন্তু আমার হৃদয় কবাট উদ্ঘাটনপূর্ব্বক অমূল্যরত্নস্বরূপ মাতৃস্নেহ প্রদান করিয়াছি, হায় ঋষিরাজ, কি ক্ষোভের বিষয় দেখুন, তথাপিও তাহার হৃদয়ে মাতৃভক্তির লেশমাত্রের উদয় হয় নাই। এক্ষণে কি প্রকারে তাহার অন্তঃকরণে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হয় তাহা মহাশয় বলিয়া দিউন।"

এইরূপে স্বীয় স্বীয় আবেদন সমাপনান্তে এই সপ্ত সংখ্যক অভিযোক্তক যথাস্থানে নিস্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। মহর্ষিও ক্ষণকাল গম্ভীর তুষ্ণীম্ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

তাহাদের এতৎসমস্ত বিনয় বিজ্ঞাপন বচনবিন্যাসে বেলা অধিক হইয়া উঠিল। দিনমণি শীতশীর্ণ অচলবাসীদিগের উপর হিমানির দুঃসহ প্রপীড়ন নিবারণ মানসে যেন স্বীয় প্রখরতর কর বিকীরণ কারণে তাহাদিগের শিরোপরি ক্রমে ক্রমে সমাগত হইলেন। শৈত্য এবং অন্ধকার উভয়ে এক শত্রু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বন্ধুত্বভাব অবলম্বন পূর্ব্বক একত্রে নিভৃত গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। সকলে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সহসা অচল গুহাটি আলোকময় হইল। বোধ হইল যেন একটি অগ্নিময় কুজ্ঝটিকায় উহার অন্তর্দ্দেশ পরিপূরিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! সকলে এই কুজ্ঝটিকা মধ্যে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে বোধ হইল যেন আকাশপথে অলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন এক যুবা পুরুষ নবীন নীরদে পৃষ্ঠভার অর্পণ করিয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে; তপোধন ক্ষণকাল উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া অবলোকন করত অভিযোক্তকদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন। "দেখ, প্রণয় কি ঘোরতর সুষুপ্তিতে অভিভূত রহিয়াছে। এ মহীমণ্ডলে তদীয় নিদ্রাভঙ্গ করণে কাহার

ক্ষমতা নাই।” এই বাক্য বলিবা মাত্র সম্মুখস্থ ধূম্রাবলীর অভ্যন্তর হইতে কতিপয় সুন্দর মূর্ত্তি বহির্গত হইয়া প্রণয়ের শয্যা সন্নিকর্ষে সমাগমন পূর্ব্বক কেহ বা চুম্বন প্রদান দ্বারা, কেহ বা অশ্রুবারি বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে জাগরিত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিল। কেহ বা অন্তরে দুঃখরাশি থাকিতেও কৃত্রিম হর্ষ প্রকাশ করিতে করিতে কেহ বা মনঃপীড়ায় প্রপীড়িত হইয়া হস্তঘর্ষণ করিতে করিতে কেহ বা ক্ষিতিন্যস্তজানু হইয়া কেহ বা রাজ্যসিংহাসন, কেহ সুপ্রচুর স্বর্ণ ও হীরকাবলী, কেহ সম্ভ্রমপতাকা, কেহ যশোমালা প্রদানানন্তর কাতর স্বরে কহিতে লাগিল। “হে প্রণয়! আর কতকাল নিদ্রা যাইবে? শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কর।” প্রণয় তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, এবং তাহাদের প্রদত্ত ধনে, সস্নেহ চুম্বনে এবং অশ্রুজীবনে কিছুমাত্র উদ্বুদ্ধ না হইয়া অগাধে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত মূর্ত্তি যাত্রিগণের নয়নপথ হইতে অপসারিত হইয়া গেল। অবিলম্বে জনৈক পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ কলেবর পুরুষ, সৎকারোপযোগী বসনে বসান, ধূমগর্ভ হইতে বহির্গত হইলেন। নিঃশব্দপদসঞ্চারে প্রণয়ের পার্শ্বপার্শ্বে সমাগত হইলেন। ঘোর ঘনঘটায় ধরণী অঙ্গে যেরূপ কালিমা পড়ে, তাঁহার আগমনে প্রণয়ের স্বর্ণকান্তি সেইরূপ বিকৃতভাব ধারণ করিল। চীৎকার করিয়া প্রণয় উঠিয়া বসিলেন, এবং যাহারা তদীয় নিদ্রাভঙ্গনার্থ এতকাল বৃথা চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদিগকে হৃদয়ে গ্রহণার্থ করপ্রসারণ করিলেন। কিন্তু তাহারা যে পথে গিয়াছে সে পথ হইতে কেহ কখন ফিরে নাই; কেহই আসিল না। তখন উদ্বুদ্ধ প্রণয় রোদন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে যোগিবর যাত্রীদিগের প্রতি স্বীয় উজ্জ্বল গম্ভীর কটাক্ষ ক্ষেপণ করিলেন। ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “তোমাদিগের হৃদয়বেদনা-শান্তিসাধনার্থ আমার এই মাত্র মহৌষধ—সকলেই বুঝিতে পারিয়াছ,—মৃত্যুচ্ছায়া স্বীয় শরীরে পতিত না হইলে নিদ্রিত প্রণয় উদ্বুদ্ধ হয় না।”

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

শিল্প বাণিজ্য ও ব্যবসায় এই সময়ে কাহার কাহার হাত দিয়া সম্পন্ন হইত তাহা বিবেচ্য। রামায়ণের বহুস্থানে বহুবিধ ব্যবসায়ী ও শিল্পীর নাম উল্লেখ আছে, সেই সকল এই সংকীর্ণ স্থানে উদ্ধৃত হইতে পারে না। তবে এক স্থলে যথায় বহুতর শিল্পী ও ব্যবসায়ীর নাম একত্রে আছে, তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োশিতিতম সর্গে ভরত যৎকালে রামের অনুসরণে সসৈন্যে চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করেন, তৎকালে নিম্নলিখিত শিল্পী ও ব্যবসায়িগণ তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিল।

"মনিকারাশ্চ যে কেচিৎ কুম্ভকারাশ্চ
শোভনাঃ।
সূত্রকর্ম্মবিশেষজ্ঞা যে চ শস্ত্রোপ-
জীবিনঃ॥১২
মায়ূরকাঃ ক্রাকচিকা বেধকা রোচকা-
স্তথা।
দন্তকারাঃ সূপকারা যে চ গন্ধোপ-
জীবিনঃ॥১৩
সুবর্ণকারাঃ প্রখ্যাতাস্তথা কম্বলকারকাঃ।
স্নাপকোষোদকা বৈদ্যা ধূপিকা শৌণ্ডিকা-
স্তথাঃ॥১৪
রজকাস্তুন্নবায়াশ্চ গ্রামঘোষ মহত্তরাঃ।
শৈলূষাশ্চ সহ স্ত্রীভির্যান্তি কৈবর্ত্তকা-
স্তথা॥"১৫

মনিকার, সূত্রকর্ম্মবিশেষজ্ঞ (তন্তুবায়-রামানুজ,) কুম্ভকার, শস্ত্রোপজীবী (শস্ত্র নির্ম্মাণোপজীবিনঃ—রা,) মায়ূরক (ময়ূর পিচ্ছৈঃ ছত্রাদিব্যঞ্জনকারিণঃ—রা,) ক্রাকচিক(করপত্রং তেন জীবন্তি তে ক্রাকচিকাঃ—রা, করাতি),বেধকা (মণিমুক্তাদিবেধককর্ত্তারঃ—রা,) দন্তকারঃ (গজদন্তাদিভিঃ সমুদ্রকাদিকর্ত্তারঃ—রা,) গন্ধোপজীবী (গন্ধ দ্রব্য বিক্রয়িকাঃ—রা,) সুবর্ণকার, কম্বল কার,স্নাপক, অঙ্গমর্দ্দক, বৈদ্য,ধূপক, (ধূপবিক্রিয়য়া জীবিনঃ—রা,) শৌণ্ডিক, রজক, তুন্নবায় (সূচ্যা সীবনকর্ত্তারঃ—রা, দর্জি,) সুধাকার (যে চূর্ণ লেপন করে,) শৈলূষাশ্চ সহ স্ত্রীভিঃ বাইজি এবং ভেড়ো,) কৈবর্ত্ত।

এই উদ্ধৃত অংশ দ্বারা একবারে তিনটি বিষয় জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ শিল্পকার্য্য ও ব্যবসায় বহুবিধ সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ব্যবসায় এবং লাভের আকরস্থান রাজধানী অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া, যখন লাভের সর্ব্বপ্রকার আশার ধ্বংসস্থল চিত্রকূটের জঙ্গলে বাজাজ্ঞায় শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা গমনে বাধ্য হইয়াছে, তখন ইহা অনুমেয় যে ব্যবসায়ী ও শিল্পীদিগের কার্য্যপথে স্বাধীনতা স্রোত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইত না। সুতরাং তদ্রূপ বাধাজনিত তদ্বিষয়ের অনুগামী যে অমঙ্গল ও মান্দ্যতা,

তাহাও অবশ্য ঘটিত। এই সকল শিল্পী, ব্যবসায়ী ও বণিকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুগামী, বা অনুগমনে বেতনভোগী হইলে একথা খাটিত না, কিন্তু ভরতের আজ্ঞা হইল যে, সেই সেই বণিক্ অনুগমন করিবে।

"যে চ তত্রাপরে সর্ব্বে সম্মতা যে চ নৈগমাঃ।"

—"তত্র নগরে সম্মতাঃ প্রসিদ্ধাঃ নৈগমা বণিজঃ।"

রামানুজ।

কোন্ প্রসিদ্ধ বণিক্ এ কর্ম্মভোগে সহজে যাইতে স্বীকৃত হয়, অথবা স্ব ইচ্ছায় হইলে আবার রাজাজ্ঞা কেন? পুনশ্চ রাম যৎকালে বনগমন করিতে উদ্যত হয়েন, তখন রামের রক্ষা এবং সুখার্থে দশরথ সৈন্য প্রেরণের আদেশ দিয়া কহিতেছেন, বণিকেরা পণ্য দ্রব্য লইয়া সঙ্গে সঙ্গে গমন করুক।

"————বণিজশ্চ মহাধনাঃ।

শোভয়ন্তু কুমারস্য বাহিনীঃ সুপ্রসারিতাঃ।"

—"প্রসারিতাঃ—সুপ্রসারিতাপণাঃ।"

—রামানুজ।(১২)

কেবল ইহা হইয়াই ক্ষান্ত নহে। মনুর বিধানানুসারে ধরিলে, প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে আবার রাজার জন্য মাসে মাসে কিছু কিছু করিয়া খাটিয়া দিতে হইত। মনু, সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে বলিতেছেন,

"কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিনঃ।

একৈকং কারয়েৎ কর্ম্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ॥"

তৃতীয়তঃ ব্যবসায়ের প্রকৃতিভেদেই অনুমিত হইতেছে যে বেদাধিকারী বৈশ্যের দ্বারা ঐ সমস্তই সম্পন্ন হইত না। ভিন্ন ভিন্ন সঙ্করজাতি দ্বারা ব্যবসায় বা

(১২) বণিক্দিগের উপর এরূপ বা তথাবিধ দৌরাত্ম্য প্রাচীনকালে প্রায় সকল দেশেই কিছু না কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপের মধ্যমকালে এমন কি আধুনিককালেও কম ছিল না। সভ্যদেশ ইংলণ্ডেও এলিজিবেথের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত স্বদেশীয় বণিক্দিগের উপর তত না হউক বিদেশীয় বণিক্দিগের উপর অপরিমিত অত্যাচার হইত। ১৬৪০ খৃঃ অঃ রাজবিপ্লবের পর হইতেই কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় উভয় প্রকার বণিক্দিগের উপর অত্যাচার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া শমতা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ প্রজা দ্বারা বিনা পুরস্কারে নিয়মিতকালে রাজার ব্যাগার খাটার কিরূপভাবে অস্তিত্ব এবং প্রচলন ছিল। রাজপথ মেরামত রাখা সম্বন্ধে ইংলণ্ডে ফিলিপ এবং মেরির অষ্টবিংশতি রাজঘোষে এরূপ নিয়ম হইয়াছিল যে, যে রাজপথ যে পরিসরের মধ্য দিয়া গমন করিবে, সেই পরিসরস্থ লোকেরা সেই রাজপথ পরিষ্কার রাখার নিমিত্ত বৎসরে চারিদিন কাজ করিতে বাধ্য। ঐরূপ স্কটলণ্ডে ১৬৬৯ খৃঃ অঃ পার্লিয়ামেণ্টেতে যে আইন হয়, তদনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি বৎসরের মধ্যে ছয় দিন কার্য্য করিতে বাধ্য।

শিল্প বিশেষ সম্পাদিত হইত,—এস্থলে সেই সকল সঙ্করজাতির নাম পর্য্যন্ত উক্ত হইয়াছে। বাল্মীকির বহুপূর্ব্ব হইতে সঙ্করজাতির উৎপত্তি। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত ধরিলে, বাল্মীকি ত্রেতাযুগের এবং বেণরাজা সত্যযুগের। কথিত আছে যে সেই বেণ রাজার রাজত্বকালে রাজশাসনের শিথিলতায় প্রজাবর্গ কামবশে যথেচ্ছা অভিগমন করিলে বহুবিধ সঙ্কর বর্ণের সৃষ্টি হয়। সে যাহা হউক, পূর্ব্বে যে সকল অপেক্ষাকৃত হীনকার্য্য আর্য্যেরা স্বহস্তে বা শূদ্রের সাহায্যে করিতেন, যে দিন সঙ্করবর্ণের সৃষ্টি হইল, সেই দিন হইতে সেই সকল কার্য্যের ভার তাহাদিগের স্কন্ধে চাপাইয়া, অন্য বিষয়ে চিত্ত পরিচালন করিতে অবসর গ্রহণ করিলেন। প্রত্যেক সঙ্করবর্ণের আভিজাত্য বিবেচনায়, তাহাদের উপর উচ্চ বা নীচ ব্যবসায় আরোপিত হইল। তাহাই হিন্দু সমাজে চলিয়া আসিতেছে। এরূপ বন্দোবস্ত তত্তদ্ব্যবসায়ের বিস্তৃতি ব্যতীত সুসম্পাদিত হয় নাই। বাল্মীকির সময়ে এই বিস্তৃতির আরও বিস্তার। এই নিমিত্তই বহুবিধ ব্যবসায় ও শিল্প সকল যে বৈশ্য হইতে ভিন্নতর বর্ণের হস্তে বাল্মীকির সময়ে দেখা যাইতেছে, তাহাতে কিছুই বিচিত্রতা নাই। বৈশ্যেরা এসময়ে সাধারণতঃ সেই সকল জাতির শ্রমজাত দ্রব্য লইয়া উচ্চতম বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল, ইহাই অনুমিত হয়। এই সময়ের চিত্র এরূপ দেখা গেল, আবার আর্য্যজাতির আদিম সমাজের চিত্র দেখ। ঋগ্বেদের একজন কবি আত্মপরিচয় দিয়া কহিতেছেন যে, তাঁহার পিতা বৈদ্য, তিনি কবি, তাঁহার মাতা শস্যপেষণকারিণী।

"কারুর অহম্ তাতো ভিষগ্ উপল-
প্রক্ষিণীননা।"

৯·১১২·৩।

ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্ত ব্যতীত আর কোথাও জাতি বিভাগের কথার উল্লেখ নাই। তথায়ও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এই চারিটি মাত্র জাতির বিষয় উল্লেখ হইয়াছে। অনেকের মতে পুরুষ সূক্ত অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক।(১৩) একারণে অনেকে অনুমান করেন যে, প্রাচীনতম বৈদিক সময়ে জাতিভেদ ছিল না। তাহার পর দেখা যাইতেছে যে, সেই বেদের যে সকল সূক্ত প্রাচীন বলিয়া গ্রাহ্য, সেই সকলেই তক্ষা অর্থাৎ ছুতার, বৈদ্য, কামার, পাখীমারা, রথ নির্ম্মাণের কৌশল ও ব্যবসায় বর্ণন দৃষ্টে তাহার নির্ম্মায়ক, তন্তু এবং ওতু ও বয়ন শব্দের উল্লেখে তাঁতির কার্য্য, কৃষি, ক্ষৌরকার্য্য, রসারসি, চর্ম্ম, এবং জল বা সুরাবহনার্থে মসক বা ভিস্তির ("ছৃতি") উল্লেখ (১৪) হেতু তত্তদ্ব্যবসায়ীর ও

(১৩) Max Muller's Aus: Saus: lit pp. 570.

(১৪) Muirs Sanscrit texts vol V. তথা হইতে ব্যবসাদারের এই তালিকা গৃহীত হইল।

কার্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এসকল ব্যবসায়ী বা কাহারা ও এসকল কার্য্য কাহারাই বা করিত। আর্য্যেরা মুখে বেদসূক্ত রচনা এবং হাতে সেই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যে যে বিষয়ের বৈষম্যতা বৈদিক সময়ে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, বাল্মীকির সময়ে তাহা অতি প্রবল।

পূর্ব্বালোচিত কৃষি, ব্যবসায় এবং শিল্পের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় যে, তৎকালে দেশমধ্যে অন্তর্বাণিজ্য বিশেষরূপে প্রবাহিত হইত। এস্থলে আর এক বিষয় বিবেচ্য। অন্তর্বাণিজ্যই হউক, আর বহির্বাণিজ্যই হউক, তাহার সুবিধার নিমিত্ত দেশমধ্যে আপাততঃ এই কয় বিষয়ের আবশ্যক—রাজপথ, খাল, ঋণ দানাদান এবং ব্যাঙ্ক।

রাজপথ সম্বন্ধে পূর্ব্বগত এক প্রস্তাবে যথাযথ কথিত হইয়াছে, এবং একরূপ দেখান হইয়াছে, যে, রাজপথ যাহা ছিল, তাহা ভালরূপই ছিল, কিন্তু অধিক সংখ্যক ছিল না। তাহা সে সময় বিবেচনা করিলে না থাকারই সম্ভব। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বেই বা আমাদের কতই রাজপথ ছিল। যাহাহউক রাজপথের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং রাজপথ নির্ম্মাণদক্ষ কর্ম্মকরগণেরও অস্তিত্ব যখন অবলোকিত হয়, এবং সেই কার্য্যই তাহাদের বৃত্তিস্বরূপ দেখা যায়, তখন কি এরূপ অনুমান করায় দোষ আছে যে, যে স্থান দিয়া লোকের গতিবিধি সর্ব্বদা হইত, এবং বাণিজ্য কার্য্য নিরন্তর প্রবাহিত হইত, সেই সেই স্থানে প্রশস্ত রাজপথের অভাব ছিল না? ভরত যখন রামের অনুসরণে চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করেন তখন সৈন্য চলাচলের নিমিত্ত পরিসর রাজপথনির্ম্মাণ হেতু নিম্নলিখিত মত কর্ম্মকারগণ নিয়োজিত হইয়াছিল।

"অথ ভূমিপ্রদেশজ্ঞাঃ সূত্রকর্ম্মবিশারদাঃ।
স্বকর্ম্মাভিরতাঃ শূরাঃ খনকা যন্ত্রকাস্তথা॥
কর্ম্মান্তিকাঃ স্থপতয়ঃ পুরুষা যন্ত্রকোবিদাঃ।
তথাবার্দ্ধকয়শ্চৈব মার্গিণো বৃক্ষতক্ষকাঃ॥
সূপকারাঃ সুধাকারা বংশচর্ম্মকৃতস্তথা।
সমর্থা যে চ দ্রষ্টারঃ পুরতশ্চ প্রতস্থিরে॥"
২।৮০

ভূমি প্রদেশজ্ঞ, সূত্রকর্ম্মকার [শিবিরাদি নির্ম্মাণে সূত্র গ্রহণকুশল,] খনক, যন্ত্রক, [জল প্রবাহাদি যন্ত্রণসমর্থ,] স্থপতি [রথাদি কর্ত্তার,] যন্ত্রকোবিদ [ক্ষেপণী আদি [যন্ত্রকরণকুশল,] মার্গিণ [বনমার্গ রক্ষায় নিযুক্ত,] বৃক্ষতক্ষক [মার্গাবরোধক বৃক্ষছেত্তার,] সূপকার, সুধাকার, বংশকার, চর্ম্মকার।

অনন্তর ইহারা ভরতের নিমিত্ত কিরূপ রাজপথ প্রস্তুত করিল, তাহার প্রক্রিয়া নিম্নে যাহা প্রদর্শিত হইল, তদ্দৃষ্টে তৎকালে পথাদি নির্ম্মাণ প্রণালী বহুলাংশে অনুমিত হইবে।—"অনন্তর সূত্রকর্ম্ম পর, ভূভাগজ্ঞ, বৃক্ষতক্ষক, সুদক্ষ

খনক, অবরোধক, স্থপতি, বার্দ্ধকী, সূপকার, সুধাকার, বংশকার, চর্ম্মকার, যন্ত্রনির্ম্মাতা কর্ম্মান্তিক ভৃত্য, ও পথ পরীক্ষকেরা যাত্রা করিল। বহুসংখ্যক লোক হর্ষভাবে নির্গত হইলে, পূর্ণিমার খরবেগ মহাসাগরের তরঙ্গ রাশির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পথশোধকেরা সর্ব্বাগ্রে দলবল সমভিব্যাহারে কুদ্দালাদি অস্ত্র লইয়া চলিল এবং তরুলতা গুল্ম স্থাণু ও প্রস্তর সকল ছেদন করিয়া পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল। যেস্থানে বৃক্ষ নাই, অনেকে তথায় বৃক্ষ রোপণ করিল, এবং অনেকে কুঠার টঙ্ক ও দাত্র দ্বারা নানাস্থানের বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিল। কোন কোন মহাবল বদ্ধমূল উশীরের গুচ্ছ উৎপাটন করিল, এবং অনেকেই উন্নত স্থানে সমতল ও গভীর গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া দিল। কেহ, সেতুবন্ধন কেহ কর্কর চূর্ণ, (১৫) এবং কেহ কেহ বা জল নির্গমার্থে মৃৎ পাষাণাদি ভেদ করিতে লাগিল। স্বল্পকাল মধ্যেই সূক্ষ্ম প্রবাহ সকল জলপূর্ণ ও সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ হইয়া গেল এবং যে প্রদেশে জল নাই, তথায় বেদি পরিশোভিত কূপাদি প্রস্তুত করিল।"(১৬)

মার্গিন নামক কর্ম্মচারীর অস্তিত্ব হেতু ইহাও বোধ হয় যে, রাজপথের মধ্যে আশঙ্কাযুক্ত স্থান রক্ষার নিমিত্ত, রক্ষণে যত সমর্থ হউক বা না হউক, কিন্তু নিযুক্ত হইত। আমাদেরও নিযুক্ত হওয়া টুকুই জানিবার প্রয়োজন। যে সকল রাজপথ রাজধানী বা সহরের ভিতরে, সে সকলে নিয়মিতভাবে জলসিঞ্চন হইত। এবং উৎসবকালে আলোকে আলোকিত হইত। অন্য সময়ে আলো-

(১৫) ইহার দ্বারা নিঃসন্দেহ জানা যাইতেছে যে রাজপথ সকল কাঁকরাদি দ্বারা পাকা (metalled) করা হইত। ইহা অবশ্যই আমাদের প্রাচীন কালের পক্ষে গৌরবের কথা। পাশ্চাত্য ভূভাগের ইতিবৃত্ত দেখিলে পাকা রাস্তার প্রথম উল্লেখ শমিরমার রাজত্বকালে দেখা যায়। তৎপরে থিবস এবং কার্থাজিনীয় নাগরিকেরা পাকা পথ প্রস্তুত আরম্ভ করিয়াছিল। রোমনগরে ৫৬০ খৃঃ পূঃ আপিয়স ক্লডিয়সের দ্বারা ইহার অনুষ্ঠান হয়। বর্ত্তমান সভ্যতম ইউরোপ ভূভাগে ৮৫০ খৃঃ অঃ পূর্ব্বে নাগরিক রাস্তা সমস্ত পাকা করা হয় নাই, ঐ শকে স্পেনদেশীয় চতুর্থখলিফা দ্বিতীয় আবদুল রহমানের আজ্ঞাক্রমে কর্ডোবানগরেব রাস্তা দিয়া ইহার প্রথম আরম্ভ হয। পারিস নগর তদভাবে এমন ধূলা ও জঞ্জালময় ছিল যে তন্নিমিত্ত উহার পূর্ব্ব নাম লুটিটিয়া (Lutetia) পরিবর্ত্তন হইয়া পারিস হয়। তথায় ১১৮৪ খৃঃ অঃ দ্বিতীয় ফিলিপ প্রথমে পাকা রাস্তার অনুষ্ঠান করেন। লণ্ডননগরে একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইহার অনুষ্ঠান হয় নাই। জর্ম্মানীতে ইহার প্রথম সূত্রপাত খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। এই তুলনে আমাদের পিতৃপুরুষদিগের কার্য্যশৃঙ্খলা ও উদ্ভাবনীশক্তি অবধারণ কর।

(১৬) অযোধ্যাকাণ্ডে ৮০ সর্গ। এস্থলে পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কৃত অনুবাদ গৃহীত হইল। বাহুল্যভয়ে মূলাংশ উদ্ধৃত হইল না।

কিত হইত না তাহা নিম্নলিখিত কথার ভাবে বোধ হইতেছে। রামের যৎকালে রাজ্যাভিষেকের কথা হয়, তখন উৎসব হেতু, এবং রাম যদি রাত্রিকালে নগর ভ্রমণে বহির্গত হয়েন, এজন্য স্তম্ভ সকল নির্ম্মাণ করিয়া পথে আলোক দিবার নিমিত্ত তাহাতে দীপাবলী সজ্জিত হইল।

"প্রকাশীকরণার্থঞ্চ নিশাগমন শঙ্কয়া।
দীপবৃক্ষাং স্তথা চক্রুরনুরথ্যাস্থ সর্ব্বশঃ॥"(১৭)
২।৬।১৮

পথ সকল সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করা হইত। মনুসংহিতায় যে যে ব্যক্তি রাজপথে মল মূত্র ত্যাগ প্রভৃতি যে কোনরূপে পথ অপরিষ্কার করিত, তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করা হইত (মনু ৯।২৮২-২৮৩)। কিন্তু সচরাচর পথ পরিষ্কার রাখার নিমিত্ত দণ্ডবিধি দ্বারা বা অন্য কোনরূপে বাধ্য করা হয় নাই। "পথ সংস্কার" শব্দের ভুয় উল্লেখ হেতু পথ মেরামত প্রথার বহুলতা জ্ঞাপিত হয়। এ পথসংস্কারের নিমিত্ত রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিত কি না, তাহা নিরূপণ হয় না। হইতে পারে যে সকল ব্যক্তিকে পূর্ব্ব কথিত রাজনিয়ম অনুসারে মাসে মাসে রাজার জন্য কিছু কিছু করিয়া কাজ করিতে হইত, তাহাদেরই মধ্যে কার্য্যক্ষম এবং তদুপযুক্ত জাতীয় ব্যক্তি দ্বারা এই পথসংস্কার ও পূর্ব্বোক্ত পথ পরিষ্কার কার্য্য সমাধা করা হইত।(১৮)

(১৭) নৈমিত্তিক আলোদানের অভাব হেতু অন্যের সহ তুলনা করিলে আর্য্যগণ নিন্দনীয় হইবেন না। পুরাকালে প্রায় সর্ব্বদেশেই কেবল উৎসবাদি আনন্দ কার্য্যে মাত্র পথে আলোক প্রদানের প্রথা অবলোকিত হয়। বেক্‌মান সাহেবের কহত মত জানা যায় যে, হিরোডোটসের সাময়িক মিসরীয়েরা বাল্মীকির সময়ের ন্যায় উৎসবে মাত্র এই প্রথার অনুসরণ করিত। য়িহুদিরা Festum encoeniorum নামক পর্ব্বকালে অষ্টরাত্রি প্রতি গৃহের সম্মুখে দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিত। স্কাইলসের বাক্যানুসারে ইহা ব্যক্ত যে গ্রীকেরা উৎসবাদিতে কেবল ঐ প্রথাবলম্বী ছিল। রোমনগরে ক্যাটিলিনের ষড়যন্ত্র ভেদ হইলে কিকিরোর গৃহাগমনকালীন নগরবাসীরা আনন্দে নগর আলোকিত করিয়াছিল। ইত্যাদি। কিন্তু ধারাবাহিক রূপে পথে আলোক প্রদানের প্রথা পুরাকালে এবং খ্রীষ্টের পরেও বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত কোথাও লক্ষিত হয় না। ইহার প্রথম সৃষ্টি পারিস নগরে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ঐ নগর দস্যুদল দ্বারা এতদূর উত্যক্ত হয় যে, অধিবাসীরা অনন্যোপায় হইয়া রাত্রি নয়টার পর হইতে সমস্ত রাত্রি নগর দীপাবলী দ্বারা আলোকিত রাখিত। এ নিমিত্ত ১৫২৪ খৃঃ অঃ রাজাজ্ঞা প্রচারিত হয়, সেই আজ্ঞা সময়ে সময়ে [১৫২৬, ১৫৫৩ খৃঃ অঃ ইত্যাদি।] লোকের স্মরণার্থে পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হয়। এইরূপে নিত্য আলোকদানের প্রথা পারিস নগরে প্রথম সৃষ্টি হয়।

(১৮) পাশ্চাত্য ভূমির অধুনিক সভ্যতা গর্ব্বিতজাতির ব্যবহারসহ এখানে তুলনা করিয়া দেখা যাউক। ফ্রান্সরাজ্যে ১৩৭২ খৃঃ অঃ এবং স্কটলণ্ডে ১৭৫০ খৃঃ অব্দ

উত্তর ভারতবর্ষ যেরূপ নদীমাতৃক দেশ তাহাতে খালের আবশ্যক ছিল না। তথাপি "কৃত্রিম সরিৎ" প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতন্নিমিত্ত যদি কোন আর্য্য সন্তান এই বলিয়া অহঙ্কার করিতে চাহেন যে, যে খাল কাটা প্রথা ১৭৫৫ খৃঃ অঃ সাঙ্কিক্রক খাল কাটা দিয়া ইংলণ্ডে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, আর্য্যেরা বহু প্রাচীন কালেই তাহার অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আপাততঃ কোন আপত্তি নাই। ব্যাঙ্কের প্রথা ছিল কি না তাহা জানি না। ছয় কাণ্ড রামায়ণে তদ্ভাবের কোন আভাষ নাই। তবে ঋণ দানাদানের প্রথা যখন ঋগ্বেদেই (১০-৩৪-১০) লক্ষিত হয়, তখন বাল্মীকির সময়ে যে ইহার বহু প্রচলন, তাহা বলা বাহুল্য। বহুলোক একত্র হইয়া ভাগে বাণিজ্য করণ প্রণালীর উল্লেখ রামায়ণে দেখিতে পাই না। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার জন্মকালীন ইহার প্রচলন অবলোকিত হয়। যথা

"সমবায়েন বণিজাং লাভার্থং কর্ম্ম-
কুর্ব্বতাং।
লাভালাভৌ যথা দ্রব্যং যথা বাসম্বিদা
কৃতৌ॥"
ব্যবহার কাণ্ডে।

ধনাগমের প্রধান উপায় স্বরূপ বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা বাল্মীকির সময়ে কিরূপ বিস্তৃত ও উন্নতিশালী হইয়াছিল তাহা দেখা যাউক। এখানে প্রায়ই অন্ধকারে পদক্ষেপ করিতে হইবে। বিদেশ বাণিজ্য সম্বন্ধে "বণিজো দূরগামিনঃ" ইহা বাল্মীকি কর্ত্তৃক অসংখ্য বার উক্ত হইয়াছে। দ্বীপবাসী এবং সামুদ্রিক বণিকের সেই পারিমাণে উল্লেখ পাওয়া না যাউক, কিন্তু পাওয়া যায়।

"উদিচ্যাশ্চ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ
কেবলাঃ।
কোট্যাপরান্তাঃ সামুদ্রা রত্নান্যুপহরন্তু তে॥"
২।৮২।৮

—উত্তর পশ্চিম এবং দক্ষিণ দেশস্থ,

পর্য্যন্ত গৃহস্থগণকে আপন গৃহের ময়লা গৃহের সম্মুখস্থ পথে নিক্ষেপ করিবার বাধা ছিল না। সুতরাং অপরিস্কারকের দণ্ড ছিল না। কিন্তু যে অংশ দিয়া পথ গিয়াছে সেখানকার সকলকে আত্মব্যয়ে বা কায়িক পরিশ্রমে সেই পথ সর্ব্বদা পরিস্কার রাখিতে হইত। ১২৮৫ খৃঃ অঃ ফিলিপের রাজত্বকালে যে আইন জারি হয়, তদনুসারে যাহার বাড়ীর কাছ দিয়া যে পথ গিয়াছে, তাহাকে সেই পথ মেরামত করিতে হইবে। ইহাতে লোকের অমনোযোগবশতঃ ১৩৮৮ খৃঃ অঃ এই আইনসহ দণ্ডবিধি পর্য্যন্ত যোজিত হয়। ১৬০৯ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ফ্রেঞ্চেরা এই রাজদৌরাত্ম্যভোগ করিয়া আসিয়াছিল। বার্লিন নগরে ১৫৭১ খৃঃ অঃ এক আইন হয়, তদনুসারে, যে যে বাজার ঘাটে অধিক ধূলা মাটি জন্মিবে, সেই সেই বাজার ঘাটে যিনি যিনি গতায়াত করিবেন, তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে ধূলা মাটির ভার সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগমন করিতে হইবে। কেমন, এর তুলনায় গরিব ব্রাহ্মণদের বিধি কি রকম?

দ্বীপবাসী এবং সামুদ্রিক বণিকেরা রত্ন উপহার প্রদান করুক।

এখানে দেখা যাইতেছে যে বহুদূরগামী বাণিজ্য কেবল স্থলপথে নহে, জলপথেও আছে। জলপথে গমন কেবল বাল্মীকির সময়ে নহে, বৈদিক আমলেও দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে (১-১১৬, ১-২৫,৭-৮৮ "নাব সামুদ্রিয়" বাক্যের উল্লেখে অবশ্যই সমুদ্রগামী জাহাজ বলিয়া প্রতীত হইবে। কিন্তু এখন কথা এই যে এ সমুদ্র গমন আর্য্যেরা আপনারা করিতেন, না অন্যের গমনাগমন করিতে দেখিয়া গান করিতেন। তাই বা কি করিয়া বলি, মনুতে ভূয়ো ভূয়ঃ সমুদ্রগামীর কথার উল্লেখ হইয়াছে, এবং তাহাদের সম্বন্ধে নানারূপ ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আবার নারদীয়ে পর্য্যন্ত

"———সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ।

* * *

ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্মনিষিণঃ॥"

পূর্ব্বকালীন সমুদ্র যাত্রা প্রথা সূচনা করিয়া কলিযুগে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং মানিতে হইবে যে প্রাচীনকালে আর্য্যেরা সমুদ্রে গমন করিতেন। কিন্তু আবার ঐ মনুতে (২।২৩-২৩) দেখ, তথায় আর্য্যবাসস্থান সম্বন্ধে শেষ নির্দ্দেশ এই করা হইয়াছে যে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃ যেখানে যেখানে বিচরণ করে তাহাই যাজ্ঞিক দেশ, তাহাতেই আর্য্যেরা অধিবাস করিতে পারেন,অন্যত্রে কদাপি নহে। কিন্তু শূদ্রের পক্ষে এ বিধান নাই, তাহারা জীবিকার্থে যথায় তথায় গমনে এবং বাসে সমর্থ। (১৯) এ কথা সম্ভবতঃ বাল্মীকির সময়েও খাটে। আবার বল্মীকির পরবর্ত্তী সময়ের ঘটনাবলী যদি ইহার কিছু মাত্র প্রতিপোষক হয়, তবে দেখা যায় যে Sarmancherja (সম্ভবতঃ শর্ম্মনাচার্য্য) নামে এক ব্রাহ্মণ গ্রীক ভূমে গমনান্তর,ম্লেচ্ছদেশে আগমনে আপনাকে পতিত জ্ঞানে, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আথেন্স নগরে অগ্নি প্রবেশ করেন। ঐরূপ কল্যাণ নামে আর এক ব্রাহ্মণ আলেকজাণ্ডারের সহগামী হইয়া, ঐ একই কারণ হেতু Pasargada নগরে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতএব ধর্ম্মভীরু ভারতে, স্বদেশ পরিত্যাগ এবং ম্লেচ্ছদেশে গমন যখন এমন দূষণীয়, তখন কিরূপে নির্ণয় করিতে পারা যায় যে ইহারা সমুদ্রপথে পোতারোহণ পূর্ব্বক অতি দূরদেশে গমনাগমন এবং বিদেশ বাণিজ্য সম্পন্ন করিতেন। সমুদ্র যাত্রা যেন কোন মতে হইল, কিন্তু যে দেশের সহ বাণিজ্য করিতে হইবে, সে দেশে ত সম্ভবতঃ কতকগুলি লোককে আজীবন না হউক, কিছুদিন থাকিতে হইবে। সে সময়ের জলপথে গতিবিধি

(১৯) Hero: vii 65, 86. &c গ্রীকদেশে যুদ্ধগামী সৈন্যমধ্যে ভারতীয় পদাতি ও অশ্বারোহীর উল্লেখ পাওয়া যায়, ইহারা কিরূপ ভারতীয় তাহা জ্ঞাত নহি, হইতে পারে ভারতস্থ পার্ব্বতীয় বা তদ্রূপ অপরাপর কোন নিকৃষ্ট জাতি হইবে।

থাকিলেও তাহা উন্নতভাবের ছিল না সুতরাং যাওয়া আসার সুবিধার অভাবে সে কিছুদিন, নেহাত্ত কিছুদিন নহে। যদি এ কিছুদিনে দোষ না পড়ে, তবে কাম্বোজ প্রভৃতি প্রদেশীয় লোকেরা কেন ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইল? যদি বলা যায় শূদ্রেরা যদৃচ্ছা গমনে সক্ষম, সুতরাং তাহাদের দ্বারা বিদেশ বাণিজ্য সমাধা হইত, কিন্তু তাহা হইলে শূদ্রেরা সমাজে এত হীন ও নির্ধন হইবার কারণ কি? এই সকল কারণে বোধ হয় যে আর্য্যেরা সমুদ্র যাত্রায় যে বাণিজ্য করিতেন, তাহা কৃষ্ণসার বিচরিত দেশমধ্যেই আবদ্ধ ছিল, অর্থাৎ ভারতেরই অধিবেশিত উপকূলভাগে এবং সন্নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জ সহ সামুদ্রিক বাণিজ্য সমাধা হইত। এখানে বলিতে পারা যায় যে, যেন পরবর্ত্তী আর্য্যেরা স্বধর্ম্ম বিনাশ ভয়ে সহসা স্বদেশ পরিত্যাগ করিতেন না, কিন্তু বৈদিক সময়ে ত সে বাধা ছিল না; ইহা সত্য বটে, কিন্তু যে সময়ে বৈদিক আর্য্যেরা সভ্যতা পদবীতে পদার্পণ করিয়া বিলাস্ কলা বিস্তার করিয়াছিলেন, সে সময়ে সমস্ত মেদিনী ঘোর মূর্খতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মিসরীয় এবং ফিনিসীয় জাতিরা যদিও কিয়ৎপরিমাণে সভ্য হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা আয়ত্তাতীত দূরবর্ত্তী ছিল। অতএব বোধ হয় বৈদিক আর্য্যদেরও জলপথ, স্থলপথে অপরিচিত ও অগম্য, কেবল জলপথে পরিচিত ও গম্য, এমন সকল ভারতস্থ দেশেই গমনাগমন হইত।

আদিমকালীয় দক্ষ সমুদ্রগামী জাতি ফিনিসীয়দিগের ভারতে গতিবিধি ছিল কি না তাহা জ্ঞাত নহি। যদি বা ছিল, তাহা না থাকারই মধ্যে, নতুবা আরব ও ভারতের মধ্যে সমুদ্র অনাবিষ্কৃতের ন্যায় থাকিত না। এবং সিন্ধুনদ হইতে মিসর পর্য্যন্ত সমুদ্র পথ আবিষ্কারার্থে সাইলাক্স দরায়ুস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইতেন না। আবার দেখা যায় যে, ১৩০ পূঃ খৃঃ টলিমি এবারগিটিসের রাজত্বকালীন এক্ষদস ভারত এবং মিসরদেশের মধ্যস্থ সমুদ্র পার হওয়াতে, অলৌকিক কার্য্যসাধনের ন্যায় "ধন্য-ধন্য" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টের প্রথম শতাব্দীতেও এ সমুদ্র পার হওয়া আর আশ্চর্য্যজনক ছিল না, তখন ইহা সাধারণ কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

দূরবর্ত্তী দেশ সকলের সহ বাল্মীকির সময়ের ন্যায় প্রাচীনকালে ভারতের জলপথে বাণিজ্য বহুলতা না থাকিলেও, পাশ্চাত্য ভূভাগের দূরতর দেশ পর্য্যন্ত ভারতের ধনবত্তার গৌরব ধ্বনিত হইত, এবং তাৎকালিক প্রায় সকল সভ্যদেশেই এরূপ সকল বস্তু ব্যবহৃত হইত, যাহার জন্ম কেবল ভারতবর্ষ বলিলেই হয়, এবং সম্ভবতঃ কেবল ভারতবর্ষই তৎকালে তাহাদের জন্মভূমি ছিল। ইহা কিরূপে সম্ভবে। ভারতের বিদেশ গমন যথাযথ উপরে আলোচিত হইল। গ্রীক্দিগেরও সে প্রাচীনকালে, তদ্বিষয়ে বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয় না। হোমরের

সময়ে লিবিয়া এবং মিসরদেশ কেবল জনশ্রুতিতে পরিচিত ছিল। ইটালী এককালেই অপরিজ্ঞাত ছিল। এমন কি কৃষ্ণসাগরের অস্তিত্ব পর্যান্ত কেহ জ্ঞাত ছিল না। বিশেষতঃ হেসিয়ডের গ্রন্থে সমুদ্রযাত্রা যেরূপ ভয়াবহ এবং জাহাজ গঠনপ্রণালী যেরূপ কুৎসিত অনুমিত হয়, [২০] তাহাতে সে সময়ে দূরদেশাদিতে কি স্থলপথে কি জলপথে গমনাগমন অতি সংকীর্ণই বলিতে হইবে। তথাপি সেই গ্রীসে এমন অনেক বস্তুর ব্যবহার তৎকালে দেখা যায় যে, যাহার জন্মস্থান কেবল ভারতবর্ষ। এস্থানে বলা উচিত যে, সেই সেই দ্রব্য ফিনিসীয় বণিক্‌দিগের দ্বারা তদ্দেশে নীত হইত। যাহা হউক ঐরূপ পুরাতন বাইবেলে জবাধ্যায় অনুসারে অফির দেশজ যে সকল দ্রব্য হিব্রুদেশে আমদানি হইত, তাহার অবস্থাগত বিবরণ দৃষ্টে পণ্ডিতবর মক্ষমূলর বিবেচনা করেন যে সে সকল ভারতজাত দ্রব্য এবং অফির সৌবীরদেশের নামের অপভ্রংশ মাত্র।(২১) বাইবেল গ্রন্থের আর একস্থলে(২২) টায়রনগরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনে তদ্দেশে নীল, উত্তমোত্তম কার্পাস বস্ত্র, এবং নানাবিধ সূচের কাজ যুক্ত পট্টবস্ত্র, পলা, মুক্তা ইত্যাদি আমদানী হইত। ইহার সকলেই যে ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য এমন নহে, কিন্তু সে সমস্তই যে ভারতবর্ষস্থ বা তন্নিকটস্থ অন্যান্য পূর্ব্বদেশজাত দ্রব্য, তৎপক্ষে বোধ হয় সন্দেহ নাই, এবং সে সন্দেহ না থাকিলেই ভারতবর্ষের সঙ্গে তাৎকালিক পাশ্চাত্য বাণিজ্যের অপরিমিত সন্দেহ স্থাপিত হইতে পারে। নীল বহুপূর্ব্বকাল হইতে আমেরিকায় আবিষ্কার কাল পর্য্যন্ত কেবল ভারতবর্ষ হইতেই যে আর সর্ব্বত্রে নীত হইত, তৎপক্ষে অল্পই সন্দেহ আছে,(২৩) এবং বাইবেলে যে নীলের কথা আছে, তথায়ও এ বাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে।

[২০] Grotes Greece I 491.

[২১] Max Muller'ssame of Language I 7a8,

(২২) Greek : xxvII.

[২৩] নীল সম্বন্ধে অধ্যাপক বেক্‌মান বলেন যে অতি প্রাচীনকাল হইতে আমেরিকা উপনিবেশিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইউরোপে ব্যবহৃত সমস্ত নীল ভারতবর্ষ হইতে আমদানী হইত। এবং উত্তমাশা (cape of Good-Hope) দিয়া ভারতবর্ষের পথ পরিষ্কার হওয়ার পূর্ব্বে, উহা ভারতীয় অন্যান্য দ্রব্যের সহ, পারস্য উপসাগর দিয়া স্থলপথে ব্যাবিলন বা আরবদেশের মধ্য দিয়া মিসরে নীত হইত, এবং তথা হইতে ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রেরিত হইত। নীলের জন্মভূমি এবং বাণিজ্য বিষয়ে উক্ত অধ্যাপক বলেন" The proper country of this production is India; that is to say, Gudseherat or Gutscherad, and Cambaye or Cambaya, from which it seems to have been brought to Europe since the earlist periods. It is found mentioned, from time to time, in every century; it is never spoken of as a new article, and it has always retained its old name; which seems to be a proof that it has been used and employed in commerce without interup-

টায়র নগরে নীত অন্যান্য দ্রব্য সমূহের পক্ষে পণ্ডিতবর বিনসেণ্ট কহেন, যে এজিকিয়েল অধ্যায়ে শিল্পজাত পট্ট বস্ত্র প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে, যৎসম্বন্ধে তৎস্থলে ইহাও কথিত হইয়াছে যে সেই সকল বস্ত্র ইউফ্রেটিস নদীর তীরস্থ হারাণ, কামেক প্রভৃতি নগর হইতে আমদানী হইত, সেই সকল দ্রব্য বাস্তবিক সেই সকল স্থান হইতে আমদানী হইত না। ইউফ্রেটিস তীরস্থ নাগরিকেরা সে সকল দ্রব্যোৎপাদক শিল্প কৌশল বিন্দুমাত্র অবগত ছিল না। ঐ সকল দ্রব্য যে আসিয়া মহাদেশের পূর্ব্বখণ্ড হইতে আমদানী হইত, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এবং ইহাতেও অল্প সন্দেহ আছে যে ডিডন ও ইডুমিয়া নগর হইয়া আরব দেশের মধ্য দিয়া যে বাণিজ্য চলিত এবং পট্টবস্ত্রাদি যাহার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ছিল, সেই বাণিজ্যস্রোতের মূলস্থান ভারতবর্ষ। অপরঞ্চ পুরাতন বাইবেলের কোনস্থানে স্পষ্টতঃ ভারতবর্ষের নামোল্লেখ নাই। বাইবেলের মতানুসারে ইউফ্রেটিস নদীই পৃথিবীর পূর্ব্বতম দেশের সীমা এবং তদ্রূপ বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐ বাইবেলেই আবার পূর্ব্বদেশজাত শিল্প দ্রব্যাদি পাশ্চাত্য ভূভাগে নীতার্থে, বহুপূর্ব্বকাল হইতে স্থাপিত বণিক্‌দিগের গতায়াতের পথের

tion "পুনশ্চ" I shall now prove what I have already asserted, that indigo was at all times used, and continued without interruption to be imported from India."—Johnston's translation of Beckmann's history of inventions and discoveries. Vol. II 260, 260. এখানে যত প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা খ্রীষ্টীয়ের পরস্থ এবং অল্প অংশে পূর্ব্বস্থ, সে সকল প্রায়ই অকাট্য। কিন্তু প্রাচীনতম প্রমাণ যত উদ্ধৃত করা উচিত ছিল, যদিও বেক্‌মান সাহেব তাহা করেন নাই, তথাপি তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, যত দিন তাহার বিরুদ্ধে কোন অটল প্রমাণ না পাওয়া যায় ততদিন সে মত অখণ্ডনীয়, এবং পাঠক চেষ্টা করিলে ঐ মত সমর্থনে যত সফল হইবেন, খণ্ডনে তত হইবেন না। নীলের উৎপাদন প্রাচীনকালে যে ভারতের একচেটিয়া ছিল, এবং ভারত উহার উৎপত্তি স্থান সমূহের মধ্যে যে নিতান্তই প্রধান, নীলের আমদানী রপ্তানির বর্ত্তমান সাময়িক তালিকাতেও সে কথা সমর্থন করিবে। ১৮৪৬ খৃঃ অঃ মুদ্রিত Waterson's Cycloperdia of Commerce নামক পুস্তকে সমস্ত সভ্যতম দেশের নীলের খরচ এইরূপ দেওয়া আছে।

বৃটনদ্বীপে	১১৫০০ বাক্স।
ফ্রান্স	৮০০০ ঐ
জর্ম্মানি এবং ইউরোপের অপরাপর সমস্ত দেশ	১৩৫০০ ঐ
পারস্য	৩৫০০ ঐ
ভারতবর্ষ	২৫০০ ঐ
ইউনাইটেডষ্টেট	২০০০ ঐ
অন্যান্য সমস্ত দেশ	২০০০ ঐ
সমুদয়ে	৪৩৫০০ ঐ

ইহার মধ্যে উত্তর ভারতবর্ষ হইতে ৩৪৫০০, এবং মান্দ্রাজ, ও গোয়াটিমালা প্রভৃতি আমেরিক স্থান হইতে ৮৫০০ উৎপন্ন ও রপ্তানি হইয়া থাকে। Page 385. art: Indigo.

উল্লেখ আছে।(২৪) আমি বিবেচনা করি যে এই পথ নিঃসন্দেহই বহুপূর্ব্বতর দেশে প্রধাবিত এবং ইহার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ ছিল। এই সম্বন্ধ বাল্মীকির বহুপূর্ব্ব হইতে স্থাপিত ও পরেও প্রচলিত, অতএব ইহা বাল্মীকির সময়ের উপরেও বর্ত্তে।

প্রাচীন কালীয় স্থলীয় বাণিজ্য কার্য্য আলোচনায় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে দূর ব্যবধানস্থিত দুই দেশের উৎপন্ন দ্রব্য পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হইতেছে বটে, অথচ উভয় দেশের লোক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্য করেনা, এবং হয়ত কেহ কাহাকে চিনেও না, অথবা একে অপরের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই। ব্যবধানের মধ্যস্থিত জাতি সমূহের দ্বারা হস্তহইতে হস্তান্তরে ব্যবসার দ্রব্য নীত হইয়া দেশবিদেশে বিকীর্ণ হইত। এরূপ হওয়ার কারণ সহজেই উপলব্ধ হইবে। বোধ হয় ইহাও এক প্রধান কারণ যন্নিমিত্ত প্রাচীন কালে হিব্রু বা গ্রীক্‌ভূমে যদিও ভারতীয় দ্রব্যের বিস্তার দেখা যাইতেছে, কিন্তু ভারতীয় লোকের দেখা নাই, ঐরূপ আবার ভারতেও তাহাদের নাম কেহ শুনিয়াছে কেহ বা শুনে নাই। ভারতের প্রতিবেশী পহ্লব বা পারস্যবাসীদিগের ভারতে সমাগমের যথেষ্ট উল্লেখ ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ হইতেই পাওয়া যায়। উড়িষ্যার ঐতিহাসিক গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয় যে, ৫৩৮ খৃঃ পূঃ যখন বজ্রদেব উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন পারস্যবাসী ম্লেচ্ছরা উড়িষ্যা পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমার বোধ হয় পহ্লবজাতিরাই ভারবর্ষের সহ পাশ্চাত্য বাণিজ্যের মধ্যস্থলীয়।

ভারতীয়েরা যদিও ম্লেচ্ছদেশে গমনবিমুখ ছিলেন, তথাপি ম্লেচ্ছদিগের ভারতে আগমনের দ্বারা বিদেশ বাণিজ্য সুন্দররূপে প্রবাহিত হইত। তাহাতে ধনবৃদ্ধি পক্ষে লাভ ভিন্ন লোকসান নাই, তবে স্বয়ং কৃতী হইলে যতদূর হইবার সম্ভব তাহা অবশ্যই হইবে না। আডাম স্মিথ বলেন যে যখন স্বদেশ হইতে বিদেশস্থ দ্রব্য প্রেরণ এবং গ্রহণে স্বয়ং কৃতী না হইতে পারা যায়, সেস্থলে দেশজাত বস্তু সকলের অযথা ভাবে নিয়োগাপেক্ষা, বৈদেশিক যত্নে বিদেশ নীত হইলেও যথেষ্ট লাভের সম্ভব আছে, এবং তিনি দেখাইয়াছেন যে এই নিয়ম হেতু প্রাচীনকাল হইতে মিসর, চীন এবং ভারতবর্ষ স্বয়ং বৈদেশিক বাণিজ্য বিমুখ হইলেও বিপুল ধনশালী হইয়াছিল। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে এই কারণেই উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ভারতীয় উপনিবেশ সকলের ধনশালিত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতের ভাগ্যে কি এই অবস্থাই আবহমান কাল চলিবে?

ইতি সপ্তম প্রস্তাব।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

[২৪] এই স্থানের "Murray's History of India" নামক পুস্তকে অনুসন্ধান পাইয়া, পরীক্ষাপূর্ব্বক এস্থানে সঙ্কলিত হইল।

বংশ রক্ষা।

একদা কোন উৎসব স্থলে অনেকগুলি স্ত্রীলোক একত্রিত হন। গৃহস্থের পরিবারবর্গ সকলেই অতিশয় ব্যস্ত,কেহ এক দণ্ডকাল কোথাও বসিয়া থাকিতে পারেন না। কেবল এক জন অর্দ্ধপ্রাচীনা আভ্যন্তরিক ভার বৃদ্ধি বশতঃ মন্থরগতি হইয়া বড় কিছু করিতে পারিতে ছিলেন না। ইত্যবস্থায় তাঁহাকে পরিহাস করিবার যোগ্য যুবতীগণ ঠারাঠারি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগের বদনজ্যোতিতে গৃহ আলোকিত হইয়া উঠিল। ফলতঃ তদুপলক্ষে গৃহমধ্যে যেন অপর একটী উৎসব উপস্থিত হইল। প্রৌঢ়া বিপদ্ বুঝিয়া আপন কর্ম্মক্ষমতা প্রদর্শনার্থ কিছুক্ষণ এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু পাঠকগণ বুঝিতেই পারিতেছেন যে অল্প কাল মধ্যেই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন নিরুপায় হইয়া দুইচারিটী সমবয়স্কার নিকট আক্ষেপ সহকারে বলিলেন," ভাই ছুঁড়ি গুলার জন্যে জ্বালাতন হইয়াছি।" তাঁহারা গম্ভীরভাব অবলম্বন পূর্ব্বক, কথাতে, বিলক্ষণ সহৃদয়তা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, "তাইত ওদের রঙ্গ দেখে আর বাঁচি না।" কেহ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ওগো ওতে কিছু মনে করো না এ সকল ভাগ্যি থাক্‌লেই ঘটে।" আর একজন বলিলেন, "তা ভাই এতে তোমার দোষ কি, এ সকল ভগবানের ইচ্ছা; তা তুমি কেন দুঃখ করিতেছ?" তখন এই কথা শুনিয়া আর এক সুন্দরী মৃদু মধুর বচনে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ভাই যদি সত্য কথা বলিতে হয়,—তা সব দোষটা ভগবানের নয়,—একটুং ওঁরও ছিল!" এই কথাতে মহা হাসি পড়িয়া গেল ইত্যাদি।

নিষ্ঠুরতা কদাচই আদরণীয় নহে। যে প্রকারেই উৎপন্ন হউক ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মন কখন অবিচলিত থাকে না,থাকিলেও দোষের বিষয় হয়। লোকে ভগবানের নাম করিয়া অনেক দোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা পাইয়া থাকে। কিন্তু সমাজের ভদ্র মণ্ডলী বিচক্ষণ হইলে এতাদৃশ দোষ কখনই আবৃত থাকে না। স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি আচরণ প্রায় প্রকাশ্যরূপে আলোচিত হয় না এই জন্য অনেক দুর্বৃত্ত দুরাচার জনসমাজে ভদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারে নচেৎ তাহারা লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিত না।

আমরা যে বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি তাহার সকল কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিলে পাঠকবর্গের নিকট আমাদিগের শীলতার ত্রুটী হইতে পারে কিন্তু ইহার সার কথা গুলি প্রচার করা এত আবশ্যক হইয়াছে যে এখন চক্ষু লজ্জা ত্যাগে আর দোষ নাই। বঙ্গ-

দর্শন বালক বালিকাদিগের পাঠের নিমিত্ত লিখিত হয় না সুতরাং শৈশব পাঠকদিগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই প্রবন্ধ সন্তানদিগের হস্তে অর্পণ করিবার পূর্ব্বে যথাযোগ্য বিচার করিবেন।

শাস্ত্রে লেখা আছে যে, পুৎ নামে এক নরক আছে, তাহা হইতে যিনি ত্রাণ করেন তাঁহার নাম পুত্র। শাস্ত্রের কথা কে শুনে; বেদাধ্যয়ন, দয়া দাক্ষিণ্য এ সকল বিষয়ে শাস্ত্র কেবল হিজিবিজি বলিয়া গণ্য কিন্তু বংশরক্ষার বেলা শাস্ত্রের দোহাই দিতে কেহই ছাড়েন না। তাতে আবার ছাপার অক্ষরে ইংরাজি হরফে লেখা আছে live and multiply তখন আর কে পায়? বাঙ্গালিরা বংশ বৃদ্ধিতে যেমন পটু এমন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁহার শিষ্যগণ বিধবা বিবাহের জন্য লালায়িত। অমনিই রক্ষা নাই আর বাড়া বাড়ি কেন?

আমাদিগের সমাজে বংশ বৃদ্ধি লইযা কতই আনন্দ! হাতে খড়ির আড়ম্বরটা বহুদিন হইল উঠিয়া গিয়াছে। উপনয়ন কেবল ঐতিহাসিক ব্যাপার মাত্র, বলিলেই হয়। কিন্তু ষেটেড়া পূজা, ষষ্ঠী পূজা, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, পুনর্ব্বিবাহ, পঞ্চামৃত, সাধ ইত্যাদি গণ্ডা২ উৎসব কেবল বংশবৃদ্ধি লইয়াই হইয়া থাকে। বংশধরেরা কাজ করেন কি? ফের বংশ বাড়াইতে নিযুক্ত হন। আহা! কি সুন্দর! ঠিক যেন প্রবাল কীট পালে২ আসিতেছে যাইতেছে আর সমুদ্রে চড়া পড়িতেছে। প্রবালের মূল্য আছে, এবং প্রবাল কীটগণ যে সকল দ্বীপ উৎপাদন করে, তাহা ক্রমশঃ লোকের আবাস হয়। কিন্তু বঙ্গীয় কীটগণ আবির্ভূত হইয়া অনেকেই কেবল পিতৃলোকের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগের পথ করিয়া দেন।

আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে যাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় নাই তাহারাই, স্বয়ং বিবাহ করিতে কিম্বা পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে যারপর নাই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইনি কে? না একজন বংশজ ব্রাহ্মণ, অর্থাভাবে বিবাহ করিতে পারেন না—সর্ব্বনাশ উপস্থিত বংশলোপ হইবার উপক্রম। উনি কে? না শত্রুমুখে ছাই দিয়ে গুটি আষ্টেক জন্ম দিয়াছেন; কতক আছে কতক গিয়াছে; যারা আছে তাদের জন্য বিব্রত, বস্ত্র দিবার সংগতি নাই, সোনার চাঁদেরা দিগম্বরমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া ধূষরিত কলেবরে রাজপথ সুশোভিত করিতেছেন; গৃহিণী কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছেন: কর্ত্তা দোকানে বসিয়া কলিকাতে ফু দিচ্ছেন আর কোথায় নিমন্ত্রণ আছে তাহার তত্ত্ব লইতেছেন। আর একজন বলিতেছেন, "ভিক্ষাই আমাদের ব্যবসা—কি দিবি তা দে, না দিবি তো তোকে নির্ব্বংশ কর্ব।" কেহ বলিতেছেন, "গ্রামে একটু সম্ভ্রম আছে, লোকটা জনটা চেনে, তা ছোট কাজ করি কেমন করে, দশজন বড় লোকের দ্বারস্থ হইয়াই সংসার চালাচ্ছি

তা ভগবানের ইচ্ছা।” সন্তানের অভাব নাই—জন্ম দিচ্ছেন আর বড় লোকের দ্বারে আসিয়া বলিতেছেন আমি কন্যা-ভার গ্রস্ত। এমন বংশ কি না রাখিলেই নয়?

বাঙ্গালিদিগের ন্যায় নির্ব্বোধ জাতি প্রায় দেখা যায় না। উল্লিখিত লোক সকল যে সুখে আছে, তাহা নহে; নির্দ্দয় স্নেহহীন, তাহাও নহে কিন্তু মহাপুরুষেরা এক ভগবানের উপর মাদার দিয়া বসিয়া আছেন আর বৎসরান্তে এক একটী কাঙ্গালি বৃদ্ধি করিতেছেন। একবার ভুলেও ভাবেন না যে সন্তানোৎপাদন বন্ধ হইলে অনেক দুঃখ দূর হইবে।

কুষ্ঠরোগী অস্পর্শীয়; কিন্তু সে কখনই গুপ্তভাবে লোকের নিকট আইসে না; লোকালয় ত্যাগ করিতে পারে না বটে, কিন্তু সমীপবর্ত্তী ব্যক্তিরা তাহাকে দেখিয়া সরিয়া যাইতে পারে সুতরাং তাহার স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষার উপায় আছে। পৃথিবীতে দস্যুভয় যথেষ্টই আছে। সেই জন্য যথাযোগ্যরূপে রাজদণ্ড নিয়োজিত হইয়াছে এবং লোকে স্বং যত্নেও আপনাদিগের সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু যেসকল দুরদৃষ্ট সন্তান ঔরসজাত রোগে আক্রান্ত হইয়া কিম্বা দারিদ্রভার ধারণ পূর্ব্বক জগতে জন্মগ্রহণ করে তাহাদিগের যন্ত্রণার হেতু কে? তাহাদিগের কষ্টের শান্তি নাই কিন্তু কষ্টদাতৃগণ কি দণ্ডের পাত্র নহে? দণ্ডের পাত্র হইলে কি দণ্ড পাইবে না?

পৃথিবীতে পরের ক্ষতি করিলে দণ্ড হইয়া থাকে কিন্তু যাহার বুদ্ধির দোষে বা রিপুসম্বরণের ত্রুটীতে, সমস্ত সন্ততিগণকে আজন্মকাল রুগ্নশরীরে অর্দ্ধাশনে দিনপাত করিতে হয় তাহার দণ্ড হয় না। নিষ্ঠুরতা আদরণীয় নহে। কিন্তু এই নিষ্ঠুরতার সীমা নাই তথাচ ভদ্রমণ্ডলী এতাদৃশ লোকের সমাদর করিয়া থাকেন।

ভগবান্, গ্রহ, অদৃষ্ট ইহাদিগের কথা যতই বল জন্মদাতার দোষ স্খলন কিছুতেই হয় না—যাঁহারা সংসারমধ্যে পদেং ঐশীশক্তির কার্য্য দেখিতে পান তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে স্ত্রীপুরুষ আত্মসম্বরণ করিলে বংশ বৃদ্ধি জনিত যন্ত্রণার লাঘব হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন যে আত্মসম্বরণও ঈশ্বরাধীন সুতরাং মনুষ্যের চেষ্টাতে কিছুই হয় না। কিন্তু এদেশের কেহ কখন কি বংশবৃদ্ধি নিবারণের চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন? যাঁহারা জানেন না তাঁহাদিগকে বলা আবশ্যক যে ইউরোপের কোনং স্থানে অতি হীন শ্রেণিস্থ ব্যক্তিরাও পুত্রোৎপাদনের পূর্ব্বে আপনাদিগের সংস্থানের প্রতি বিশিষ্টরূপে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। অনেকে তিনটী সন্তান হইলে আর স্ত্রী সহবাস করে না। যাহারা তিনটীকেও ভরণপোষণ করিতে না পারে তাহাদের বিবাহই হয় না।

লোকের মুখে সর্ব্বদাই শুনা যায় যে বংশরক্ষা না হইলে নাম লোপ হইবে। আমরা অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি নাম

লোপের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। আমি হরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—আমার বংশ না থাকিলে কি আর কোন হরিশ, চাঁদার স্কন্ধে করিয়া বেড়াইবেন? নাহরিশের নাম করিয়া আর কেহ কি পিণ্ডং গয়াং গচ্ছ, বলিবে না? পৃথিবীতে অনেক হরিশ হইয়াছে আবার হবে। তাহাদের ঢেরং বংশ। হরিশের নাম করিয়া অনেকেই পিণ্ড দিবে; তবে আমি হরিশ হতভাগ্য পিণ্ড খাইতে পারিব না এই বড় দুঃখ।

কিন্তু পিণ্ডের কথা ত কেহই বলে না —নাম লোপ হইবে এই আশঙ্কাই প্রবল। সন্তান থাকিলে নাম রক্ষা হইবে। সে কেমন? অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র পর্য্যন্ত,বেটারা কালে ভদ্রে কোন একটা বুড়োর সম্মুখে পড়িয়া জিজ্ঞাসিত হইলে একবারং আমার নাম করিবে। হয় ত হরিশ বলিতে গবেশ বলিয়া বসিবে আর শ্রাদ্ধের সময়ে "যথা নাম" বলিয়া সারিবে কিন্তু তাহার পরে আর কোন্— আমার নাম করিবে? অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের পিতাকে কি বলিয়া পরিচয় দিতে হয় তাহা যখন জানি না তখন আরঅতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রের পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক কি। যাহা হউক মনে করিলাম যে ৫ পুরুষে ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত কেহ না কেহ একবারং নাম উচ্চারণ করিবে। আর চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত আর একটী সুখভোগ করিতে হইবেক।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ব্যাস বাল্মীকির নাম কে কতবার করিয়া থাকে?.তা এই সকল সুখের জন্য কি কতকগুলি কাঙ্গালি রাখিয়া যাইতে হইবেক?

বংশ রক্ষার নিমিত্ত অনেকগুলি উপায় হইয়াছে। এক, শাস্ত্রের বচন "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" ইত্যাদি। দুই, কন্যার বিবাহ না দিলে নয়। শুদ্ধ তাই নয় বিবাহের পূর্ব্বে যদি কন্যা রজস্বলা হয়, তবে পিতা মাসেং তাহার ভ্রূণহত্যা পাতকে পতিত হবেন। (৪) রজস্বলা নারীর গর্ভাধানের কোন প্রকার বিঘ্ন না হয় তদুপলক্ষে ভূরিং নিয়ম হইয়াছে। ইহাতেও পিতৃপুরুষ মহাশয়দিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। কিজানি যদি পুত্রই বা বৈরাগ্য অবলম্বন করে এই জন্য তাহার বিবাহের ভারও পিতৃহস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। আরও আছে। (৬) অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতা নাই, ভাগ্যক্রমে যদি বা ঘরের লক্ষ্মী বড় একটি আশীর্ব্বাদ করেন না, সন্তানের জ্বালা সহিতে হয় না, কিন্তু মাঠাকুরুণ বড়ই উৎকণ্ঠিত, পুনরায় বিবাহ না করিলে নয়। তিনিও শাস্ত্রের দোহাই দেন। শাস্ত্রের কথা শুনিলে, যতদিন পুত্রের মুখ না দেখিব, ততদিন যত খুসী বিবাহ করিতে পারি; এমন মজার শাস্ত্র কি আর কখন জন্মিবে?

সম্প্রতি একটি কণ্টক উপস্থিত হইতেছে। এখন "পাসওয়ালা" পাত্র না হইলে কন্যার বিবাহ দেওয়া ভার। আর পাসের মূল্য দেওয়াও কঠিন সুতরাং অনেক স্থলে কন্যাকাল থাকিতেং বিবাহ দেওয়া ঘটে না; যদি এইরূপ আর কিছু-

দিন চলে, তবে হয় ত ক্রমশঃ অবিবাহিত কন্যার বয়স আরো বৃদ্ধি হইয়া উঠিবে এবং পরিশেষে বংশবৃদ্ধির কিছু২ ব্যাঘাত ঘটিবে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মুন্সী প্যারীলাল আর হিন্দুপেট্রিয়ট তাহার প্রতিকার চেষ্টায় বিলক্ষণ যত্নবান্ হইয়াছেন। তবে আর বংশবৃদ্ধির ভাবনা কি ?

নব্যসম্প্রদায় আবার একটি নূতন ধুয়া ধরিয়াছেন। টেকচাঁদ ঠাকুরের উৎপাতে পুতুলখেলার মত বিয়ে আর কেহ মুখে আনিতে পারেন না কিন্তু চিরকালের অভ্যাস কোথায় যাইবে? এখনকার কথা এই যে, অল্প বয়সে বিবাহ না দিলে পুত্রগণ দুশ্চরিত্র হইয়া উঠে। বহুকাল পূর্ব্বে পুরুষেরা অনেকেই পরিবার বাটীতে রাখিয়া বিদেশে অর্থোপার্জ্জন করিতে যাইতেন সুতরাং অনেকস্থলে বয়ঃক্রম অধিক না হইলে, সন্তান হইত না। পিতা মাতার শরীর পরিপুষ্ট হইয়া সন্তান হইলে পুত্র সবল হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? তবে তৎকালে বিদেশবাসী পুরুষদিগের চরিত্রের দোষ ছিল। ইহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত সুশিক্ষিত যুবকগণ আপনাদিগের চাকুরির স্থানে পরিবার লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। এবং জিতেন্দ্রিয়তাব একশেষ করিয়া ফেলিলেন। তদবধি বংশবৃদ্ধির অনেক সদুপায় হইয়াছে কেবল দুর্ভাগ্য বশতঃ সন্তানগুলি কিছু রুগ্ন হইয়া থাকে এবং গৃহস্থের প্রথম সন্তান প্রায়ই বিনষ্ট হয়। বাবুরা আপনাদিগের কীর্ত্তিধ্বজা অনেক উচ্চে তুলিয়াছেন এখন পঞ্চদশ বর্ষীয় বালকের ধর্ম্মরক্ষা হওয়া ভার। এঁরাও বাপের বেটা, বেয়াল্লিশকর্ম্মা। পূর্ব্বে বাবা বলেছেন "বাবা বিয়ে দিয়েছেন আমার কি ?" এখন ছেলে বলেন বাবা কেন আঠার বছর বয়সে আমার জন্য দিয়াছিলেন? ছেলের বাবা ভেবে২ সারা হলেম; তাঁর বাবা বিয়ে দিয়েই যত সর্ব্বনাশ করেছেন। তা চুলোয় যাক, এখমকার উপায় কি ?—কাজেই ছেলেটীর বিবাহ দিতে হয়েছে। খুব বাহাদুর! এগ্‌জামিনের সময়ে মালসথের পেপরে ৯৯ মার্ক পেয়েছিলেন; এখানেও তার ফল হাতে হাতে!

মনুষ্য ও বাহ্য জগৎ।*

মনুষ্য সভ্যতাসোপানে আরোহণ করিয়া বাহ্য জগতের প্রভু হইয়া বসিয়াছেন। এখন তিনি অগ্নিকে পূজা করা দূরে থাক, তাহাকে পাচক ও পরিচারক করিয়া তুলিয়াছেন; তাহাকে দিয়া ভক্ষ্য প্রস্তুত করান, প্রয়োজন মত আলোক

* Buckles' works, Mahaffy's Lectures on Primitive civilizations, Smith's History of Greece &c.

জ্বালান, কল ঘুরান, এমন কি গাড়ী ও নৌকা পর্য্যন্ত টানান। তাঁহার কৌশলে বায়ুও বশীভূত হইয়াছে। বায়ু এখন পেষণ যন্ত্র (১), জলযান ও ব্যোমযান চালাইতে নিযুক্ত। এদিকে দিবাকর চিত্রকরের কার্য্য পাইয়াছেন (২), এবং ইন্দ্রের প্রিয় বিদ্যুৎ মানব সন্তানের আদেশে দেশে দেশে সংবাদ বহিয়া বেড়াইতেছেন (৩)। বৃষ্টি সময়ে হউক বা না হউক, খাল ও কূপ খনন করিয়া ক্ষেত্রে সলিলসিঞ্চনের উপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক মনুষ্য আবশ্যক শস্যোৎপাদনের ব্যবস্থা করিতেছেন। কোথায় তিনি পর্ব্বত কাটিয়া পথ করিতেছেন, (৪) কোথাও সমুদ্র তাড়াইয়া বাসস্থান করিতেছেন, (৫) কোথাও শুষ্কস্থলে সাগর করিতেছেন (৬), কোথাও জলের নীচে রাস্তা করিতেছেন। (৭) উত্তাল-তরঙ্গ-মালা-সম্বলিত ভীষণ সিন্ধু সভ্য নরজাতির যাতায়াতের বর্ম্ম হইয়াছে। কি সূর্য্যসন্তপ্ত উষ্ণমণ্ডল, কি তুষারাবৃত হিমমণ্ডল, সর্ব্বত্রই বাসগৃহ, পরিধেয়, আহার সামগ্রী, ও বাতাতপ নিয়মিত করিয়া মনুষ্য সুখসচ্ছন্দে বাস করিতে সক্ষম হইতেছেন। তাঁহার প্রতাপে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে; এবং যে সকল বিস্তীর্ণ ঘন বিজন কানন ভূমিতে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিত, সে সকলও বিলুপ্ত হইতেছে। অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, গো, মহিষ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পশু সকল মানবের দাস হইয়াছে; এবং যে সকল পক্ষী কোনরূপে কার্য্যোপযোগী বলিয়া বোধ হইয়াছে, সে সকলও অনেক পরিমাণে মানুষের কর্তৃত্বাধীনে আসিয়াছে।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের প্রভুত্ব বাড়িয়াছে। মানবগণ যত প্রকৃতির নিয়ম অবগত হইতে পারিয়াছেন ততই বাহ্য পদার্থ সকল ইচ্ছার বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া জগতের সহিত মনুষ্যের যুদ্ধ চলিতেছে; আরও বহুকাল চলিবে; কিন্তু ক্রমে মনুষ্যের জয়লাভ ও অধিকার-বৃদ্ধি হইলেও বাহ্য জগৎ মানবজীবনের ঘটনাস্রোত বহুপরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই। মানবেতিহাসে বহির্জ্জগতের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আমরা কয়েকটী কথা বলিব।

ভূমণ্ডলের পুরাবৃত্ত ও বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে, যে দেশ বিশেষের অবস্থান, তথাকার শীতোষ্ণতা, ভূমির উর্ব্বরতা ও সাধারণ খাদ্যের সহিত অধিবাসীদিগের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এ বাহ্য কারণগুলিও পরস্পর নিরপেক্ষ নহে। কোন দেশে যে প্রকার খাদ্য জন্মে, তাহা সেখানকার ভূমি ও শীতো-

(১) Wind Mill
(২) Photograph.
(৩) Electric Telegraph.
(৪) Mont Cenis Tunnel
(৫) Holland
(৬) Suez Canal
(৭) Thames Tunnel and projected Gibraltar and Dover Tunnels.

ষ্ণতা সাপেক্ষ। শীতোষ্ণতাও দেশের অবস্থান সাপেক্ষ। আমরা প্রথমে শীতোষ্ণতার কার্য্য প্রদর্শন করিব।

শীতে পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হয়; গ্রীষ্মে পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা হয় না। ইহার কারণ আছে। শারীরিক কার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নিমিত্ত মনুষ্যশরীরে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তাপ থাকা আবশ্যক। কিন্তু চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর তাপদ্বারা দৈহিক তাপের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ক্রমাগত শীতল বায়ু সংস্পর্শে শরীরের তাপ কমিয়া যায়, এবং ক্রমাগত উষ্ণ বায়ু সংস্পর্শে শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়।(৮) এই জন্য শীতপ্রধান প্রদেশে লোকে শরীরের নিয়মিত তাপ রক্ষা করিবার নিমিত্ত পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়, কারণ যে কোন প্রকার শরীরসঞ্চালন দ্বারাই দেহাভ্যন্তরে তাপ উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্তই গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশে পরিশ্রম করা কষ্টকর বোধ হয়। সুতরাং শীতোষ্ণতার তারতম্যানুসারে নিতান্ত সামান্য ফল ফলিতেছে না। শীতে মনুষ্যকে পরিশ্রমপ্রিয় করে; গ্রীষ্মে মনুষ্যকে অলস করে। শীতে মনুষ্যকে ক্রমাগত কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি দেয়, গ্রীষ্মে মনুষ্যকে বিশ্রাম অন্বেষণ করিতে শিখায়। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত কর, ইতিহাস পাঠ কর, এই কথার সত্যতা পদে পদে প্রতিপন্ন হইবে। ইউরোপখণ্ডের সহিত এসিয়া ও আফ্রিকার উষ্ণপ্রদেশ সকলের তুলনা কর। ইউরোপ পরিশ্রমের আকর, আফ্রিকা ও এসিয়া আলস্যের আবাসভূমি। লোকের পারলৌকিক বাঞ্ছাতেও বাহ্যজগতের ভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। আমাদিগের মোক্ষ নির্ব্বাণ বা লয়। ইউরোপের মোক্ষ অনন্ত উন্নতি।

অনেক সময় দেখা যায় যে, সমতল প্রদেশের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা পার্ব্বতীয় প্রদেশের লোক শক্ত ও পরিশ্রমপ্রিয়। ইহারও কারণ সহজে বুঝা যায়। সমতল প্রদেশাপেক্ষা পার্ব্বতীয় প্রদেশ সকল উচ্চ বলিয়া অপেক্ষাকৃত শীতল; সুতরাং তথাকার অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত পরিশ্রমপ্রিয় ও তন্নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত বলবান্ হইবার কথা। মিড্ (৯) ও পারসিকদিগের যদিও ভাষা ও ধর্ম্ম এক ছিল, তথাপি সমতলপ্রদেশবাসী মিডেরা পরিশেষে পার্ব্বতীয় প্রদেশবাসী পারসিকদিগের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু বিদেশের প্রতি লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন কি? বাঙ্গালির সহিত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ও মহারাষ্ট্রপ্রদেশের অধিবাসীদিগের তুলনা কর। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বাঙ্গালা অপেক্ষা অধিক শীত হয়, এখান অপেক্ষা তথায় অধিক কাল শীত থাকে। এখানকার লোক অপেক্ষা তাহারা শক্ত, সবল ও পরিশ্রমপ্রিয়। মহারাষ্ট্র পার্ব্বতীয় প্রদেশ, সে-

(৮) See Carpenter's Human Physiology, 6th Ed. p. 429.

(৯) Medes

খানকার অধিবাসীরাও অপেক্ষাকৃত সাহসী ও পরিশ্রমী।(১০)

এস্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। শরীরে অধিক উত্তাপ লাগিলে শারীরিক জলীয় পদার্থ কিয়ৎপরিমাণে বাস্পাকারে দেহ হইতে নির্গত হয় ও সেই সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণ তাপও বহির্গত হয়। যদি চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুতে অধিক জলীয় বাস্প থাকে, তাহা হইলে দেহ হইতে বাস্পনির্গমনের বাধা জন্মে, সুতরাং তাপ নির্গমনেরও প্রতিবন্ধকতা হয়।(১১) এই কারণে শুষ্ক ও উত্তপ্ত বায়ুমধ্যে যত তাপ সহ্য করা যায়, সজল ও উত্তপ্ত বায়ুমধ্যে তত তাপ সহ্য করা যায় না।(১২) এই নিমিত্ত দৃষ্ট হইবে যে সজল ও উত্তপ্ত বায়ু বিশিষ্ট দেশের অধিবাসীরা যেরূপ অলস ও বিশ্রামপ্রিয়, শুষ্ক ও উত্তপ্ত বায়ু বিশিষ্ট প্রদেশ বাসীরা সেরূপ নহে।

ভূমির উর্ব্বরতা অনেক পরিমাণে উত্তাপ ও জলের উপর নির্ভর করে। যে সকল দেশ উষ্ণ ও সলিলসিক্ত, সেই সকল দেশের ভূমিই সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা; যেখানে এই দুইটীর মধ্যে একটীর অভাব আছে, অথবা যেখানে এই দুইটীর প্রয়োজনানুরূপ মিলন সংঘটিত হয় নাই, সেখানকার ভূমি অনুর্ব্বরা। এই কারণেই সপ্তসিন্ধু, অনুগঙ্গ প্রদেশ, নীলনদের তীর, ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদী সন্নিহিত স্থান, উর্ব্বরতাজন্য প্রসিদ্ধ। এই কারণেই তুষারমণ্ডিত শৈলশৃঙ্গ ও হিম মণ্ডলের অন্তর্গত স্থান সকল উর্ব্বরতা বিষয়ে নিকৃষ্ট। এক্ষণে বিবেচনা কর, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীরা তাপবৃদ্ধিকারী দ্রব্য অধিক খাইতে ভাল বাসিবে না; সুতরাং মাংস অপেক্ষা ফল মূলই তাহাদিগের প্রধান খাদ্য হইবে। শীতপ্রধান দেশের লোকে তাপ বৃদ্ধিকারী তৈলাক্ত অর্থাৎ বসাযুক্ত মাংস আহার করিতে অনুরাগ প্রকাশ করিবে। যে সকল মাদক দ্রব্যে শরীর উষ্ণ করে, সে সকলও গ্রীষ্মপ্রধান দেশাপেক্ষা শীতপ্রধান দেশে প্রিয় পদার্থ হইবে। এতদ্দেশবাসীদিগের সহিত ইউরোপ খণ্ডের অধিবাসীদিগের তুলনা করিলেই, এসকল কথার সত্যতা প্রতীত হইবে। আবার মনে কর, যে উষ্ণদেশ সলিলসিক্ত সুতরাং উর্ব্বরা, সেখানে অল্প পরিশ্রমেই আবশ্যক আহার্য্য উদ্ভিদ্ সকল উৎপন্ন হইবে। এই কারণেও অল্প পরিশ্রমই লোকের অভ্যস্ত হইয়া যাইবে, ও তাহাদিগের আলস্য বৃদ্ধি হইবে। শীতপ্রধান প্রদেশে ভূমির গুণে ভক্ষণীয় উদ্ভিদ্ সকল যে কেবল অল্পপরিমাণে উৎপন্ন হইবে,

(১০) The inhabitants of the dry-countries in the north, which in winter are cold, are comparatively manly and active. The Mahrattas inhabiting a mountainous and unfertile region, are hardy and laborious" Elphinstone's History of India.

(১১) See Carpenter's Human Physiology, 6th Ed. p. 444.

(১২) Ibid p. 432.

এরূপ নহে; অধিবাসীরা মাংসপ্রিয় বলিয়া মৃগয়াপ্রিয় হইবে, সুতরাং অপেক্ষাকৃত সাহসী ও সবল হইবে। যদি কোন উষ্ণদেশ সলিলসিক্ত না হয়, সে দেশের ভূমি উর্ব্বরা হইবে না; সুতরাং তথাকার লোকের অধিক পরিশ্রম ও যত্নসহকারে ভূমিকর্ষণ করিতে হইবে এবং অল্পজন্মা দেশে লব্ধ খাদ্য অপরের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্যও অনেক প্রয়াস পাইতে হইবে। সুতরাং অধিবাসীরা শক্ত ও সবল হইবার কথা। ইহার দৃষ্টান্তস্থল আরব দেশ। আরব উষ্ণ দেশ বটে, কিন্তু সেখানে বড় জলকষ্ট। সেখানে বৃহৎ নদ, নদী, হ্রদ নাই। সুতরাং সেখানে উর্ব্বরা ভূমি প্রায় নাই। এজন্য ভক্ষ্য সংগ্রহ নিমিত্ত আরবদিগকে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হয়। এই কারণে তাহারা পরিশ্রমী, শক্ত ও সাহসী। আরবের বায়ু শুষ্ক; ইহা অন্য প্রকারেও অধিবাসীদিগের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। ইহাতে সজল বায়ুবিশিষ্ট উষ্ণ প্রদেশের ন্যায় আরবে শ্রমকাতরতা সমুৎপন্ন হইতে পারে নাই। স্থানমাহাত্ম্যে আরবের অধিবাসীরা এইরূপ শক্তিসম্পন্ন হওয়াতেই তাহারা এক সময়ে সিন্ধুনদ হইতে আট্‌লান্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত, ভারতমহাসাগর হইতে ফ্রান্সের দক্ষিণ ভাগপর্য্যন্ত, মুসলমান জয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। যেরূপ পার্ব্বত্য প্রদেশে কখন কখন বহুদিন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ জলরাশি সঞ্চিত হইয়া থাকে, পরে সামান্য কারণে কোন দিক্ ভাঙ্গিয়া প্রচণ্ডবেগে বহির্গত হয় ও অতি বিস্তীর্ণ ভূভাগ প্লাবিত করিয়া ফেলে, সেইরূপ বহুকাল পর্য্যন্ত আরবে যে মানবশক্তি ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়াছিল, মহম্মদের আদেশে সনাতন ধর্ম্ম প্রচারার্থে সেই শক্তি একবার স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া ভূমণ্ডল প্লাবিত করিতে সবেগে ছুটিয়াছিল। পারসিক সাম্রাজ্য ও পূর্ব্বরোমক সাম্রাজ্য তাহার প্রভাবে বিলুপ্ত হয়। এসিয়ার পশ্চিমভাগ, আফ্রিকার উত্তর খণ্ড, ইউরোপের স্পেন ও পর্ত্তুগাল, অল্পদিনেই আরবদিগের করতলস্থ হয়। কে বলিবে একবার জ্বলিয়া উঠিয়াই আরবের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে? এক্ষণে অগ্নিশিখা বা ধূম দৃষ্ট হইতেছে না, সত্য; কিন্তু আগ্নেয়গিরি বহুকাল নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও কখন কখন আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে সকল গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সলিলসিক্ত, সেখানকার ভূমি উর্ব্বরা, যথা নীলনদের উপত্যকা, ইউফ্রেটীস্ ও টাইগ্রিস্ নদীর তীরবর্ত্তী ভূমি, অনুগঙ্গ প্রদেশ, সপ্তসিন্ধু ইত্যাদি। আফ্রিকার উত্তর পূর্ব্বাংশে মিসরদেশ দিয়া নীলনদ প্রবাহিত, নদের উভয়তীরেই কিয়দ্দূরে পর্ব্বতশ্রেণী, মধ্যে কয়েক ক্রোশ বিস্তৃত উপত্যকা। পর্ব্বতশ্রেণীদ্বয় অতিক্রম করিলেই বিস্তীর্ণ মরুভূমি ও বালুকারাশি দৃষ্ট হইবে। মিসরে প্রায় বৃষ্টি হয় না। কেবল বর্ষাকালে

নীল নদের জল বৃদ্ধি পাইয়া উপত্যকা প্রদেশ প্লাবিত করে, তাহাতেই ভূমির উর্ব্বরতা রক্ষা পায়। আষাঢ়মাস হইতে জল বাড়িতে আরম্ভ হয়, শতদিন বৃদ্ধির সময়, এই সময়ে প্রায় ১৩। ১৪ হাত জল বাড়ে। অনন্তর জল কমিতে থাকে, এবং প্রায় চারিমাসে নদের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি ঘটে। বর্ষার জল হইতে যে পলল পড়ে, তাহাতেই প্লাবিত ভূমি উর্ব্বরা হয়; এবং জল সরিতে সরিতেই মিসরবাসীরা ক্ষেত্রে বীজ বপন করে। নীলনদ মিসরের দক্ষিণ প্রান্তে প্রবেশ করিয়া উত্তর সীমাপর্য্যন্ত যাইয়া ভূমধ্যসাগরে পড়িয়াছে। সুতরাং নীলনদের উপত্যকা সঙ্কীর্ণ হইলেও অতিদীর্ঘ ও অবিচ্ছিন্ন। জলপথে সর্ব্বত্রই যাতায়াতের সুবিধা। বৎসরের মধ্যে আটমাস উত্তর দিক্ হইতে বাতাস বহিতে থাকে, ইহাতে পালভরে স্রোতের প্রতিকূলে অনায়াসে নৌকাযোগে দক্ষিণাভিমুখে যাওয়া যায়। স্রোতের সাহায্যে দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে গমন করাও সহজ। জল বায়ু সর্ব্বত্রই সমান। ভূমিকম্প প্রভৃতি ভয়ঙ্কর নৈসর্গিক ঘটনার উৎপাতও প্রায় নাই, পীরামিড প্রভৃতির রক্ষাই ইহার সামান্য প্রমাণ নহে। নদের জলপ্লাবনের গুণে উপত্যকা প্রদেশে বন্য জন্তুর দৌরাত্ম্য নাই। মিসরের পশ্চিমে বৃহৎ মরুভূমি, পূর্ব্বে লোহিতসাগর, উত্তরে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে আফ্রিকার অসভ্য জনপদসকল। সুতরাং বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয় মিসরবাসীদিগের অধিক ছিল না। এক্ষণে বিবেচনা কর, এই সকল কারণে প্রাচীনকালে দেশের কিরূপ অবস্থা হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্ষান্তে কৃষিকার্য্য করিবার যেরূপ সুবিধা হইত, তাহাতে সাধারণতঃ লোকে কৃষিজীবী হইবার কথা। দ্বিতীয়তঃ জলপ্লাবনে ক্ষেত্র সকল যেরূপ একাকার হইয়া যাইত, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভূমি নির্ণয় নিমিত্ত ভূমিপরিমাণ করিতে জানা আবশ্যক হইত। তৃতীয়তঃ কোন্ সময়ে নীলনদের জল বাড়িতে ও কোন্ সময়ে কমিতে আরম্ভ হয়, ইহা স্থির করিবার নিমিত্ত নক্ষত্রপুঞ্জ সকলের আবির্ভাব, তিরোভাব বা অবস্থান নিরূপণ করিবার প্রয়োজন হইত। এই সকল কারণে অতি প্রাচীনকালে মিসরে কৃষিবিদ্যা, ক্ষেত্রতত্ত্ব ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার চর্চ্চারম্ভ হইয়াছিল, এবং দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

আবার ভাবিয়া দেখ, সমুদায় দেশটী একই উপত্যকা; মধ্যে কোন মরুভূমি, পর্ব্বত বা নদী থাকিয়া দেশটীকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে নাই; সর্ব্বত্র গমনাগমনেরও সুবিধা ছিল। সুতরাং সমুদায় দেশটী একই রাজ্য হইবার সম্ভাবনা। বাস্তবিক অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহাই ঘটিয়াছিল। পলল পড়িয়া ভূমি যেপ্রকার উর্ব্বরা হইয়াছিল, তাহাতে অল্প পরিশ্রমে অনেক শস্য উৎপন্ন হইত। একারণে

অনেক লোকে আহারান্বেষণ কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া চিন্তা করিবার অবসর পাইয়াছিল। ইহা হইতেই মিসরের পুরাতন সভ্যতার উৎপত্তি; ইহা হইতেই খ্রীষ্ট জন্মের তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিসরের মহিমা প্রকাশ। আর দেশের চতুর্দ্দিক্ যে ভাবে রক্ষিত ছিল, তাহাতে বহুকাল পর্য্যন্ত বহিঃশত্রুর আক্রমণদ্বারা আভ্যন্তরিক উন্নতির ব্যাঘাত জন্মিতে পারে নাই; বিশেষতঃ উপত্যকার সমুদায় অধিবাসিগণ একই রাজার অধীন থাকাতে সহসা মিসর আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করাও সহজ ব্যাপার ছিল না। একস্থল হইতে অন্যস্থলে সর্ব্বদা যাতায়াতের সুবিধা থাকাতে সর্ব্বত্রই লোকের শিক্ষা প্রায় একরূপই ছিল। ইহা দেখিয়া প্রাচীন গ্রীকেরা চমৎকৃত হইয়াছিলেন। গ্রীসে আথেন্স, স্পার্টা, আর্কেডিয়া, বিওসিয়া, থেসালী, ইপাইরস্ প্রভৃতি স্থান সকলের সভ্যতার তারতম্য ছিল; কিন্তু এসকল স্থান পরস্পর যত দূরবর্ত্তী, তদপেক্ষা অধিকতর দূরবর্ত্তী প্রদেশের মিসর বাসীদিগের মধ্যে সভ্যতাসম্বন্ধে কোন বিভেদ দৃষ্ট হইত না। নীল নদের উপত্যকা যেরূপ শস্যশালিনী ছিল, তাহাতে প্রয়োজনীয় বস্তু জন্য মিসরবাসীদিগের অন্যদেশের অপেক্ষা রাখিতে হইত না। এজন্য তাহারা বহির্বাণিজ্য করিতে বা বিদেশে যাইতে ভাল বাসিত না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীরা উদ্ভিদ্‌ভোজী হয়। মিসর এ বিষয়ের একটী প্রমাণ। কিন্তু মিসরের ন্যায় যেখানে অল্প পরিশ্রমে অনেক শস্য উৎপন্ন হয়, সেখানে আর একটি ফল ফলে। একে ত গ্রীষ্ম বলিয়া বস্ত্রের জন্য লোকের বিশেষ ভাবনা করিতে হয় না, তাহাতে আবার খাদ্য অনায়াসে লভ্য হইলে শ্রমজীবী লোকে বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপাদন করিতে চিন্তিত হয় না। এইরূপে শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। কিন্তু শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা বাড়িলে তাহাদিগের বেতনের হার কমে; সুতরাং তাহারা অনেক ধন উপার্জ্জন করিতে পারে না, কোনরূপে মাত্র জীবন ধারণ করিতে পারে। এদিকে বহুসংখ্যক লোকের শ্রম আয়ত্ত করিতে পারিয়া ধনীদিগের বিলক্ষণ লাভ হয়। এইরূপে একদিকে যেমন শ্রমজীবীরা নিঃস্ব হইতে থাকে, তেমনই অপরদিকে কতকগুলি লোকের অধিক পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত হইতে থাকে। অর্থবলে শেষোক্ত দলের অত্যন্ত ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়; দেশের শাসন ভার তাহাদিগের হাতে যাইয়া পড়ে; এবং তাহারা সমাজের মধ্যে উচ্চশ্রেণী বা প্রধান বর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। সভ্যতার ইতিহাস লেখক বাকল সাহেব বিবেচনা করেন যে, এইরূপেই ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং মিসরের যাজক ও সৈনিকসম্প্রদায়ের সৃষ্টি। যেখানে সাধারণ লোকে এপ্রকার নিঃস্ব ও ক্ষমতাহীন,

সেখানে শূদ্রদিগের ন্যায় তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার হইবে, এবং রাজা স্বেচ্ছাচারী বা উচ্চশ্রেণীর অনুগত হইবেন, আশ্চর্য্য নহে। ভারতবর্ষে ও মিসরে রাজা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিতেন, কেবল তাঁহার ব্রাহ্মণ বা যাজকদিগকে কিয়ৎপরিমাণে ভয় করিতে হইত।

নীলনদের উপত্যকা যেরূপ উর্ব্বরা, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ প্রায় সেইরূপ। মিসরের ন্যায় এখানেও বৃষ্টি অল্প হয়; কিন্তু জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়মাসে আর্ম্মাণদেশের পর্ব্বতে যে বৃষ্টি পতিত হয়, তাহাতে নদীদ্বয় পুরিয়া যায়, ও জলপ্লাবন উপস্থিত হয়। ইহাই তাহাদিগের তীরবর্ত্তী প্রদেশের উর্ব্বরতার কারণ। সামান্য শ্রমেই সেখানে যথেষ্ট শস্য জন্মে। এই নিমিত্তই অতি প্রাচীনকালে তত্রত্য ব্যাবিলন রাজ্য সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। নদীদ্বয় রাজ্যের পূর্ব্ব ও পশ্চিম পরিখা স্বরূপ ছিল; দক্ষিণে অনতিদূরেই সমুদ্র; উত্তরে পার্ব্বত্য আর্ম্মাণদেশ। সুতরাং দেশ রক্ষা কার্য্যও সহজে সম্পন্ন হইতে পারিত। ব্যাবিলনের সভ্যতার পরিচয় দিতে বর্ত্তমানকালে পীরামিড প্রভৃতির ন্যায় প্রকাণ্ড কোন মন্দির নাই; কিন্তু এক সময় সেখানে চারিশত হস্তাধিক উচ্চ একটি দেবমন্দির ছিল। ব্যাবিলনে প্রস্তর পাওয়া যাইত না, সুতরাং ইষ্টক নির্ম্মিত সৌধ সকল বিলুপ্ত হইয়াছে। নীলনদের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে যথেষ্ট প্রস্তর পাওয়া যাইত, সুতরাং তন্নির্ম্মিত মিসরের কীর্ত্তি এতকাল স্থায়ী রহিয়াছে। এক্ষণে মৃত্তিকাখনন করিয়া ব্যাবিলন রাজ্যের যে সকল স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্য কার্য্যের উদ্ধার হইতেছে, তদ্দ্বারা তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

আফ্রিকার উত্তরে মিসর ভিন্ন আর কোন স্থানে অধিক পরিমিত অবিচ্ছিন্ন উর্ব্বরা ভূমি নাই; এবং অতি প্রাচীন কালে মিসর ভিন্ন আর কোথাও স্বতঃ সভ্যতার উৎপত্তি হয় নাই। এসিয়াখণ্ডে ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ ব্যতিরিক্ত ভারতবর্ষে সিন্ধু ও গঙ্গার তীরে, তাতারে চক্ষুস নদকূলে, এবং চীনে ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহো সন্নিহিত প্রদেশে, বিস্তীর্ণ উর্ব্বরভূমি ছিল। সুতরাং পুরাকালে চক্ষুস নদকূলে আর্য্য সভ্যতার উদয়; এবং ভারতবর্ষে ও চীনেও বিলক্ষণ সামাজিক ও মানসিক উন্নতি হইয়াছিল। উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র ও একটি পর্ব্বতশ্রেণী, এবং পশ্চিমে সিন্ধুনদ ও একটি শৈলমালা; এই সকল কারণে অনেক দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের স্বতন্ত্রতা রক্ষিত হইয়া সভ্যতা বৃদ্ধির উপায় হইয়াছিল। আর এদেশে প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত এত অধিক জন্মিত, যে এখানকার অধিবাসীরা বিদেশের সহিত বিশেষ সংস্রব রাখিতে তত প্রয়াসী হন নাই। উত্তর দিক্ ব্যতিরিক্ত আর কোন দিক্ দিয়া চীন আক্রমণ করিবার

সুবিধা ছিল না। সেই দিকেই চীনেরা বৃহৎ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বহু-কালপর্য্যন্ত চীনে ও ভারতবর্ষে রীতিনীতি অধিক পরিবর্ত্তিত হয় নাই দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হন। কিন্তু তাঁহাদিগের বুঝা আবশ্যক যে কোন একটি অনুষ্ঠান বহুবিস্তীর্ণ-স্থানব্যাপী হইলে বহুকালস্থায়ী হয়; এবং চীন ও ভারতবর্ষ উভয়ই বৃহৎ দেশ, বিশেষতঃ উভয় দেশের অধিবাসীরাই স্বদেশে ভোগ্যবস্তু পর্য্যাপ্তপরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া বিদেশের সহিত অধিক সংস্রব রাখেন নাই; সুতরাং অপর দিক্ হইতে কোন পরিবর্ত্তন স্রোত আসিয়া তাঁহাদিগকে একবারে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই।

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব উপকূলে ফিনিসিয়া দেশ অবস্থিত। উহার বিস্তৃতি ও দৈর্ঘ্য উভয়ই অল্প। এক পার্শ্বে উচ্চ লিবেনন পর্ব্বত, অপর পার্শ্বে সমুদ্র। সমুদ্রে অনেক মৎস্য পাওয়া যায়, লিবেনন পর্ব্বতে বড় বড় বৃক্ষ জন্মে। সুতরাং মৎস্য ধরিবার জন্য নৌকা নির্ম্মাণ করিতে অধিবাসীদিগের সহজেই প্রবৃত্তি হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। নৌকায় ভ্রমণ করিতে করিতে বাত্যাবশে সাইপ্রসদ্বীপ ও নীলনদের মুখ পর্য্যন্ত তাহারা কখন কখন উপস্থিত হইবে বিচিত্র নহে। এই রূপে ক্রমে সমুদ্রপথে যাতায়াত করিতে তাহাদিগের সাহস বৃদ্ধি হইবে, এবং তাহারা সাইপ্রসদ্বীপ হইতে তাম্র ও মিসর হইতে শস্যাদির বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিবে, ইহাও অস্বাভাবিক নহে। লিবেনন পর্ব্বতেও অনেক বহুমূল্য ধাতু পাওয়া যাইত, ইহাতেও তাহাদিগের বাণিজ্য বৃদ্ধি হইবার সুবিধা হইয়াছিল, বোধ হয়। ব্যাবিলন ও মিসর প্রাচীনকালে যে রূপ সভ্য হইয়াছিল, এক রাজ্যের উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত অপর রাজ্যে লইয়া গেলে বিলক্ষণ ব্যবসায় চলিবার কথা। অবস্থানগুণে ফিনিসিয়ার অধিবাসীরা এই ব্যবসায়েও প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছিল। ক্রমে ফিনিসিয়ার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয়। কোন কোন স্থানে কোন ধাতু বা বণিজ্ দ্রব্যবিশেষ সংগ্রহ নিমিত্তও তাহাদিগের তথায় থাকিবার প্রয়োজন হয়। ক্রমশঃ তাহারা সাইপ্রস, ক্রিট, গ্রীস, আফ্রিকা, ও স্পেন, প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ সন্নিবেশিত করে। বাণিজ্য ব্যবসায়ের হিসাব রাখিবার কোনরূপ সহজ চিহ্ন ব্যবহার করা তাহাদিগের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। মিসরে চিত্রসদৃশ (১৩) একপ্রকার অক্ষর প্রচলিত ছিল, ব্যাবিলনে শরমুখসদৃশ (১৪) আর এক প্রকার বর্ণমালা ছিল। ফিনিসিয়াবাসীরা সংক্ষেপে হিসাব রাখিবার নিমিত্ত আরও সরল বর্ণমালা সৃষ্টি করিলেন। গ্রীক্ ও য়ীহুদিরা ফিনিসিয়া হইতেই অক্ষর প্রাপ্ত হন, এবং বর্ত্তমান ইউরো-

(১৩) Hieroglyphics
(১৪) Cuniform writings

পীয় সভ্যজাতি ও তাহাদিগের সন্তান সন্ততিগণ ও মুসলমান ও যীহুদীরা অদ্যাপি পরিবর্ত্তিত ফিনিসিয়ার বর্ণমালাই ব্যবহার করিতেছেন। ফিনিসিয়াবাসীরা যে সকল উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তন্মধ্যে কার্থেজই উত্তরকালে বিশেষ বিখ্যাত হয়।

এসিয়াখণ্ড হইতে এক্ষণে ইউরোপের অভিমুখে চল। ইউরোপীয় সভ্যতার মূল গ্রীসদেশ। গ্রীস হইতেই ইউরোপের অন্যান্য জাতি দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ও সাহিত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহাকাব্যে হোমর তাঁহাদিগের আদর্শ, গীতিকাব্যে পিণ্ডার, নাটকে সফক্লিস ও ইস্কিলস। হেরোডোটস ইতিহাস রচনার পথদর্শক। সক্রেটিস ও প্লেটো দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষক। আরিষ্টটল বৈজ্ঞানিক প্রণালী সংস্থাপক। ইউক্লিড জ্যামিতির, আর্কিমিডিস পদার্থবিদ্যার, হিপার্কস ও টলেমি জ্যোতিষের, এবং হিপক্রেটিস ভৈষজবিদ্যার, দীক্ষাগুরু। ফিডিয়াস স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য কার্য্যের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ, এবং এপিলিস চিত্রকর দলের উন্নতিপথ প্রদর্শক। এক্ষণে দেখা যাউক বাহ্যজগতের প্রভাবে গ্রীসে কিরূপ ফল ফলিয়াছে।

গ্রীসের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি কর। দেখিবে গ্রীস ও এসিয়া মাইনরের মধ্যবর্ত্তী সাগরে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। দ্বীপগুলি পরস্পর এত নিকটবর্ত্তী যে সমুদ্রপথে একটি দেখিতে দেখিতে প্রায় আর একটিতে উপস্থিত হওয়া যায়। গ্রীসের নিকট হইতে দ্বীপাবলীর আরম্ভ; এবং সাগর মধ্যে যেখানে চাহিবে, সেখানে হইতেই কোন শৈল বা দ্বীপ দেখিতে পাইবে; এবং এক বন্দর হইতে অল্পদূরে অন্য বন্দর লক্ষিত হইবে। এরূপ অবস্থায় গ্রীসের অধিবাসীরা যে সমুদ্রপথে ভ্রমণ করিয়া বাণিজ্য অবলম্বন করিতে ভাল বাসিবে, এবং বাসযোগ্য দ্বীপগুলি ও এসিয়া মাইনর তাহাদিগের কর্ত্তৃক উপনিবেশিত হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল। এস্থলে অর্ণবযানে পর্য্যটন করিবার আর একটি সুবিধা ছিল। হেলেস্পণ্ট হইতে ক্রিট দ্বীপ পর্য্যন্ত নিয়মিত বাণিজ্যবায়ু বহিত।

গ্রীসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি পর্ব্বত আছে। তাহাদিগের দ্বারা অল্পস্থল মধ্যেই অনেক প্রকার জল বায়ু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। আথেন্সে অনেক যত্ন না করিলে দক্ষিণ প্রদেশের সুখাদ্য ফল সকল জন্মে না। কয়েক ক্রোশ দক্ষিণ দিকে চল। আর্গোলিসের উপকূলে কমলা ও কলম্ব লেবুর বিচিত্র উদ্যান দৃষ্ট হইবে। সেস্থলহইতে কয়েক ঘণ্টা মধ্যে এমন স্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, যেখানে দ্রাক্ষালতাও বাঁচে না। এদিকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মেসিনি প্রদেশে খর্জ্জুর পর্য্যন্ত পাকিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিকটে নিকটে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপন্ন হওয়ায়, পরস্পর

বাণিজ্য করিবার ইচ্ছা প্রবল হইবার কথা। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত মধ্যে থাকায়, একস্থান হইতে অন্যস্থানে স্থল-পথে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর, কুত্র বা অসম্ভব। আটিকা ও বিওসিয়ার মধ্যে পর্ব্বত, এবং এতদুভয় থেসালী হইতে চারি পাঁচ হাজার হাত উচ্চ শৈলমালা দ্বারা বিভক্ত; উক্ত শৈলমালা-মধ্যে বিখ্যাত গিরিসংকট থর্ম্মাপলী। করিন্থ যোজক দিয়া দক্ষিণস্থ উপদ্বীপ যাইতেও পাহাড় বাধে; এবং উক্ত উপদ্বীপের মধ্য দিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত স্থল পথে যাওয়া অপেক্ষা জল পথে গমন অনেক সহজ। গ্রীসদেশের অঙ্গে সমুদ্র সর্ব্বত্র এরূপভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, সকল স্থান হইতেই উহা নিকটবর্ত্তী। এই প্রকার নানা কারণে, সাগরপর্য্যটন প্রবৃত্তি গ্রীকদিগের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ঈদৃশ অনুমান করা অন্যায় নহে। উত্তরকালে গ্রীকদিগের যেরূপ বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং তাহারা ভূমধ্যসাগরের চতুঃপার্শ্বে যাদৃশ উপনিবেশাবলী সংস্থাপন করিয়াছিল, তাহাদিগের দেশের অবস্থা হইতেই এই রূপে তাহার সূত্রপাত হয়।

গ্রীসের পূর্ব্বপার্শ্বে যেরূপ বন্দর ছিল, ও যেরূপ গমনাগমনের ও বাণিজ্য করিবার সুবিধা ছিল, পশ্চিমপার্শ্বে সেরূপ ছিল না। পশ্চিমপার্শ্বের উপকূল দুরারোহ ও তথাকার বায়ু অসুখকর। সুতরাং পশ্চিম পার্শ্ব রোম ও আথেন্স উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইলেও, তাহা পূর্ব্বপার্শ্বের ন্যায় সভ্য হইতে পারে নাই। আথেন্স যে আটিকা প্রদেশের রাজধানী, সে আটিকায় আবশ্যক শস্য জন্মিত না; সুতরাং আথেন্সবাসীরা খাদ্য সংগ্রহ-জন্য বাণিজ্য করিতে বাধ্য হইতেন। যে সকল স্থান স্পার্টার অধীন ছিল, সে খানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইত। এই কারণেই বোধ হয় আথেন্স-বাসীরা জলপথে যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, স্পার্টাবাসীরা সেরূপ পারেন নাই।

গ্রীসের কোথাও সমতল ক্ষেত্র, কোথাও উচ্চ শৈল; কোথাও নদীপ্রবাহিত, কোথাও জল পাওয়া দুষ্কর। আটিকা প্রদেশে উত্তম উত্তম বন্দর, পরিষ্কার বায়ু, কিন্তু শস্যের অভাব। বিওসিয়া প্রদেশে যথেষ্ট উর্ব্বরাভূমি, যথেষ্ট শস্য; কিন্তু মৃত্তিকা সলিলসিক্ত ও বায়ু কুজ্-ঝটিকাবিশিষ্ট। আরও পশ্চিমে চল। দেখিবে দেশ শৈলময়, অধিবাসীরা ছাগ, মেষ চরায় ও পর্ব্বতগহ্বরে বাস করে। দক্ষিণের উপদ্বীপে ও বিভিন্ন প্রদেশে এইরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হইবে। এই প্রকার প্রদেশভেদে অবস্থাভেদ ঘটায়, গ্রীসে অল্পস্থানে অধিক মনুষ্যচরিত্রের ভেদ ঘটিবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। বস্তুতঃ ধর্ম্ম, ভাষা, ও রীতিনীতির বহুপরিমাণ একতা সত্ত্বেও গ্রীক চরিত্রে যে বৈচিত্র দৃষ্ট হয় এইরূপ দৈশিক বৈচিত্রই বোধ হয় তাহার একটি প্রধান কারণ।

পর্ব্বত দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত বলিয়া গ্রীসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি স্বতন্ত্র রাজ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ইতিহাস লেখকেরা ইহার কয়েকটী ফল বর্ণনা করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ গ্রীস কখনই এক সাম্রাজ্য হইতে পারিল না, এবং এনিমিত্ত অগ্রে মাসিডনের ও পরে রোমের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক রাজ্য ক্ষুদ্র হওয়ায় অল্পদিনেই রাজারা সমুদায় প্রজামণ্ডলীর পরিচিত হইয়া পড়েন, এবং ইহাতে রাজাদিগের দেবত্বে বা অসাধারণ শক্তিতে লোকের বিশ্বাস তিরোহিত হয়। সুতরাং ক্রমে সর্ব্বত্র রাজপদ উঠিয়া যায়, এবং প্রদেশের অবস্থাভেদে সম্ভ্রান্ততন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী সংস্থাপিত হয়। তৃতীয়তঃ দেশ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত হওয়ায়, স্থানভেদে ভাষাভেদ সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপে আথেন্সে একপ্রকাব ভাষা, স্পার্টায় আর একপ্রকার, থিব্‌সে অপর আর এক প্রকার। আবার যে প্রদেশের ভাষায় যে বিষয় প্রথমে আলোচিত হইয়াছিল, ভিন্ন স্থানের লোকে লিখিলেও সেই প্রদেশের ভাষায় সেই বিষয়ের আলোচনা করাই রীতি ছিল। এইরূপে মহাকাব্য সকল দুর্ব্বোধ্য হইলেও হোমরের ভাষায় রচিত হইত। আথেন্সে যে সকল নাটক লিখিত বা অভিনীত হইত, তাহাদিগের অন্তর্গত গীতগুলি আথেন্সের পরমশত্রু স্পার্টার ভাষায় গ্রথিত হইত। এমন কি যখন স্পার্টাবাসীরা আটিকা প্রদেশ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিতেছিল, তখনও এরীতির ব্যত্যয় ঘটে নাই। আমাদিগের দেশের কবিরা যখন কৃষ্ণ বিষয়ক গীতরচনা করিতে গিয়া বিদ্যাপতির ভাষার অনুকরণ করেন, তখন তাঁহারা গ্রীকদিগের পথাবলম্বী হন।

যে সকল পর্ব্বত পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রধাবিত তাহারা যেরূপ অবস্থাভেদ উৎপন্ন করে, উত্তর দক্ষিণে ধাবিত পর্ব্বতগুলি সেরূপ নহে। হিমাচল তিব্বত হইতে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিতেছে। হিন্দুকুশ আফগানস্থান হইতে তুর্কিস্থান পৃথক্‌ করিতেছে। আল্পস্‌ পর্ব্বত ইতালীকে ইউরোপের অপরভাগ হইতে স্বতন্ত্র করিতেছে। পীরেনিস্‌ ফ্রান্স ও স্পেন দেশ বিভিন্ন রাখিতেছে। ইউরাল পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বে রূশিয়া। আপিনাইন পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বেই একই ইতালী রাজ্য। রকি ও আণ্ডিস পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় দেশভেদের হেতু হয় নাই। এইরূপ হইবার একটী কারণ বোধ হয় এই, যে পূর্ব্ব পশ্চিম প্রধাবিত পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা যে প্রকার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী দেশের শীতাতপভেদ ঘটে, উত্তর দক্ষিণ প্রধাবিত পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা সে প্রকার হয় না। যখন সমতল প্রদেশস্থ অধিবাসীরা বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠে, তখন অপেক্ষাকৃত শীতল পার্ব্বত্য প্রদেশবাসীদিগের নিম্নদেশ আক্রমণ দ্বারা জয়লাভ করিবার কথা কোন কোন স্থানে শুনা

যায়। কিন্তু আবার যখন কোন দেশে বিজেতৃদল প্রবেশ করে, তখন পরাজিত ব্যক্তিবর্গ পর্ব্বতপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর্য্যদিগের আক্রমণে এদেশে সাঁওতাল পাহাড়িয়া প্রভৃতি জাতির এইরূপ দশা হইয়াছে।

জঙ্গলে সভ্যতা বিস্তারের প্রতিবন্ধকতা করে। অরণ্য কাটিয়া কৃষিকার্য্যের অধিকার-বৃদ্ধি, সভ্যতা বিস্তৃতির একটি প্রধান লক্ষণ। ইউরোপখণ্ডে সর্ব্বত্রই পূর্ব্বে বন ছিল। কিন্তু বহুকাল হইল নৈসর্গিক কারণে বা মনুষ্যের প্রভাবে দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশের কানন সকল বিনষ্ট হয়; এবং সেই প্রদেশেই অগ্রে সভ্যতার উদয় হয়। গ্রীস, ইতালী, স্পেন, ফ্রান্স, ও ইংলণ্ড, ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। জঙ্গলের অধিবাসীরা প্রায়ই অসভ্য, এই কারণে জঙ্গলিয়া বলিতে অসভ্য বুঝায়। যখন কোন দেশ বিজিত ও উপনিবেশিত হয়, তখন পরাভূত জাতি অনেকস্থলে নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়া আপনাদিগের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে। এই নিমিত্ত কানন প্রদেশ অনেক সময়ে অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির বাসস্থল হয়। আমেরিকা ও সাইবিরিয়ায় দেখা যায় যে, যাহারা জঙ্গলে বসতি করে, তাহাদিগের প্রকৃতি কিয়ৎপরিমাণে জঙ্গলিয়া হইয়া যায়। কোন কোন বুদ্ধিমান্ লোকে বিবেচনা করেন যে, মর্ম্মণদিগের বহুবিবাহ আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের নিকট হইতে অনুকৃত।

যাহারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জঙ্গলে বাস করে, তাহারা দুর্ব্বল, ক্ষুদ্রকায়, কদাকার, ও নির্ব্বোধ হয়। হিমালয়ের দক্ষিণস্থ শালবনের মেচিরা, সিংহলের বৃহদরণ্যের বেদেগণ, মাডাগাস্কার দ্বীপের জোলাহিরা, ফ্লোরিডা উপদ্বীপের নিবিড় কাননের আমেরিকেরা ইহার প্রমাণ। যেস্থানে বহুদূরব্যাপী কানন থাকে, সে স্থানের ভূমি এত সলিলসিক্ত হয়, যে তাহা মনুষ্যের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হয়। ইহাই বোধ হয় জঙ্গলবাসীদিগের অবনতির কারণ।

বাহ্যজগতের অবস্থাভেদে মানবেতিহাসে কিরূপ ফলভেদ ঘটিয়াছে, আমরা দেখাইলাম। কিন্তু কেহই যেন মনে করেন না যে, কেবল দৈশিক সংস্থান দ্বারা, কেবল চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বহিঃপদার্থ দ্বারা ইতিহাসের ঘটনামালার ব্যাখ্যা করা যায়। প্রত্যেক জাতির অন্তর্হিত শক্তিও এস্থলে গণনীয়। নীলনদের তীরে কাফ্রিরা থাকিলে যে তাহারা প্রাচীন মিসরবাসীদিগের ন্যায় সভ্য হইতে পারিত, কে সাহস করিয়া বলিবে? আর্য্যেরা যদি ভারতবর্ষে না আসিতেন, তাহাহইলে কি এদেশে বাল্মীকি বা কালিদাসের ন্যায় কবি, গোতম বা কপিলের ন্যায় দার্শনিক, এবং আর্য্যভট্ট বা ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় গণিতবেত্তা জন্মিত? যদি বাহ্যবস্তু হইতেই সমুদয় হয়, তাহা হইলে মিসর, ব্যাবিলনিয়া ও গ্রীসের সভ্যতা অন্তর্হিত হইল কেন? দেশের

ভাব প্রায় একরূপই আছে, কিন্তু অধিবাসীদিগের ভাব অন্য প্রকার হইয়াছে কেন? আর্য্যজাতি ইউরোপখণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে তথায় অন্য জাতীয় লোকে বাস করিত; কিন্তু তাহাদিগের সভ্যতার চিহ্ন ভগ্নপ্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্র। যীহুদীরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করিতেছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহাদিগকে চিনা যায়। গ্রীনলণ্ডে যাও, আমেরিকায় যাও, আফ্রিকায় যাও, অস্ট্রেলিয়ায় যাও; ইংরেজ সর্ব্বত্রই সমান দেখিবে। চারি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিসরের অট্টালিকায় যে কাফ্রি চিত্রিত আছে, এখনও তাহার মূর্ত্তি বা অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। আবার দেখ যে বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন, ইতিহাস, ও সাহিত্যে আর্য্যজাতি যে প্রকার উন্নতি দেখাইয়াছেন, অন্য কোন জাতি সেরূপ পারে নাই। এবং সৈমজাতি হইতেই যীহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমান তিনটী একেশ্বরবাদী ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব স্বীকার করিতে হইতেছে যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ক্ষমতা; এবং যে কোন অবস্থায় যে জাতিকে রাখনা কেন, সহসা তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না।

কিরূপে নিগ্রো, মোগল, মালয়, আর্য্য, সৈম, প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট জাতির উৎপত্তি হইল, স্থির করিয়া বলা যায় না। পরিণামবাদী ওয়ালেস্ সাহেব বিবেচনা করেন যে আদৌ বাহ্যাবস্থার ভেদই এরূপ জাতিভেদ উৎপন্ন হইবার কারণ। যখন মনুষ্যেরা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে শিখে নাই, যখন তাহাদিগের কোনরূপ পরিধেয় ছিল না, যখন তাহারা অগ্নিকে আয়ত্ত করিয়া তদ্দ্বারা পাক করিতে বা নিয়মিত শারীরিক তাপ রক্ষা করিতে জানিত না, তখন তাহারা যে দেশে যাইত অন্যজীবের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সে দেশের স্বভাবানুবর্ত্তী হইত। সে দেশে শীত থাকিলে, সম্পূর্ণরূপে শীত সহ্য করিত। সে দেশ গ্রীষ্মপ্রধান হইলে আতপতাপে পুড়িত। সেখানে যেরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য মিলিত, তাহাই আহার করিত। এই রূপে তাহারা সম্পূর্ণরূপে বাসস্থলের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইত।

কিন্তু প্রাচীন কালে যাহা হইয়া থাকুক, সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে বাহ্য জগতের ক্ষমতা কমিয়া যাইতেছে এবং মনুষ্যের প্রভাব বাড়িতেছে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানকালে দেশের অবস্থা অপেক্ষা অধিবাসীদিগের জ্ঞানবৃদ্ধির উপর সভ্যতাবৃদ্ধির নির্ভর করিতেছে। যে জাতি যে পরিমাণে নৈসর্গিক নিয়ম অবগত হইতেছে ও তদনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে, সেই জাতি সেই পরিমাণে উন্নত হইতেছে। কালে বোধ হয় মনুষ্যের প্রভুত্ব এত বহুবিস্তীর্ণ হইবে, যে ভূমণ্ডলে মানবের অপ্রয়োজনীয় জীবোদ্ভিদ্ কিছুই থাকিবে না, এবং প্রাকৃতিক শক্তি পরম্পরা এত দূর মনুষ্যের আজ্ঞাধীন হইবে, যে তাহা কবিরাও কখন কল্পনা করিতে সাহস করেন নাই।

শৈশব সহচরী।

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিপদে আরম্ভ।

অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমাভ রৌদ্র, ভাগীরথীর তীরস্থিত বৃক্ষ সকলের অগ্রভাগ প্রদীপ্ত করিতেছিল; মন্দ মন্দ মারুতহিল্লোলে নদীর হৃদয় ঈষৎ চঞ্চল হইতেছিল; নদীর উভয় পার্শ্বে মনুষ্য বা মনুষ্যবসতির কোন চিহ্ন অথবা অন্য কোন শব্দ ছিল না, কেবল মাত্র সমীরণ সঞ্চালিত নদীতীরস্থ বৃহৎ বৃক্ষদিগের শন শন শব্দ, আর অনন্তপ্রবাহিণী ভাগীরথীর অনন্ত সাগর সম্ভাষণে গমনের কলকল রব শুনা যাইতেছিল। রজনীকান্তের ক্ষুদ্র জলযান, কোন বৃহৎ শ্বেতপক্ষীর ন্যায় শ্বেতপক্ষ বিস্তৃত করিয়া নাচিতে নাচিতে ভাগীরথীর বিশালবক্ষে বিচরণ করিতেছিল। জলোচ্ছ্বাসে যেমন ভাগীরথীর বারিরাশি উছলিতে ছিল, পিতৃ মাতৃ সম্ভাষণাকাঙ্ক্ষা সুখ রজনীকান্তের হৃদয়ে তেমত উছলিতে ছিল। অনেক দিবসের পর রজনী বাটী যাইতে ছিলেন; রজনী একাগ্রমনে তাঁহার জননীর মুখমণ্ডল ভাবিতেছিলেন। সেই স্নেহ, সেই যত্ন, সেই ব্যগ্রতা চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি বাটী পঁহুছিবামাত্র তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার জননী কি করিবেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। কখন কখন তাঁহার বয়স্যবর্গ, কখন বাল্যক্রীড়ার স্থান স্মরণ করিতেছিলেন; তাঁহাদিগের গ্রামপ্রান্তে সেই নিবিড় ঘনান্ধকার আম্র কানন, তন্মধ্যস্থিতপদ্মপুকুর নামে সরোবর, যাহাতে গ্রাম্যকুলকামিনীগণ অনুক্ষণ আগ্রীব নিমজ্জিতা হইয়া পদ্মবনে পদ্ম পুষ্পের সহিত মিশিয়া থাকে এবং যে পুকুরে সাঁতার দিতে দিতে একদিন আপনি ডুবিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতে ছিলেন। আবার কখন কখন মনে হইতে লাগিল, তাঁহার বিবাহ হইবে। কাহার সহিত বিবাহ হইবে—শিবনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃকন্যার সহিত?—কুমুদিনী? সে ত বাল্যকালে বিধবা হইয়াছে এবং তাহার পুনরায় বিবাহ দিতে না পারায় কুমুদিনীর পিতা হরিনাথ উদাসীন হইয়াছেন। সুবর্ণপুরে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করে কাহার সাধ্য? ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমুদিনীর কি কনিষ্ঠা ভগিনী আছে? বোধ হয় আছে। নহিলে কাহার সঙ্গে বিবাহ স্থির হইতেছে; ভাবিতে ভাবিতে অনন্যমনে নদীর পূর্ব্বতীর দৃষ্টি করিতেছিলেন; হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। অতিদূরে বনমধ্যে নদীকূলোপরি রাজহংসের ন্যায় একটি ধবল পদার্থ

দেখিয়া জানিলেন যে, নিজ গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, কেন না ঐ রাজহংসের ন্যায় ধবল পদার্থ তাঁহার গ্রামের একটি ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাট মাত্র; এবং উহা বসুন্ধরার ঘাট বলিয়া খ্যাত। রজনী অধীর হইয়া দাঁড়িদিগের জোরে দাঁড় টানিতে উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। ভাগীরথীর জলোচ্ছ্বাসে এবং বিস্তৃত পালসংযোগে নৌকা তর তর বেগে ছুটিতেছিল, হঠাৎ মাঝিরা পাল নামাইল। রজনী কারণ জিজ্ঞাসায় বলিল, পশ্চিমে বড় মেঘ উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে মেঘ সমুদায় গগনে ব্যাপ্ত হইয়া দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল অল্পকাল মধ্যেই ঘোররবে প্রবল ঝটিকা উঠিল। ভাগীরথীর প্রশান্ত হৃদয় দুরন্ত হইয়া উঠিল, রজনীকান্তের নৌকায় বিষম কোলাহল উঠিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে নৌকা জলমগ্ন হইল। রজনী সাঁতার জানিতেন দুরন্ত বেগবান্ তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কিছু দূর আসিলেন। ক্রমে তাঁহার হস্ত পদাদি শিথিল হইয়া আসিল, তথাচ কূল অতি নিকটে বিবেচনা করিয়া সাঁতার দিতে লাগিলেন। ক্রমে অবসন্ন হইয়া অচেতন হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আর একপ্রকার বিপদ।

রজনীকান্ত অচেতন হইয়া জলমগ্ন হন নাই, অনুকূল বায়ু দ্বারায় তাড়িত হইয়া কূলে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। যখন তিনি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন তখন রাত্রি হইয়াছে; ঝড় বৃষ্টি শেষ হইয়াছে। সে প্রকার ঝড়ের হুঙ্কার শব্দ নাই, সে প্রকার নদীর তরঙ্গ নাই, সে প্রকার নদীর শব্দ নাই, সে প্রকার প্রকৃতির সর্ব্বসংহারিণী মূর্ত্তি নাই, তাহার পরিবর্ত্তে শান্ত এবং সুশীতলমূর্ত্তি হইয়াছে। ঊর্দ্ধে অনন্ত নিবিড় নীলাকাশে সপ্তমীর চন্দ্র অসংখ্য তারার সহিত বিরাজ করিতেছে; নিম্নে অনন্ত দেশব্যাপিনী বিশাল হৃদয়া জাহ্নবী নিঃশব্দে রজনীকান্তের চরণ ধৌত করিয়া ছুটিতেছে। নদীতীর জনহীন, শব্দহীন; কেবল মাত্র রজনীকান্ত মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইয়া শয়ন করিয়া আছেন।

রজনীর জ্ঞান লাভ মাত্রেই বোধ হইল যে তিনি নদীতীরে মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মস্তক কঠিন মৃত্তিকায় রক্ষিত নহে, অথচ কোমল উপাধানেও নহে। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন এক লাবণ্যময়ী যুবতী অর্দ্ধ জলে অর্দ্ধ স্থলে বসিয়া সেই বিজন তটিনী কূলে তাহার উরূপরে রজনীর মস্তক রাখিয়া আলুলায়িত আর্দ্র কেশরাশি দ্বারায় ঝড় বৃষ্টি হইতে রজনীর দেহ রক্ষা করিতেছিল। রজনী স্বপ্ন মনে করিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন, কিন্তু মধ্যে২ ক্ষুদ্র২ বীচিমালা তাহার পাদমূলে আঘাত করাতে সে ভ্রম দূর হইল, আবার চক্ষু উন্মীলন করিলেন কিন্তু পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইলেন না। যুবতীর মুখ-

কুঞ্চিত বিপুল কেশরাশি-মধ্যে লুক্কায়িত। সেই কেশরাশির শেষাগ্রভাগ রজনীকান্তের বাহুদ্বয়, বক্ষ, মুখমণ্ডল আবরণ করিতেছে; যুবতী মধ্যে২সেই সুগন্ধযুক্ত কেশগুচ্ছ সকল রজনীর নাসিকাগ্রভাগ হইতে কোমল অঙ্গুলি দ্বারা স্থানান্তরিত করিতেছে। রজনী যুবতীর মুখ দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু তিনি যে অলকাগুচ্ছের অন্তরাল হইতে তাঁহার প্রতি ব্যগ্রভাবে দৃষ্টি করিতেছিলেন, তাহা দেখিলেন। রজনী বিংশতি বৎসর বয়স্ক। এ বয়সে কে সেই সপ্তমী চন্দ্রালোক বিধৃত কলকলনাদী তরঙ্গিণীর তীরোপরি নিবিড় কেশরাশি-মধ্যেলুক্কায়িত অপ্সরানিন্দিত সুন্দরীর উরূপরে মস্তক রাখিয়া, তাহার কেশরাশি বক্ষে করিয়া মোহিত না হয়? রজনী আত্ম বিস্মৃত হইলেন, নিজবিপদ্ ভুলিয়াগেলেন, স্বাভাবিক বল পাইলেন, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

অনন্তর যুবতী চকিত নেত্রে মস্তক নত করিয়া রজনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। উভয়ের নিশ্বাস মিশ্রিত হইল। যুবতীর অলকাগুচ্ছ রজনীর গণ্ডদেশে পড়িল। রমণী দেখিলেন যে, রজনী চক্ষু চাহিয়া রহিয়াছেন, অমনি সলজ্জে অঞ্চল টানিয়া মস্তক এবং পৃষ্ঠ আবরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, এবং সেই চেষ্টাতে অলক্ষ্যে রজনীকান্তের মস্তক তাহার উরু হইতে ভূমে পতিত হইল। অমনি যুবতী আপনার মস্তক আবরণ করিতে ভুলিয়া গেলেন, এবং দুই হস্তে তাহার মস্তক ধারণ করিয়া অতি দয়ার্দ্র স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আহা!" তৎপরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেগেছে কি?" রজনীকান্ত সেই স্বর শুনিলেন; যেমন কোন পুষ্পের সুগন্ধ ঘ্রাণে অথবা কোন সঙ্গীত শ্রবণে কখন২ মনুষ্য হৃদয় উচ্ছ্বাসিত হয়, এই রমণীকণ্ঠ-স্বর শুনিয়া রজনীর সেইরূপ হইল। রজনী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন, যুবতী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেগেছে কি?"

রজনীকান্ত উত্তর করিলেন, "না—আপনি কি মুখুয্যেদের—?" তখন রমণী আত্মস্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া অঞ্চল টানিয়া মস্তক আবরণ করিয়া সলজ্জে মৃদু২ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, যে রজনী প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন, তখন বসন্তপবনসঞ্চালিত মেঘবৎ আস্তে২ চলিলেন। রজনীও উঠিলেন; দুই একবার পদস্খলিত হইল, তথাপি চলিলেন; সম্মুখে একটি বাঁধাঘাট দেখিলেন, এবং চিনিলেন, যে তাঁহার নিজ গ্রামের বসুস্বরবার ঘাট। অতি ধীরে ধীরে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া উপরে আসিলেন। কিন্তু রমণীকে আর দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার পরিচয় লাভার্থ ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না; এই আর একরূপ বিপদ্।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিপদ্ নানা প্রকার।

পূর্ব্বকথিত ঘটনার এক সপ্তাহ পরে এক দিবস রজনীকান্ত গঙ্গাতীরে একাকী দাঁড়াইয়া নদীর শোভা দেখিতেছিলেন। সম্মুখে জাহ্নবীর অনন্ত বিস্তার নীলাম্বুরাশি, তদুপরি বণিক্‌দিগের বৃহৎ বৃহৎ তরণী শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া অতি দূর হইতে উড্ডীন,শ্রেণীবদ্ধ রাজহংসের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কিন্তু রজনী সে সকল কিছুই দেখিতেছিলেন না। অতি দূরে একখানি ক্ষুদ্র তরী শ্বেতপাল বিস্তৃত করিয়া তর তর বেগে আসিতেছিল, তিনি তাহাই অনিমিষ লোচনে দেখিতেছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইলে তাঁহার জলমগ্ন বৃত্তান্ত সুখস্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। কাল মেঘ তাঁহার মিষ্ট বোধ হইতে লাগিল। সেই পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গের গর্জ্জন তাঁহার মধুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আবার সেই বিপদে পড়িতে ইচ্ছা জন্মিল। আবার সেই সুন্দরীর উরূপরে মস্তক রাখিতে বাসনা হইল। এই যে নৌকা তরতর বেগে আসিতেছে ইহাতে আরোহণ করিলে তৎক্ষণাৎ কাল মেঘ উঠিবে, সেইরূপ প্রচণ্ড ঝড় উঠিবে, শেষ নৌকা জলমগ্ন হইবে, পুনরায় রমণীকে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু রজনীর আশা নিষ্ফল হইল; নৌকা নক্ষত্রবেগে বসুন্ধরার ঘাট উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে ছুটিল। রজনী নিরাশ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তৎপরে পশ্চাতে মনুষ্যকণ্ঠ শুনিয়া মস্তক ফিরাইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সমবয়স্ক একটি যুবা তাঁহার দিকে হাসিতে হাসিতে আসিতেছে। যুবক তাঁহার বাল্যসহচর নাম মহেন্দ্রনাথ। মহেন্দ্রনাথ রজনীকে কলিকাতার নানা সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং নানা প্রকার কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। রজনীকান্ত অন্যমনস্ক হইয়া কেবল "হাঁ" এবং "না" উত্তর করিতে লাগিলেন। রজনীর এই প্রকার ভাবান্তর দেখিয়া মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজনী, প্রায় দুই মাস হইল আমি যখন তোমায় কলিকাতায় দেখিয়াছিলাম তখন তুমি সদানন্দ ছিলে, এখন ঈদৃশ ভাবান্তর কেন? তোমার বাটী আসাতে কোথায় আনন্দ বৃদ্ধি হইবে—না উহা হ্রাস হইল? ইহার কারণ একমাত্র আমার অনুভব হইতেছে যে তুমি কলিকাতায় কোন রমণীর প্রণয়-পাশে বদ্ধ হইয়াছ এবং তাহার বিচ্ছেদে এমন বিমর্ষ হইয়াছ।" রজনীকান্ত উত্তর দিলেন না। মহেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন কিন্তু তাঁহার এই শেষ উক্তিতে রজনীর চমক ভাঙ্গিল। তিনি তাঁহার বিমর্ষতার কারণ এপর্য্যন্ত অনুসন্ধান করেন নাই; অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার হৃদয় মুকুরে সেই জাহ্নবীতট-বিহারিণী যুবতীর ছায়া রহিয়াছে। রজনীকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন। বুঝিলেন, যে

সেই যুবতীকে প্রথম সন্দর্শনেই ভালবাসিয়াছেন। তবে সেকি শৈশব সহচরী কুমুদিনী! তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, অন্যমনে সেই জাহ্নবীতীরে দাঁড়াইয়া, একটি অশ্বথ বৃক্ষের পাতা লইয়া, হস্ত দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া জাহ্নবীনীরে প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং কেমন তাহারা ক্ষুদ্র বীচিমালা সঞ্চালনে নাচিতেছিল তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বালিকার প্রেম তাও বিপদ্।

এখনও অল্প অল্প বেলা আছে—আম্র, বকুল, নারিকেলাদির উচ্চশাখায় সুবর্ণ সদৃশ সূর্য্যকিরণ এখনও জ্বলিতেছিল, প্রশান্ত গঙ্গাহৃদয় অতি ক্ষুদ্র বীচিমালা-সঞ্চালনে প্রতিস্ফুরিত হইতেছিল। এমত সময়ে দুইটি বালিকা গাত্রধৌত করিতে আসিতেছিল। পথ জনশূন্য, বালিকারা অন্য দিন আমোদে আমোদে আসিয়া থাকে, কিন্তু আজ ভযে ভয়ে আসিতেছিল। দেখিল কোথাও লোক নাই, শব্দ নাই, কেবল মাথার উপরে নীল নভোমণ্ডলে পাপিযার আকাশব্যাপী রব আর পৃথিবীতে জাহ্নবীর মৃদুবাত সংস্পর্শ জনিত মধুর ধ্বনি। বালিকারা দ্রুত-পাদবিক্ষেপে সঙ্কোচিত নয়নে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে চলিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠা হঠাৎ দাঁড়াইয়া অঙ্গুলিদ্বারা গঙ্গাতীর-বর্ত্তী একটি অশ্বথবৃক্ষ প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া জ্যেষ্ঠাকে কহিল, "দেখ, স্বর্ণপ্রভা ঐ গাছের আড়ালে কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।" স্বর্ণপ্রভা একাদশবর্ষীয়া আশ্চর্য্য সুন্দরী, তাহার শরীর যুবতীদিগের ন্যায় গুরুত্ব প্রাপ্ত হইতেছিল। স্বর্ণপ্রভা কহিল "কৈ?" বয়ঃকনিষ্ঠা অর্থাৎ কামিনী ভয়সূচক মৃদু স্বরে পুনরায় অঙ্গুলিদ্বারা দেখাইল "ঐ" এবং তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "স্বর্ণপ্রভা তোর বর গো তোর বর।" স্বর্ণপ্রভা একবার চাহিয়া দেখিল, পরে সলজ্জে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাটীরদিকে দৌড়িল। রজনীকান্ত বৃক্ষান্তরাল হইতে সকল দেখিতে ছিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, বুঝি স্বর্ণপ্রভার সহিত তাঁহাব বিবাহ হইলে সুখী হইতে পারিবেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই গঙ্গাতটবিহারিণী রমণীর ছায়া হৃদয়মধ্যে অনুভব করিলেন। রজনীব অমনি সকল সুখের আশা অন্তর্হিত হইল, রজনী চিন্তাকরিবার অবকাশ পাইলেন না। বালিকা দিগের মধ্যে চীৎকারধ্বনি শুনিলেন। দেখিলেন স্বর্ণপ্রভা দৌড়িতে দৌড়িতে পড়িয়া গিয়াছেন। রজনী রুদ্ধশ্বাসে গমনপূর্ব্বক স্বর্ণপ্রভাকে হস্ত ধরিযা তুলিলেন। স্বর্ণপ্রভা লজ্জায় রক্তিমাবর্ণ হইল, এবং রজনীর হস্তত্যাগ করিবার জন্য বলপ্রকাশ করিল, রজনীও বলপ্রকাশ করিলেন; কিন্তু আশ্চর্য্য! রজনী পরাভূত হইলেন। স্বর্ণপ্রভা কামিনীকে ইষ্টগুরু, গঙ্গার শপথ করাইয়া নিষেধ করিলেন, যেন রজনীকান্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ, কাহারো নিকটে প্রকাশ

না করে। স্বর্ণপ্রভা বাটী পৌঁছিয়া সন্ধ্যার সময় কালী বাড়ীতে আরতি দেখিতে গিয়া প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিলেন, "হে মা কালি, রজনীকান্ত যেন আমার বর হয়।" তৎপরদিন প্রত্যূষে স্বর্ণপ্রভার মাসি দুর্গা দুর্গা বলিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেছিল, স্বর্ণপ্রভা অমনি মনে মনে বলিল, "হে মা দুর্গা রজনীকান্ত যেন আমাব বর হয়।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কেশ বিন্যাস।

তাহাই হইল, দুই সপ্তাহ পবে দেবতাবা স্বর্ণপ্রভাব প্রার্থনা শুনিলেন, রজনীকান্তেব সহিত তাহাব বিবাহ স্থিব হইল। আগামী সোমবাব ২২শে আষাঢ়ে বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। অদ্য গাত্রে হরিদ্রা,সুবর্ণপুরে বড় ধুম; বরকর্ত্তা, কন্যাকর্ত্তা উভয়েই ধনাঢ্য, উভয়েই বিবাহ-উপলক্ষে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত। কন্যা-কর্ত্তাব বাড়ীতে অদ্য বড় গোল, স্বর্ণপ্রভার আহ্লাদের শেষ নাই, রজনীকান্ত তাহার বর হইবে।

অপরাহ্নে তাহার বিংশতি বর্ষীয়া বিধবা ভগিনী কুমুদিনী তাহার কেশরাশি লইয়া প্রাসাদোপরি বসিয়া বিন্যাস করিতেছিল। সম্মুখে আদর দিদি নামে এক বৃদ্ধা ঠাকুরাণী দিদি দাঁড়াইয়া,—আদরদিদি নামেও যেমন কাজেও তেমন, সকলকেই আদর করিতে ভাল বাসিতেন, ভগিনীদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠাকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন, "আহা! কুমু আমাদের কি সুন্দরী! অমনসুন্দরী স্বর্ণও নয়—"

কুমুদিনী বিরক্ত হইয়া বলিল, "আদর দিদি! স্বর্ণের চেয়ে আমায় সুন্দরী বলিলে আমি কি সন্তুষ্ট হইব?" স্বর্ণপ্রভা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি রাগ করিলি কেন, সত্য সত্যই ত তোর মতন সুন্দরী কেউ কখন দেখে নাই।" আদর দিদি ভীত এবং অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "তা নয় আমি স্বর্ণপ্রভাকে কুৎসিত বলি নাই, স্বর্ণও বড় সুন্দরী, আর তেমনি উপযুক্ত পাত্রেও পড়িল; কুমু, তুই স্বর্ণপ্রভার বর রজনীকান্তকে কখন দেখিয়াছিস?"

কুমুদিনী নীরব হইয়া রহিল।

আদর। আমি দেখিয়াছি,দিব্বি সুন্দর, তবে কি না, শুনেছি সদা সর্ব্বদা বিমর্ষ, বুঝি কোন আবাগি ঔষধ করেছে,আহা! কার রূপে বশীভূত হইয়াছে, তা হক, আমাদের স্বর্ণপ্রভা তেমন মেয়ে নয় শীঘ্র বশ করে নেবে।

এইপ্রকারে কথোপকথন চলিতে ছিল, কিন্তু কুমুদিনী উহাতে বিরক্তি প্রকাশ করাতে আদর দিদি চলিয়া গেল। স্বর্ণপ্রভা কেশ রচনা শেষ হইলে চলিয়া গেল, যাইতে২ অস্ফুট স্বরে আদরদিদিকে সম্বোধন করিয়া মাথা নাড়িতে২ বলিতে লাগিল "শীগ্‌গির মর্ শীগ্‌গির মর্ শীগ্‌গির মর্।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ, সন্দেহ ভঞ্জন।

অদ্য বিবাহরাত্রি। বড় ধুম, সুবর্ণপুরের পথ ঘাট জনাকীর্ণ, কত দেশ দেশান্তর হইতে কত শত শত লোক বিবাহ দেখিতে আসিয়াছে। বরের বাটী হইতে কন্থার বাটী পর্য্যন্ত আলোকময়, এবং অবিশ্রান্ত লোক জন যাতায়াত করিতেছে; রাত্রি এক প্রহরের পর রজনীকান্ত বরবেশে শিবিকারোহণ করিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার স্বজনগণের অসুখ জন্মিল। চারিদিক্ হইতে দর্শকমণ্ডলীর কোলাহলে গগনমার্গ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। বৃহৎ অট্টালিকার একটি নিভৃত কক্ষে স্বর্ণপ্রভা সেই গগনভেদী কোলাহল শুনিলেন, তাঁহার হৃৎকম্প হইল, অকারণে মনে ভয়সঞ্চার হইল, স্বর্ণপ্রভা কাঁদিয়া উঠিলেন। জ্যেষ্ঠা কুমুদিনী তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তিনিও কাঁদিয়া উঠিলেন, কি কারণে কাঁদিতে লাগিলেন দুই জনের কেহই বুঝিতে পারিলেন না। ক্রমে কোলাহল নিকটবর্ত্তী হইল এবং পরক্ষণেই পৌরস্ত্রীগণ "বর আসিয়াছে" বর আসিয়াছে" বলিয়া হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিল। স্বর্ণপ্রভার ক্ষণকালের জন্ত আহ্লাদে শরীর কণ্টকিত হইল, বর আসনে গিয়া বসিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া পৌরস্ত্রীগণ নানাপ্রকার ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। যে সকল যুবতী বাসরে বরের সহিত রহস্য করিবার আশয়ে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বরকে দেখিয়া অস্ফুট স্বরে বলাবলি করিতে লাগিলেন "ও আবার কি রকম? ছোঁড়া কি নড়াই করিতে আসিয়াছে নাকি?" স্বর্ণপ্রভার জননী রজনীকান্তের মূর্ত্তি দেখিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিলেন। কন্যাকর্ত্তা বিষণ্ণ বদনে সভাস্থ সকলের নিকট অনুমতি লইয়া বরকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। স্বর্ণপ্রভা স্ত্রীআচারস্থানে আনীত হইল, কুমুদিনী স্বর্ণের সঙ্গে সঙ্গে আসিল। স্ত্রীআচার আরম্ভ হইল; দূর হইতে এক উন্মাদিনী গাইয়া উঠিল।

যমুনার জলে গিয়ে
কদমতলার পানে চেয়ে
না জানি দেখিলা কোন জনে।

রজনীকান্ত সচকিত নয়নে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে কি দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর হইল— শরীর কাঁপিতে লাগিল। কন্যাসম্প্রদান হইল, দুই হাত এক হইল, স্বর্ণপ্রভা যাবজ্জীবনের জন্য রজনীকান্তের হইল। সন্ধ্যা হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, এখন একবার গভীর নিনাদে মেঘ ডাকিল, বিদ্যুৎ হানিল, পরক্ষণে প্রবল ঝটিকা উঠিল, প্রাঙ্গণের আলো নিবিয়া গেল, পৌরস্ত্রীগণ কোলাহল করিয়া উঠিল, কন্যার জননী, বর কন্যা বাসরে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু অন্ধকারে বরকে দেখিতে পাইলেন

না। আলো আনিলেন, তথাচ দেখিতে পাইলেন না। বাটীর এদিক্ ওদিক্ চতুর্দ্দিক্ অবশেষে সমুদায় গ্রাম আলো লইয়া ভৃত্যবর্গ অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও বরকে দেখিতে পাইল না, তখন কন্যাকর্ত্রী চীৎকার করিয়া আছাড়িয়া ভূমিতে পড়িলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিপদের উপর বিপদ্।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, গভীরশব্দে শ্রাবণের মেঘ ডাকিতেছে, শন শন শব্দে ঘোরতর বায়ু বহিতেছে, রজনীকান্ত জনহীন প্রকাণ্ড এক প্রান্তরমধ্যে একাকী। বর্ষাকালে প্রান্তরের স্থানে স্থানে জল দাঁড়াইয়াছে, কর্দ্দম হইয়াছে, রাত্রি ঘনান্ধকার—ত্রয়োদশীর রাত্রি। রজনীকান্ত চলিলেন। অন্ধকারে কোথায় যাইবেন? কিন্তু দুঃসহ মনের চাঞ্চল্য হেতু রজনীকান্ত একস্থানে স্থির হইতে পারিলেন না, সুতরাং চলিলেন,—কাদার উপর দিয়া চলিলেন,—মধ্যে মধ্যে জলের উপর দিয়া চলিলেন। আবার পথ অন্বেষণে দাঁড়াইলেন, অন্ধকারে কোথায় পথ। পশ্চাতে একবার মনুষ্য-পদশব্দ শুনিতে পাইলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কেও?" কোন উত্তর পাইলেন না, কিছু দেখিতেও পাইলেন না, দাঁড়াইয়া রহিলেন; একবার ভাবিলেন, তাঁহার সদ্য বিবাহিতা স্বর্ণপ্রভাকে ত্যাগ করিয়া কুকর্ম্ম করিয়াছেন, সম্মুখে একটি বৃহৎ বট বৃক্ষ বাতাসে শনশন শব্দ করিতেছিল রজনীকান্ত তাহাতে বুঝিলেন যেন বৃক্ষ তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছে—"কি কুকাজ করিলে" পবনদেব যেন রাগান্বিত হইয়া তাঁহার কাণে কাণে কহিতেছেন "ছি, ছি! কি কাজ করিলে?" আবার তখন কি ভাবনা মনোমধ্যে উদয় হইল, রজনী অমনি দ্রুত চলিলেন। এবার হাঁটুসমান জলে আসিয়া পড়িলেন। কোথাও পথ দেখিতে পাইলেন না, সম্মুখে এক ধবল পদার্থ দেখিলেন। মনুষ্য বলিয়া বোধ হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেও?" এবার উত্তর পাইলেন "পথিক," রজনীকান্ত অনুভবে বুঝিলেন যে, পথিক এক দীর্ঘাকার সন্ন্যাসী। তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে প্রান্তর উত্তীর্ণ হইবার পথ দেখাইতে পার? পথিক কহিল আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস, রজনীকান্ত চলিলেন। কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া পথিককে আর দেখিতে পাইলেন না, চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "কোথা গেলে গো।" উত্তর নাই, কেবল প্রান্তরের অপর পার্শ্ব হইতে প্রতিধ্বনি হইল "হো হো" রজনীকান্ত আবার দাঁড়াইলেন, এবার কলকলনাদী সমীরণ-সন্তাড়িত ভাগীরথীর তরঙ্গগর্জ্জন শুনিতে পাইলেন। সেই শব্দ উদ্দেশে চলিলেন। এখন একটু আকাশ পরিষ্কার হওয়াতে পথ দেখিতে পাইলেন। হঠাৎ সম্মুখে দেখিলেন বহুবারিপূর্ণা শ্রাবণ মাসের গঙ্গা কলকল রবে তরতর

বেগে সাগরাভিমুখে ছুটিতেছে। সম্মুখে গঙ্গাযাত্রীর কোটা দেখিয়া রজনীকান্ত বুঝিলেন যে, অন্ধকারে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই বসুন্ধরার ঘাটে আসিয়াছেন। এই স্থানে প্রায় মাসাবধি হইল তাঁহার বিপদ্ ঘটিয়াছিল। এই ঘাটে কুমুদিনীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া মূর্চ্ছিত ছিলেন। রজনী অনেকক্ষণ তীরে দাঁড়াইয়া নদীর ভয়ঙ্কর শোভা দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব ঘটনা আলোচনা করিতে লাগিলেন। পরে জলক্রীড়ার শব্দ শুনিলেন, বোধ হইল কে জলে গা ধুইতেছে। আস্তে আস্তে ঘাটে নামিলেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল—কুমুদিনী একাকিনী রাজহংসীর ন্যায় জলক্রীড়া করিতেছে। রজনীর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না কিন্তু জলবিহারিণী রমণী মাথায় কাপড় টানিতে টানিতে বলিল, "কে, রজনীকান্ত, ভগিনীপতি?" রজনীর শরীর কণ্টকিত হইল; অনেককষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এখানে কেন? জলবিহারিণী উত্তর করিল "ডুবে মরিব বলে।"

রজনী কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দুঃখে ডুবে মর্‌বে?" জলবিহারিণী কামিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "আমি সত্য সত্যই ডুবিতে আসি নাই, তুমি আমার ভগিনীপতি, আমি পরীক্ষা করিতেছিলাম আমার প্রতি তোমার স্নেহ জন্মিয়াছে কিনা।" রজনীকান্ত উত্তর না করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, "আমিও জানিতে ইচ্ছা করি তোমার ভগিনীপতির প্রতি তোমার স্নেহ জন্মিয়াছে কিনা—আজ আমি এই গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিব, দেখি তুমি কি কর।" কুমুদিনী উত্তর করিল, "ভগিনীপতি তোমার কি মনেপড়ে? যখন আমরা বাল্যকালে একত্রে ক্রীড়া করিতাম, এক দিবস পদ্ম পুকুরে আমার জন্য একটি পদ্ম তুলিতে গিয়া ডুবিয়া গিয়াছিলে, মনে পড়ে? কে তোমায় বাঁচাইয়াছিল; আর সে দিন এই গঙ্গাতীরে যেমন করে একবার বাঁচাইয়াছিলাম তেমনি করে এ বারও বাঁচাব।" এই উত্তরের পর উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন। যেন গঙ্গার ভীষণ শোভায় দুইজনেই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, ক্ষণেক পরে রজনী বলিলেন, "আচ্ছা তবে আমি জলে ডুবি, তুমি সেই প্রকারে আমায় বাঁচাও দেখি।" এই বলিয়া কূল হইতে জলে ঝাঁপ দিলেন, অমনি কুমুদিনীও চীৎকার করিয়া রজনীর পশ্চাতে পশ্চাতে ঝাঁপ দিলেন। চীৎকারধ্বনি সেই ভীষণ তমিস্র নৈশ গগনে আরোহণ করিয়া গঙ্গার একূল ওকূল হইতে প্রতিধ্বনিত হইল। কুমুদিনী রজনীকে ধরিতে গিয়া দেখিলেন, তাহার সম্মুখে এক দীর্ঘাকার পুরুষ চিবুক পর্য্যন্ত জলে নিমগ্ন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।" কুমুদিনী কাঁদিয়া তাহাকে বলিলেন, "ওগো তুমি কে গো রক্ষা কর, আমার ভগিনীপতি এইমাত্র জলে ডুবিল তাহাকে বাঁচাও।" আগন্তুক অতি ক্রুদ্ধ এবং গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কুমুদিনি!" কুমুদিনীর শ-

রীর কাঁপিয়া উঠিল, নিস্পন্দ হইল। তিনি দেখিলেন, এক দীর্ঘাকার ভীষণাকৃতি সন্ন্যাসী তাঁহাকে ডাকিতেছে। ভয়ে তাঁহার অঙ্গ অবশ হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী পুনরপি ডাকিল, "কুমুদিনি!" "তুমি যাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলে তাঁহার শিবপূজা শেষ হইয়াছে। ঐ দেখ তিনি তোমার জন্য মন্দিরের নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন,উঠ বাড়ী যাও।" কুমুদিনী বলিল,আমার ভগিনীপতি? সন্ন্যাসী বলিল "ভয় নাই!" মন্দিরের নিকট হইতে বামাকণ্ঠে একজন ডাকিল,"কুম আর আমার হইয়াছে।" কুমুদিনী আস্তে আস্তে তীরে উঠিয়া চলিলেন। আবার দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ভগিনীপতিকে আমাদের সঙ্গে পাঠাও, আজ যে তাহার বাসর।" সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ হইতে কে উত্তর করিল "এই আমার বাসরঘর।"

ক্লিও পেট্রা।

বিধির অনন্ত লীলা!—অনন্ত সৃজন!
একদিকে দেখ, উচ্চ হিমাদ্রি শিখর,
ভেদিয়া জীমূত রাজ্য আছে দাঁড়াইয়া,—
প্রকৃতি গৌরবধ্বজা, অচল অটল;
অন্য দিকে দেখ নীল ফেনিল সাগর
ব্যাপিয়া অনন্ত রাজ্য!—সতত চঞ্চল,
অচিন্ত্য জীবনে যেন সদা সঞ্চালিত,
সদা বিলোড়িত, সদা কম্পিত, গর্জ্জিত।
উপরে অসীম নভঃ নক্ষত্র মালায়
প্রজ্বলিত—কে বলিবে কত কাল হতে?
কে বলিবে কত কাল প্রজ্বলিত রবে?
নীচে নীল নীর-রাজ্য—অনন্ত, অসীম;
কত কাল হতে তাহে ভাসিতেছে হায়!
অসংখ্য পৃথিবী খণ্ড, কে বলিতে পারে;
কে বলিবে কত কাল ভাসিবে এ রূপে?
মধ্যে এক খণ্ড বারি!—এক তীরে তার
পুণ্য ভূমি ইউরোপ জুড়ায় নয়ন,
রঞ্জিত স্বভাবে, শিল্পী—চারু অলঙ্কৃতা!
অন্য তীরে প্রকৃতির প্রকাণ্ড শ্মশান,
মরুভূমে ভয়ঙ্করা 'আফ্রিকা' ভীষণ!
বিধির অনন্ত লীলা! কে বলিবে হায়!
এই দুই রাজ্য এক শিল্পীর সৃজন!
লজ্জিতা প্রকৃতি বুঝি তাই রোষ ভরে,
হতভাগ্য আফ্রিকায় করিতে মগন
অনন্ত জলধি জলে, দুই মহা শাখা
করিল প্রেরণ দুই সূচীরন্ধ্র পথে—
উত্তরে ভূমধ্য,—পূর্ব্বে রক্তিম সাগর।
দুঃখিনী আফ্রিকা ভয়ে পড়িল কাঁদিয়া
"এসিয়া" চরণ তলে; ভারত—গর্ব্বিণী
দিলেন অভয়, রাখি স্কন্ধের উপরে

চরণ কনিষ্ঠাঙ্গুলি; অশক্ত বারীশ
বলে টলাইতে তারে! সেই দিন হতে,
পুণ্যবতী 'এসিয়ার' স্তম্ভ পরশনে;
মরুভূমি মধ্যে স্বর্গ-তুঙ্কিকার মত,
সোণার মিশর রাজ্য হইল স্বজন।
মিশর অপূর্ব্ব সৃষ্টি! দৃশ্য মনোহর!
বিশাল অরণ্য যার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর;
আপনি সাগর গড় প্রহরীর প্রায়
আছে দাঁড়াইয়া, জগত—বিস্ময়
'টলেমির' চির কীর্ত্তি-স্তম্ভ সারি সারি।
অদূরে আলোক-স্তম্ভ(১)—আকাশ প্রদীপ!
জ্বলিতেছে নীলাকাশে নক্ষত্রের মত,—
নিশান্ধ নাবিকগণ নয়ন রঞ্জন!
শিল্পীর গরবে মাতি প্রকৃতি মানিনী,
পড়াইল নীল নদী(২) নীলমণি হার,—
তরল আভায় পূর্ণ! ভুবন বিজয়ী
('মেকিডন' অধিপতি গ্রন্থি স্থলে তার,
বিশ্ব-খ্যাত রাজধানী করিলা স্থাপন।(৩)
রাজধানী রাজহর্ম্ম্যে বসিয়া নীরবে,
বিরস বদনে, আজি টলেমি-দুহিতা
ক্লিওপেট্রা;—মরি চিত্র বিশ্ব বিমোহিনী!
ধরা ব্যাপী 'রোম' রাজ্যে, যে রূপের তরে
ঘটিল বিপ্লব ঘোর; যে রূপ শিখায়
বিশ্বজয়ী বীরগণ,—যাহাদের হায়!
বীরপণা ইতিহাসে রয়েছে লিখিত
অমর অক্ষরে! করে, অঙ্কে যাহাদের,
সমগ্র পৃথিবী তার ছিল সমর্পিত!—
সিজার, এণ্টনি,—এই নাম যুগলের
সসাগরা বসুন্ধরা ছিল সমতুল!—
হেন বীরগণ, যেই রূপের শিখায়
পড়িয়া পতঙ্গ প্রায় হলো ভস্মীভূত,
কেমনে বর্ণিব আমি সে রূপ কেমন?
মিশর বিহনে এই আফ্রিকা যেমন
মরুভূমি, এইরূপ বিহনে তেমন—
কেবল মিশর নহে—এই বসুন্ধরা
বিস্তীর্ণ অরণ্য সম। চিত্রিব কেমনে
হেন রূপ রাশি?—রূপ অনুপম ভবে!
কল্পনা অতীত রূপ,—নহে চিত্রনেয়!
বিষাদ আঁধারে এই রূপ কহিনুর
জ্বলিতেছে; জ্বলিতেছে সুখ তারা সম
বিষাদ আকাশ গায়ে যুগল নয়ন।
দুই বিন্দু—দুই বিন্দু বারি,—মুক্তানিভ!—
আছি দাঁড়াইয়া দুই নয়ন কোনায়;
নড়ে না, ঝরে না,—আহা! নাহি চাহে যেন
ত্যজি সেই অনঙ্গের আনন্দ-আসন,
পড়িতে ভূতলে; হেন স্বর্গ-ভ্রষ্ট হতে
কে চাহে কখন? যেই নয়নের জ্যোতিঃ
কামান অভেদ্য বক্ষে করিয়া প্রবেশ,
উচ্ছ্বাসিয়া হৃদয়ের বিলাস লহরী,
ভাসাইল তাহে রোম হেন রাজ্য-লিপ্সা।
(সসাগরা পৃথিবীর রাজ সিংহাসন!)
আজি সেই নেত্র আহা! সজল এমন!
বিষাদ লহরী, পূর্ণ-বদন-চন্দ্রিমা,
রত্ন রাজাসন পৃষ্ঠে ফেলিছে ঠেলিয়া;
অপমানে কেশরাশি, বিলম্বিয়া কায়,
আসনের পৃষ্ঠ বাহি পড়িয়া ধরায়,
বিদারি ভূতল চাহে পশিতে তথায়;—
'রোমেশ' হৃদয় যার অতুল আধার,
স্বর্ণ-সিংহাসন তার তুচ্ছ অতিশয়!

(১) Light honor of Sesostres.
(২) River Nile.
(৩) Alexandria.

রঞ্জিত যুগল কর, বক্ষে রমণীর—
হায়! যেই রমণীর কর সঞ্চালনে
বীরগণ হৃদয় ও হইত চঞ্চল,
প্রণয় তাড়িত-ক্ষেপে;—ইঙ্গিতে যাহার
চলিত পুতুল প্রায় ধরার ঈশ্বর,—
আজি সেই কর আহা! অবশ, অচল!
পাষাণ হৃদয়োপরে, পাষাণের প্রায়
রয়েছে পড়িয়া; বুঝি হৃদয় পিঞ্জর
ভাঙ্গি রমণীর প্রাণ চাহে পলাইতে,
সেই হেতু, হায়! এই যুগল পাষাণ,
রেখেছে চাপিয়া সেই হৃদয় কপাট।
দৃষ্টিহীন সঙ্কোচিত যুগল নয়ন,—
অপলক, অচঞ্চল! চাহি উর্দ্ধ পানে;
কৃষ্ণ রেখান্বিত দুই কমলের দলে,
হইয়াছে যেন নীলমণি সন্নিবেশ!
মরি! কি বিষাদ মূর্ত্তি!
সম্মুখে বামার,
রতন খচিত শ্বেত প্রস্তরের মঞ্চে,
শোভিছে আহার্য্য চয়; বহু মূল্য পাত্রে
শোভিছে মিশর জাত সুরা নিরমল;
উপরে জ্বলিছে দীপ বিলম্বিত ঝাড়ে;
বিমল স্ফটিকে দীপ শাখায় শাখায়
জ্বলিতেছে, চারু চিত্র খচিত দেয়ালে।
অনন্ত আনন্দময়ী, আমোদ রূপিণী
ক্লিওপেট্রা সুন্দরীর, এই সেই কক্ষ
মনোহর—অনঙ্গের চির-বাস! রতি
অধিষ্ঠাত্রী দেবী!—যেই কক্ষ আনন্দের
ধ্বনি, অতিক্রমে সিন্ধু, প্রবেশিয়া রোমে
('সেনেট'(১) মন্দিরে হতো প্রতিধ্বনি ময়,
গণিত জেমেশ(২) কেহ রোমে নিশি জাগি

(১) Senate. (২) Augustus Çæsar.

লহরী যাহার; সেই আনন্দ ভবনে
আজি কেন দেখি সব নীরব, অচল!
অচল আলোক রাশি; দেখায় দেয়ালে
অচল মানব চিত্র; অচলিত ভাবে
পড়ে আছে যন্ত্রচয় যন্ত্রী অনাদরে;
অচল অলীন কক্ষে, অজ্ঞাত পরশে
আন্দোলিত হয়ে পাছে মধুর 'সিটার'(১)
বামার বিষাদ স্বপ্ন করে অপনীত;
অচল বামার মূর্ত্তি; অচল হৃদয়ে
অচল যুগল কর; অচল জীবন
স্রোত; চিত্রার্পিত প্রায়, দাঁড়াইয়া পাশে
অচল ভর্ত্তৃর শোকে, সহচরী দ্বয়
কেবল বামার সেই অচল হৃদয়ে,
সবেগে বহিতেছিল, ঝটিকা তুমুল!
"ওলো" চারমিয়ন!"[২]--চমকিলসখীদ্বয়
বামার বিকৃত কণ্ঠে, হলো রোমাঞ্চিত
কলেবর; যেন এই তমসা নিশীথে
শ্মশান হইতে স্বর হইল নির্গত!—
"ওলো সহচরি! এই হৃদয় মন্দিরে
অভিনেতা ছিল যেই প্রণয় দুর্লভ,
অন্তরিত হলো যদি, তবে কেন আর
এ বিলম্ব যবনিকা হইতে পতিত?
শূন্য আজি রঙ্গভূমি! যৌবন পরশে
উঠিল প্রথমে যবে লজ্জা আবরণ,
দেখিলাম রঙ্গভূমি নায়ক এণ্টনি,
জীবন সঙ্গীত স্রোতে খুলিল নাটক—
ক্লিওপেট্রা জীবনের চারু অভিনয়।"
"সুখদ প্রথম অঙ্কে, ওলো চারমিয়ন!—
আছে কি হে মনে?—অনন্ত বালুকাময়ী

(১) Guitar.
(২) Charmian—one of the two maid attendandts.

প্রাচি মরুভূমি—পন্থাহীন, বারি হীন;—
পদতলে প্রজ্বলিত বালুকা অনল;
তৃষ্ণাগ্নি হৃদয়ে, শিরে উল্কা রাশি রাশি,
শত্রু শস্ত্র বিনির্গত, হতেছে বর্ষণ;—
তবু অতিক্রমি হেন দুস্তর প্রান্তর
বীরভরে,—উড়াইয়া ইন্দ্রজালে যেন,
শত্রু সৈন্য চয়, শুষ্ক পত্র রাশি যেন
ভীম প্রভঞ্জনে হায়!—প্রবেশিল যবে
দিগ্বিজয়ী রোম সৈন্য মিশর নগরে;—
লতা গুল্ম তরু তৃণ দলিয়া চরণে,
পশে গজযূথ যথা কমল কাননে।
বিজয়ী বীরেন্দ্র-ব্যূহ-নগর প্রবেশ
নিরখিতে, বসেছিনু অলিন্দে বিষাদে,
চিত্ত কৌতূহল ময়! পদতলে মম
প্লাবিয়া প্রশস্ত পথ, সৈন্যের প্রবাহ
প্রবাহিত; দেখিলাম,—আর নাহি সখি!
ফিরিল নয়ন মম; ডুবিল মানস
সেই প্রবাহ ভিতরে।

"ষোড়শ বর্ষীয়া
সেই বালিকা হৃদয়ে, অজ্ঞাতে, কি ভাব
প্রবেশিল, অভিনব; হেন ভাব সখি!
কি পূর্ব্বে, কি পরে, শৈশবে, যৌবনে,
আর ত কখন করি নাহি অনুভব;—
সেই যে প্রথম, আহা! সেই হলো শেষ!
চিত্ত মুগ্ধকরী ভাব! চিত্ত উন্মাদিনী!
বালিকার অরক্ষিত হৃদয় মোহিল।
কোথায় রোমীয় সৈন্য, কোথায় মিশর,
কোথায় তখন বিশ্ব—গগন—ভূতল?
অদৃশ্য হইল সব নয়নে আমার।
কেবল একটী মূর্ত্তি—বীরত্ব যাহার
মিশি সরলতা, দয়া,—দাক্ষিণ্যের সনে,
[আতপ মিশিয়া যেন চন্দ্রিকা শীতলে!;]
ভাসমান ছিল শ্বেত প্রশস্ত ললাটে;
প্রজ্বলিত নেত্র দ্বয়ে; চির বিরাজিত
উন্নত প্রশস্ত বক্ষে; স্ফুরিত প্রত্যেক
বীর—পদ সঞ্চালনে;—হেন মূর্ত্তি সখি!
লুকাইয়া অনুপম বীরত্বে তাহার,
সৈন্যের প্রবাহ, (যথা মহীরুহ চয়,
লুকায় চন্দ্রমাচল (১) আপন গহ্বরে!)
ভাসিল নয়ন মম,—ব্যাপিয়া হৃদয়,
ব্যাপিয়া অনন্ত বিশ্ব, ভূতল, গগন।
সেই মূর্ত্তি সখি মম বীরেশ এণ্টনি!
চঞ্চলিয়া বালিকার অচল হৃদয়
প্রথম প্রনয়াবেশে—স্বরগ ভূতলে!—
সেই মূর্ত্তি, প্রিয় সখি! হইল অন্তর,
সুদূর সুন্দর রোমে, কিছু দিন তরে;
স্থির জলধির জল করিয়া চঞ্চল,
প্রতিপদ চন্দ্র সখি! গেল অস্তাচলে!"

"খুলিল দ্বিতীয় অঙ্ক। জনক আমার—
(পিতৃনিন্দা, দেবগণ! ক্ষমিও আমারে!)
অস্ত্রধারী টলেমির বংশে বংশীধর (২)

(১) Mountain of the moon.

(২) ক্লিওপেট্রার পিতা টলেমি বংশী বাদন ইত্যাদি লঘু আমোদে মত্ত হইয়া প্রজার বিরাগভাজন হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যাকে মিসরের রাজ্ঞী করে। টলেমি রোমের সাহায্যে, তাঁহার কন্যাকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হন—এই সময়ে এণ্টনি রোমান সৈন্যের একজন অধ্যক্ষ হইয়া আইসেন। টলেমি তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বধ করেন—এই পাপিয়সীও তাহার প্রথম স্বামীকে

কুলাঙ্গার—বিসর্জ্জিয়া স্বাধীন মিশরে
রোম রূপী শার্দ্দূলের বিশাল করাল;
পতি হন্তা, পাপিয়সী, জ্যেষ্ঠ দুহিতার
তপ্ত শোণিতাক্ত, ভ্রষ্ট সিংহাসনে সুখে
আরোহিয়া,—বিধাতার কেমন বিধান!
পতি হন্তা দুহিতার কন্যা হন্তা—পিতা!—
অবশেষে—হায়! দুঃখ বলিব কেমনে!—
দশম বর্ষীয় শিশু কনিষ্ঠ আমার,
কবি আমি যুবতীর পতিত্বে বরণ;—
সেই খানে ক্লিওপেট্রা জীবন উদ্যানে,
যেই বীজ, প্রিয় সখি! হইল রোপণ,
সে অঙ্কুরে কি পাদপ জন্মিল স্বজনি!
কি ভীষণ ফল পুনঃ ফলিবেক আজি?
বধি জ্যেষ্ঠ দুহিতায়; বধিতে আমায়,
সেই দিন মৃত্যু অস্ত্র করিয়া সৃজন;
ডুবাযে মিশরে; আহা! ডুবিবে আপনি;
ডুবাযে টলেমি বংশ; জনক আমার
সম্বরিলা নর লীলা,—নব দম্পতিরে
সমর্পিয়া দুরাচার ক্লীব মন্ত্রিকরে,
দুগ্ধের প্রহরী কবি পাপিষ্ঠ মার্জ্জারে।"

"না হতে পিতার শেষ নিশ্বাস নির্গত,
সিংহাসন হতে পাপী—ফেলিল আমায়
পূর্ব্বারণ্যে। হা অদৃষ্ট! রাজার উদ্যানে
ফুটেছিল যে কুসুম, পড়িল এখন
মরুভূমে!—সে যে দুঃখ কহা নাহি যায়!
কিন্তু নারী প্রতি হিংসা, প্রচণ্ড অনল,
শীতানিল মার্ত্তণ্ডের মধ্যাহ্ন কিরণ।
সহসা মিলিল সৈন্য। সেনা পত্নী—আমি
সাজিনু সমর সাজে। কবরীর স্থলে
বাঁধিলাম শিরস্ত্রাণ, উরস্ত্রাণ, উচ্চ
কুচ যুগোপরে। যেই কর, কমনীয়
কুসুম দামের ভরে হইত ব্যথিত,
লইলাম সেই করে তীক্ষ্ণ তরবার;
পশিলাম এই বেশে মিশর ভিতরে,
ক্লীব রক্তে নীল নদী করিতে লোহিত,
কিম্বা বীরাঙ্গণা রক্তে রঞ্জিতে মিশরে।
হেন কালে রোম রাজ্য বিপ্লাবি, বিলোড়ি,
ভীষণ তরঙ্গ দ্বয়(১)—সিন্ধু অতি ক্রমি,
পড়িল জীমূতমন্দ্রে মিশরের তীরে;
কাঁপিল মিশর সেই ভীষণ আঘাতে,
রণোন্মত্ত অসি দ্বয়(২) পড়িল খসিয়া।
এক উর্ম্মি হলো লয় সমুদ্র সৈকতে,
দ্বিতীয় উঠিল শূন্য সিংহাসনোপরে!"

"সিজার মিশরে!—ডুবে গেল রণসজ্জা।
নব ফার্শেনিয়া—পম্পি বিজয়ী সিজার,
মিশরের সিংহাসনে!—ভুলিলাম সখি!
রণবেশ, দীনা বেশে রোমেশ চরণে
পড়িলাম,—সে কুহক আছে কি হে মনে?(৩)

তাহার মনোমত হয় নাই বলিয়া ইতি পূর্ব্বে বধ করিয়াছিল। টলেমি মৃত্যু সময়ে মিসর দেশের রীতি মতে, উইল দ্বারা ক্লিওপেট্রাকে তাহার একটী ১০ম বর্ষীয় ভ্রাতার সঙ্গে পরিণয় বদ্ধ এবং একজন ক্লীব দুরাচারকে তাহাদের অভিভাবক করিয়া যান।

(১) ফার্শেনিয়ার যুদ্ধের পর পম্পি সিজারের দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া মিশরে উপস্থিত হইলে, মিশরবাসী সমুদ্রতীরে তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া সিজারকে উপঢৌকন দেয়; সিজার মিসরের আভ্যন্তরিক বিগ্রহ নিবন্ধন শূন্য সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন।

(২) ক্লিওপেট্রার এক অসি, এবং তাঁহার শত্রু পক্ষে দ্বিতীয় অসি।

(৩) ক্লিওপেট্রার জনৈক অনুচর তাঁহাকে

ঝটিকায় ছিন্নমূল ব্রততী যেমতি,
বন্দে মহীরুহ হায়!—নিরাশ্রয়া লতা।"
"সে ঐন্দ্রজালিক সখি! কর সঞ্চালনে,
নিবারি তুমুল ঝড়, রক্ষিল আমারে,
আলিঙ্গিয়া স্নেহভরে। প্রিয় সখি! হায়!
এই জীবনে প্রথম,—এই মরুভূমে—
স্নেহ সুশীতল বারি হলো বরিষণ।
নিষ্ঠুর জনক যার; নিষ্ঠুরা ভগিনী;
শিশু সহোদর, ভর্ত্তা; মন্ত্রী—নরাধম;
সে কিসে জানিবে সখি! স্নেহ যে কি ধন?
যুড়াইল প্রাণ, সখি! পুরাইল আশা,
বসিলাম সিংহাসনে, বসিলাম?—ভীম
ভূকম্পনে, কিম্বা অগ্নি—গিরি—উদ্গীরণে,
টলিতে লাগিল মম নব সিংহাসন।
দেখিলাম অন্ধকার, ঘুরিল মস্তক,
পড়িতেছিলাম সখি! মূর্চ্ছিত হইয়া
অকূল সাগরে,—কি যে বীরপণা সখি!
জলে, স্থলে, কি অনলে করিল বীরেশ,
স্বচক্ষে দেখেছ, সখি! শুনেছ শ্রবণে।
দেখিলাম মূর্চ্ছাভঙ্গে মেলিয়া নয়ন,
ভাসিয়াছে শিশু ভর্ত্তা শত্রুদলসহ,
অনন্ত জীবন জলে; বসিয়াছি আমি
মিশরের সিংহাসনে,—বলিব কেমনে
সেই লজ্জা?—সিজারের হৃদয় আসনে!
কৃতজ্ঞতা রসে সখি ভরিল হৃদয়,
ধন, প্রাণ, সিংহাসন, প্রণয় দাতায়,
করিলাম সহচরি আত্মসমর্পণ।
কিন্তু সেই কৃতজ্ঞতা—জান সমুদয়—
সেই কৃতজ্ঞতা শেষে কোথা হলো লয়!
একে প্রাণ দাতা, তাহে পৃথিবী ঈশ্বর,
ততোধিক ভুজবলে ভূমণ্ডল জয়ী;
এত প্রলোভন!—সখি! পড়িলাম আমি,
অজগর আকর্ষণে—সরলা হরিণী।"
"হেন কালে চারিদিকে সমর অনল
জ্বলিল, সিজার এই মিশরে বসিয়া
দেখিল অনল শিখা; বৈশ্বানর রূপে
ঝাঁপ দিল, সখি! সেই বহ্নির ভিতরে;
নিবাইল কটাক্ষেতে শোণিত প্রবাহে
বীরবর! বাহুবলে আপনি সমুদ্র
রহিয়াছে বন্দি যার রাজ্যের ভিতরে,
এই ক্ষুদ্র অগ্নি শিখা কি করিবে তারে?
বিজয় পতাকা তুলি; ভীম সিংহনাদে
কাঁপায়ে ভূধর শ্রেণী সুদূর উত্তরে;
ডুবায়ে জলধি মন্দ্র অদূর দক্ষিণে,
ছড়ায়ে গৌরব ছটা দিগ্ দিগন্তরে;
ঢালিয়া আনন্দ স্রোত অজস্র ধারায়
রাজ পথে; প্রবেশিল বীর অহঙ্কারে,
দিগ্বিজয়ী বীরবর রোম রাজধানী।

সতী সহধর্ম্মিণীর স্বপ্ন উপেক্ষিয়া
চলিল সেনেট গৃহে,—হায়! জাল মুখে
প্রলোভনে মুগ্ধ ক্ষুব্ধ কেশরী যেমতি,
ক্ষুধার্ত্ত! তোমরা কেহে?(১) তোমরা দুজন
বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে? চৌষট্টী রৌরব
যেন ভাবিতেছ মনে? কণ্টক স্বরূপ
কেন সিজারের পথে, আছ দাঁড়াইয়া?
জান না সিজার আজি হইবে ভূপতি?
সরে যাও।—বীরবর সেনেট মন্দিরে

বসন রাশিতে বেষ্টিত করিয়া সিজারের নিমিত্ত উপঢৌকন বলিয়া তাঁহাকে গুপ্ত ভাবে সিজারের সমীপে লইয়া যায়।

(১) ব্রুটস এবং কেশিয়াস্।

প্রবেশি বসিল স্বর্ণ চারু সিংহাসনে;
"বিশ্বজয়ী মহারাজা সিজারের জয়!"
আনন্দে ধ্বনিল শত সহস্র জিহ্বায়;
আনন্দে রোমানি বাদ্য করিল সঞ্চার
নর রঙ্গে সেই ধ্বনি পূরিল গগন
সেই জয় জয় রবে; নামিতে লাগিল
রোম ইতিহাসে এই প্রথম মুকুট
সিজারের শিরোপরে, এণ্টনির করে।
ফুরাইল;—কি? সিজারের রাজ্যঅভিষেক?
কেন আনন্দের ধ্বনি থামিল হঠাৎ?
নিরবিল যন্ত্রিদল? কেন অকস্মাৎ
এই হাহাকার?—সখি দেখিনু সম্মুখে;
কি দেখিনু? ইহজন্মে ভুলিব না আর।
ভূপতিত, হা অদৃষ্ট! বীরেন্দ্র সিজার!
কোথায় মুকুট? সখি! বক্ষে তরবার!"(১)
কণ্টকিল রমণীর কম কলেবর;
বিস্ফারিল নেত্রদ্বয়; সহিল না আর
অবলা হৃদয়ে, মূর্চ্ছা হইল রমণী—।
সুগন্ধ তুষার বারি, নয়নে, বদনে,
তুষার উরস শ্বেতে, সহচরী দ্বয়,
বরষিল, কিছু-ক্ষণ পরে রূপসীর
অচল হৃদয় যন্ত্র, জীবন পবন
স্পর্শে চলিল আবার; খুলিল নয়ন,—
প্রভাতে দক্ষিণানীলে কোমল পরশে,
উন্মেষিল যেন ধীরে কমলের দল।

(১) রোমরাজ্যে ইতিপূর্ব্বে রাজ-তন্ত্র শাসন ছিল না, সুতরাং রাজাও কেহ ছিল না। সিজারই প্রথম রাজ উপাধি গ্রহণ করিতে উদ্যোগ করেন; এই কারণে কতিপয় ষড়যন্ত্রী তাঁহাকে অভিষেকের দিবস বধ করেন। ইহাদের মধ্যে ব্রুটস্ এবং কেশিয়াস প্রধানছিলেন।

অর্দ্ধ উন্মীলিত নেত্রে, এক দৃষ্টে চাহি
কক্ষে বিলম্বিত এক চারু চিত্র পানে,
বলিতেলাগিল বামা—"ওই, সহচরি!
ওই যে দেখিছ—চিত্র,—নিসর্গ দর্পণ!—
অপূর্ব্ব—অঙ্কিত!—ওই দেখ ওই,
'চিদনস' (১) স্রোতে ওই প্রমোদ তরণী
ভাসিতেছে, নাচিতেছে বারিবিহারিণী,
হাসিতেছে, জ্বলিতেছে, পশ্চিম তপনে,
প্রতিবিম্বে ঝলসিয়া তরল সলিল।
ময়ূর ময়ূরী প্রেমে মুখে মুখ দিয়া,
বঙ্কিম গ্রীবায় ভাসে তরী পুরোভাগে;
চন্দ্রককলাপ রাশি—নয়ন রঞ্জন!—
চারু চন্দ্রাতপরূপে শোভিছে পশ্চাতে।
তাহার ছায়ায় বসি কর্ণিকা রূপসী;
নাচে স্বর্ণ-কর্ণ, বদ্ধ কুসুম মালায়
কুসুম কোমল করে। বসন্ত রঙ্গের
নাচিতেছে সুবাসিত সুন্দর কেতন,
সৌরভে মোহিত—মৃদু—অনীল চুম্বনে।
তরণীর মধ্য দেশে, সুবর্ণ খচিত
চন্দ্রাতপ তলে, স্বর্ণ-কমল আসনে,
বারুণী রূপিণী—ওই তরণী ঈশ্বরী;
আপনার রূপে যেন আপনি বিভোর!
দুই পাশে সুকুমার সহচর চয়
দাঁড়ায়ে মন্মথ বেশে—সস্মিত বদন!—
ব্যজনিছে ধীরে ধীরে বিচিত্র ব্যজনে।
কিন্তু সে অনীলে কই যুড়াবে বামায়,
বরং হইতেছিল কোমল পরশে,

(১) চিদনস নামক নদ—এসিয়া মাইনরে? এণ্টনির আজ্ঞা মতে ক্লিওপেট্রা তাহার সঙ্গে 'টারসাসে' সাক্ষাৎ করিতে যান।

কাম লালসায় উষ্ণ কপোল যুগল!
সম্মুখে অঙ্গনাগণ—অনঙ্গ মোহিনী!—
কোমল মদনোন্মাদী—সঙ্গীত তরঙ্গ
বর্ষিতেছে নানা যন্ত্রে; তালে তালে তার
পড়িছে রজত দাঁড় রজত সলিলে,—
তরণী সুন্দরী—ভুজ মৃণালেতে যেন
আলিঙ্গিছে প্রেমাহ্লাদে নদ 'চিদ নসে!'
সে সুখ পরশে নাচি স্রোত হিল্লোলিয়া,
প্রেম-মুগ্ধ ছুটিতেছে—তরণী পশ্চাতে;
নাচিছে তরণী;—মরি! সেই নৃত্য, সেই
সলিলের ক্রীড়া, সখি! দেখ চিত্রকর
চিত্রিয়াছে কি কৌশলে! নাচিতে নাচিতে
চুম্বিয়া সরিৎ বক্ষ, কহি কানে কানে
অস্ফুট প্রণয় কথা তর তর স্বরে,
চলেছে রঙ্গিণী ওই,—আশ্চর্য্য অদৃশ্য
সৌরভে করিয়া, মরি! ইন্দ্রিয় অবশ।
নগর, সজীব দীর্ঘ-দর্শক-মালায়,
সাজায়েছে দুই তীর। উচ্চ সিংহাসনে
অদূরে নগরে বসি—একাকী এণ্টনি
ডাকিছে অস্ফুট সিসে অপহৃত মন।
কিন্তু সখি! তৃষ্ণাতুর সহস্র নয়ন,
যে রূপ সুধাংশু অংশু করিতেছে পান
কে ওই রমণী,—সর্ব্বদর্শক-দর্শন?
ক্লিওপেট্রা? আমি? না, না, সখি! অসম্ভব!
সেই যদি ক্লিওপেট্রা, আমি তবে নহি;
আমি যদি ক্লিওপেট্রা,—তরী বিহারিণী,
ওই চিত্র নহে সখি! আমি দুঃখিনীর।
সেই মুখে হাসি রাশি, এ মুখে বিষাদ;
সে হৃদয়ে সুখ, সখি! এ হৃদয়ে শোক;
সে যে ভাসিতেছে সুখে প্রণয় সলিলে,
আমি ডুবিয়াছি হায়! নিরাশ সাগরে।
যেই মনোহর বেশ, ওই চিত্রে, সখি!
শোভিতেছে মরি! যেন শারদ কৌমুদী
বেষ্টিয়া কুসুম বন; আজিও সে বেশে
সজ্জিত এ বপু মম; কিন্তু সহচরি!
সেই শোভা—এই শোভা—কতই অন্তর!
আজি সেই বেশ, স্বর্ণ-হীরক খচিত,
নিবিড় তমিস্র যেন সমাধি বেষ্টিয়া।
সে দিন প্রেমের শুক্ল দ্বিতীয়া আমার,
আজি হায় নিরাশার কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী!"

নীরবিল ধীরে বামা;—মধুর বাঁশরী
পাইয়া বিষাদ তান, নীরবে যেমতি।
স্থির নেত্রে, কিছুক্ষণ চাহি—শূন্যপানে,
বলিতে লাগিল পুনঃ ইন্দীবরাননা।
"চলিল তরণী বেগে, চলিলাম আমি
ভেটিতে এণ্টনি; সখি! করিতে অর্পণ
বালিকার চিত্ত চোরে, যুবতী যৌবন।
যত অগ্রসর তরী হতেছিল বেগে
ততই হইতেছিল মানস আমার
সঙ্কোচিত;—নির্ঝরিণী মুখে যথা নদ
চিদনস। হায়! সখি. ভাবিতেছিলাম
কি আছে অদৃষ্টে মম,—প্রেম সিংহাসন,
কিম্বা—রোম'কারাগার! দেখিতে দেখিতে
সঙ্কুচিত আশা স্রোত প্রণয় নির্ঝরে
উত্তরিল, কিন্তু সখি! সেই সংমিলনে
উথলিল যেই চল প্রেম প্রস্রবনে—
হৃদয় প্লাবিনী!—সেই সলিল প্রবাহে
ভেসে গেল মম কুল, শীল, লজ্জা, ভয়,
ভেসে গেল সেই বেগে, ভূত ভবিষ্যত,
বর্ত্তমান উভয়ের; হইল চঞ্চল
বেগে, রোম, মিশরের রাজ্য সিংহাসন;

ভেসে গেল—সেই স্রোতে সপত্নী সিল্‌ভিয়া'[১]
ভাসিয়া ভাসিয়া সেই প্রণয় প্লাবনে
আসিলাম মিশরেতে, প্লাবন প্রবাহ
সখি! মিশিল সাগরে। স্বজনি! তখন
সকলি—অনন্ত! হায়, অনন্ত প্রেমের;
অনন্ত লহরী লীলা! অনন্ত আমোদ
বিরাজিত নিরন্তর অধরে নয়নে!
অনন্ত, অতৃপ্ত সুখ, যুগল হৃদয়ে!
ভাবিলাম মনে,—প্রেম, সুখ, রাজ্য, ধন,
প্রেমিক জীবন হায়! অনন্ত সকল।
যে কাম-সরসী সখি! করিনু নির্ম্মাণ,
যত পান করি, বাড়ে প্রণয় পিপাসা;—
অনন্ত পিপাসাতুর নায়ক আমার!
ঢালিয়া দিলাম তাহে, জীবন, যৌবন
মম; ঝাঁপ দিল রাজহংস উন্মত্তের
প্রায়,—মদন-বিহ্বল! সেই সরোবরে
কভু মৃণালিনী আমি, সখা মধুকর;
আমি মরালিনী, সখা মরাল সুন্দর।
কখন মৃণাল আমি অদৃশ্য সলিলে,—
সখা মদমত্তকরি; সলিলের তলে
কভু আমি মীনেশ্বরী, সখা মীনপতি;—
অধিপতি ক্লিওপেট্রা-কাম-সরসীর!
এই রূপে, এই সুখে, গেল দিন, গেল
মাস, চলিল বৎসর, বিদ্যুতের স্কন্ধে,—
অনঙ্গ বিলাসে, সুরা, সঙ্গীতে বিহ্বল!

ক্রমশঃ।

[১] এণ্টনির প্রথম পত্নী।

হরিহর বাবু।

হরিহর বাবু বড়ই রাশ্‌ভারি লোক; কার সাধ্য যে তাঁর সম্মুখে মুখ তুলে কথা কয়? তাঁহার ভয়ে তাঁহার পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই আপনাপন দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করে। তিনি যে পল্লীতে বাস করেন, সেখানে কোথাও কুক্রিয়াসক্ত লোকদিগের প্রশ্রয় পাইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার দৃষ্টি সকল দিকেই আছে অথচ সহসা কোন কথার উচ্চবাচ্য নাই। অকস্মাৎ সম্মুখে কিছু পড়িলে দেখেও যেন দেখেন না। পথে চলিবার সময় বালকেরা খেলা করিতে করিতে অনাবিষ্টতাবশতঃ তাঁহার গতিরোধ করিলে একপার্শ্ব দিয়া যান, যেন টেরই পান নাই। বিচক্ষণও তেমনি; একটি কথা উপস্থিত হইলে তিনবৎসর পরে কি ঘটনা হইবে তাহা বলিয়া দিতে পারেন; তাহার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি সমস্তই একবারে দেখিতে পান এবং তোমার মুখে দুচারিটি কথা শুনিয়াই তোমার মনের সকল কথা বুঝিয়া লন। যেমন ধার তেমনি ভার; লোকে তাঁহাকে এমনি মান্য করে যে, তাঁহার কথা যেন বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করে। তুমি তিন মাস বুঝাইয়া যাহার মনের দ্বিধা দূর করিতে পারিবে না, প্রস্তাবিত বিষয়ে হরিহর বাবুর অভিপ্রায় ইঙ্গিতের দ্বারা ব্যক্ত হইলেই সে ব্যক্তি অবিচলিত চিত্তে তদনুসারে কার্য্য করিবে।

কিন্তু হরিহর বাবু যাহার প্রতি বিমুখ হন, তাহার নিস্কৃতি নাই। একবার শ্যামসুন্দর বসু নামক এক ব্যক্তি তাঁহার কোপে পড়িয়াছিল। শ্যামসুন্দর কিছু দিন তাঁহার সহিত বিরোধ করিয়া নিতান্ত দায়গ্রস্ত হইয়া পড়িল, মোকদ্দামা মামলাতে বিব্রত, অনেকের নিকটেই ঋণগ্রস্ত; পরিশেষে এক ব্যক্তি তাহার নামে দস্তকের পেয়াদা বাহির করিল; পরদিন প্রাতে ৫০০ পাঁচশত টাকা দিতে না পারিলে পিয়াদা আসিয়া গ্রেপ্তার করিবে। সমস্ত দিন শ্যামসুন্দর লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া কোথাও টাকা সংগ্রহ করিতে পারিল না, অবশেষে রাত্রি একটার সময় হরিহর বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত; হরিহর বাবু তখন শয়ন করিয়াছেন, ভৃত্য এক জন সংবাদ দিবার নিমিত্ত দ্বারে আঘাত করিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন "কে, রে, রামা?—শ্যামসুন্দর এসেছে বুঝি?" "আজ্ঞা হাঁ" অনন্তর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া ভৃত্যকে দীপ লইয়া যাইতে বলিলেন, এবং সেই অন্ধকার ঘরে শ্যামসুন্দরকে আনিতে বলিয়া যে দ্বারে সে প্রবেশ করিবে সেই দিকে পিঠ ফিরাইয়া বসিলেন।

শ্যামসুন্দর স্বভাবতঃ মনের যন্ত্রণায় নিতান্তই পীড়িত, তাহাতে অন্ধকার ঘরে আহুত হইয়া একবারে হতবুদ্ধি হইল। কিন্তু উপায় নাই। আত্মরক্ষার জন্য

চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। "রামে মারিলেও মরিব রাবণে মারিলেও মরিব। মস্তকের পিয়াদা রাস্তা দিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে ইহা অপেক্ষা হরিহর বাবু যদি অস্ত্রাঘাত করেন এবং তাহাতে প্রাণবিয়োগ হয় সেও ভাল।" হরিহর বাবুর সহিত এতকাল যে শত্রুতা করিয়াছিল সমস্তই মুহূর্ত্তেকমধ্যে তাহার স্মরণ হইল; এবং এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে শ্যামসুন্দর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। হরিহর বাবু যেমন ফিরিয়া বসিয়াছিলেন সেই অবস্থায় বলিলেন "আমার সম্মুখে আসিস্ না; সব কথা বুঝেছি এই নে টাকা ধর্ আমার কাছে মুখ দেখাস্ না।" শ্যামসুন্দর এরূপ অনুগ্রহের কথা স্বপ্নেও ভাবে নাই। ভাবিয়াছিল হরিহর বাবুর সহিত বিরোধ করাতেই এই বিপদ্ ঘটিয়াছে এবং তিনি কটাক্ষপাত করিলেই নিষ্কৃতি পাইব; কিন্তু টাকার তোড়া মাটীতে পড়িল সেই শব্দে অবাক্ হইয়া রহিল। হরিহর বাবু চলিয়া যান, তাঁহার পদশব্দে শ্যামসুন্দরের চৈতন্য হইল; তখন সে কাঁদিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, "আমার ঘাট হয়েছে নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আপনার মত লোকের বিরুদ্ধাচরণ করিছি; যা কল্লেন এতেতো আমি কেনা রইলুম কিন্তু বলুন যে আমার প্রতি প্রসন্ন হোলেন।" হরিহর বাবু পা ছাড়াইয়া দেয়ালের পার্শ্বে শ্যামসুন্দরের দিকে পিঠ ফিরাইয়া থাকিলেন। শ্যামসুন্দর মেজেয় বসিয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বিস্তর কাকুতি মিনতি করিল, হরিহর বাবু চুপ করিয়া থাকিলেন; পরে শ্যামসুন্দর ক্ষান্ত হইলে বলিলেন, "তা হবে না, আমার স্মরণাপন্ন হলি, আমি তোকে রক্ষা কল্লুম কিন্তু তোর মুখ কখনই দেখ্ব না আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হবার নয়।" এই বলিয়া অবিলম্বে চলিয়া গেলেন।

গল্পটি উপন্যাস মাত্র। কিন্তু শুনিলে অনেক বাঙ্গালির মনে এই হরিহরের নানা প্রকার প্রতিমূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইবেক। মনে হইবে যে, অমুক এইরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা দূরদর্শী ছিলেন, অমুক তাঁহার ন্যায় সর্ব্বদর্শী। কেহ আশ্রিতের প্রতি দয়াতে বা শত্রুশাসনে তাঁহার অনুরূপ আর কেহ বা অনর্থক প্রতিজ্ঞাপালনে অথবা কেবল বাক্ সম্বরণে এতাদৃশ প্রকৃতির অনুকরণকারী। এইরূপ গুণ কতক কতক থাকিলে আমাদিগের সমাজস্থ লোক রাশভারি বলিয়া গণ্য হয় এবং "রাশ ভারি" প্রকৃতি প্রায় সকলেরই প্রশংসার স্থল।

বুদ্ধির অপরিপক্ব অবস্থাতে অনুচিকীর্ষা বৃত্তিই শিক্ষালাভের প্রধান উপায় কিন্তু সকল বিষয়ের দোষ গুণ বিশ্লেষ করিতে না পারিলে বুদ্ধি কখনই পরিণত হয় না। ইহাই সমালোচনার মহোপকার। সমালোচনা ভ্রান্ত হইলেও সমালোচকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্রোতৃ বা পাঠকবর্গ বিচার কার্য্যে নিযুক্ত হন, সুতরাং সমালোচিত বিষয়ের যথাযোগ্য বিচার

না হইলেও শুদ্ধ বিচার কার্য্যের দ্বারাই বুদ্ধির বিশিষ্টরূপ চালনা হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রোতৃবর্গ যদি কেবল মনের মত কথা অন্বেষণ করেন তবে সমালোচনাতে কেবল মতভেদই বৃদ্ধি হয়।

হরিহর বাবুর সুখ্যাতি সকলেই করে, এই ভাবিয়া যদি লোকে কেবল তাঁহার অনুকরণ করিতেই চেষ্টা করে তবে তাহারা কিয়দংশে উন্নতিলাভ করিতে পারে বটে। বালকেরাও প্রথমতঃ এই প্রণালীতে শিক্ষা করিয়া থাকে এবং পশুগণ ইহার অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু এতাদৃশ অনুকরণ সম্যক্‌রূপে সুসিদ্ধ হইবার নহে। যাহাদের তাদৃশ তেজ নাই, যাহারা তাঁহার ন্যায় ঠেকে নাই তাহারা কখনই হরিহর বাবুর প্রকৃতি পাইবে না। কিন্তু এমনও লোক আছে যাহাদিগের বুদ্ধি ও জীবনযাত্রা কথঞ্চিৎরূপে হরিহর বাবুর সদৃশ। তাহারা তাঁহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিলে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। কিন্তু ইহা কি সর্ব্বতোভাবে মাঙ্গলিক? আদর্শের যদি দোষ থাকে এবং তাহা দোষ বলিয়া অনুভূত না হয় তবে অনুকরণ হইতে ক্রমশঃ কেবল দোষেরই বৃদ্ধি পায়। অতএব বিচারপূর্ব্বক অনুকরণ করা প্রয়োজন। হরিহর বাবুর দোষ গুণ বিচার করিতে হইলে তদপেক্ষা নির্দ্দোষ পাত্র কাহাকে আদর্শ করিতে হয়। অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ কেন সম্পূর্ণ দোষাভাব অন্বেষণ করাই ভাল। কিন্তু মানব শরীরে এরূপ কল্পনা করা অসঙ্গত। অতএব লোকচরিত্রে কি হইলে দোষ হয় কি হইলে গুণ হয় তাহা বিশ্লেষ ক্রিয়ার দ্বারা স্থির করণান্তর একের অভাব অপরের পূর্ণতা অনুমান করিয়া লইতে হইবেক। আমরা লোকের দোষ গুণ বিচার কালে ব্যক্তিবিশেষের সহিত তুলনা করিয়া থাকি; ইহা নিষিদ্ধ। কেন না এরূপ তুলনা দ্বারা কেবল এই মীমাংসা হইতে পারে যে, অমুক আমার মনের মত লোক এবং অমুককে আমি দেখিতে পারি না। কিন্তু তোমার আমার প্রসন্নতাতেতো কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কাহার কি দোষ কাহার কি গুণ তাহাই স্থির করা আবশ্যক।

এতদ্দেশের লোকাচার মতে চপলতা নিন্দনীয় এবং গাম্ভীর্য্য প্রশংসার স্থল।—কেন এরূপ হইল?—একথা বলিলেই বিপাক। কেহ মনে করেন ইহা স্বতঃসিদ্ধ।—কেহ বলেন চপলতা বালকস্বভাব; কিন্তু তাহাতেই দোষ কি? বালকেরা ক্ষুদ্র এবং অল্প বুদ্ধি; তবে বালক প্রকৃতির বৈপরীত্যই কি বুদ্ধিমত্তার আদি লক্ষণ?—কেহ বলিবেন মুনি ঋষিরা গম্ভীর প্রকৃতি ছিলেন। ইহা লোকদৃষ্টান্তমাত্র; এক হরিহর বাবুর দোষ গুণ বিচার জন্য যেন আর কতকগুলি হরিহর সংগৃহীত হইল। এ প্রণালীও অসিদ্ধ।—কেহ বলিবেন শাস্ত্রের বচন আছে। এবার হারিলাম। শাস্ত্র সমগ্র অতি বিজ্ঞলোকের আদেশ এবং সর্ব্বোতোভাবে আদরণীয় কিন্তু শাস্ত্রও বিচারাধীন। সমালোচক লেখক

অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও বিচারাধিকারী বটে।

আমরা বলি গাম্ভীর্য্য বিবেচনার সহচর, চপলতা বিবেচনার বিঘ্নকারী, এই জন্য গাম্ভীর্য্য প্রশংসনীয়। মনুষ্য, জন সমাজে থাকিয়া স্বতন্ত্র হইতে পারেন না; এইকারণে বিবেক ত্যাগের সাবকাশ নাই। যদি তোমার বিবেক না থাকে তবে যত লোক কোন প্রকারে তোমাতে আশ্রয় করিতেছে তাহারা সকলেই তোমার অবিবেচনার ফলভোগী হইবেক। যদি বিবেককে তুচ্ছ কর তবে এই সকল লোকের সহিত তোমার বিচ্ছেদ হইবে; অর্থাৎ একদিক্ ভাঙ্গিয়া গেল, রাশির ভার খর্ব্ব হইল। আর সেই সমস্ত লোকের অবস্থা চিন্তনীয় বলিয়া স্বীকার কর; অমনি চিন্তাস্রোত বৃদ্ধি হইবে; তোমার আপন কার্য্য লইয়া মনে মনে সকলের নিকটে জবাবদিহি করিতে হইবে। ফলতঃ যাহাকে মন হইতে ছাড়িবে তাহার ভার কমিয়া যাইবে; যাহার প্রতি মনে মনে দৃষ্টিপাত করিবে তাহার ভার তোমার উপরে আসিয়া বর্ত্তিবে। "ধারে কাটে আর ভারে কাটে।" প্রবাদ বাক্যটী অপ্রকৃত নহে; অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির মনে এই অভিমান সূচক আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া থাকে যে, আমার কথা সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত হইলেও অমুক বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তির কথার "ভার" অপেক্ষাকৃত অধিক। এই ভার সহজে হয় না। লোকের ভার বহন করিতে হয় তবেই "ভারে কাটে।" এ ভার চিন্তার অঙ্গ, মনে মনে বহিতে হয়। চিন্তার আবির্ভাবে চপলতা দূরে যায়; বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, যুবা বার্দ্ধক্য লাভ করে এবং নারী পুরুষ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোক মাত্রেই তরল স্বভাব। কেননা পুরুষেরাই স্ত্রীদিগের ভার বহন করেন। আবার এতদ্দেশের স্ত্রীজাতি অধিকতর তরলপ্রকৃতি;—স্বতন্ত্রতাতেও ইহারা অন্য দেশস্থ স্ত্রীলোক অপেক্ষা নিকৃষ্ট। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা মীমাংসা কিরূপ পদার্থ তাহা কখনই জানে না। বস্তুতঃ চিন্তা বা মীমাংসা করিবার ভারই পায় না। সুতরাং স্ত্রীলোকদিগের গাম্ভীর্য্য ও বিচারশক্তি উভয়ের কিছুই নাই। এবং চপলতাই তাহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কথা না কহিলেই যে গম্ভীর হয় এমন নহে। নতুবা বঙ্গীয় নববধূগণ গাম্ভীর্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং নিদ্রা বিচার কার্য্যের অনন্যোপায়।

গাম্ভীর্য্য রাজলক্ষণ, কেন না রাজা প্রজার ভারবহন করেন। রাজা যত আপনার ভার বৃদ্ধি করেন, প্রজার ভার তত লঘু হইয়া যায়। এইজন্য সাধারণ তন্ত্রে প্রজাবর্গের এত গৌরব। রাজ্য পরাধীন হইলে প্রজাবর্গ রাজকার্য্য হইতে অপসারিত হইয়া তৎকারণে মতিচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। বাঙ্গালিরা সাহেবদিগের তুলনায় আপনাদিগকে গম্ভীরপ্রকৃতি মনে করিয়া থাকেন। ইহা প্রকাণ্ড

ভুল। রাজনীতিঘটিত বিষয়ে বাঙ্গালিদিগের মতামত নাই; কেবল অন্নবস্ত্র বা অন্যান্য স্বার্থ সম্বন্ধীয় চিন্তাতেই ইঁহারা মগ্ন। গাম্ভীর্য্যও তদনুরূপ। রাজ্য পুড়িয়া ছার খার হইয়া যায় কিন্তু কেবল কৌপীনখণ্ড দগ্ধ হইবে সেই ভয়ে গবাক্ষের দিকে ধাবিত। ইংরাজ স্বার্থসাধনে অনেক সময়ে যথেচ্ছাচারী হইয়া চাপল্য প্রদর্শন করেন। কিন্তু যখন ভারপ্রাপ্ত হইয়া কতকগুলি লোক সমবেত হয়েন তখন চপলতার লেশ থাকে না। বিরোধ থাকুক, বিষম্বাদ হউক, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সকলেই একাগ্রচিত্ত, সকলেই চিন্তায় মগ্ন, সকলেই ভারাক্রান্ত। বাঙ্গালিরা পৃথগ্‌ভাবে বরং ভাল কিন্তু একত্রিত হইলে হয়, সঙ্কোচপ্রিয়, অথবা ভবিষ্যতে দোষস্পৃষ্ট হইবার শঙ্কাতে বিচলিত অথবা ভার ত্যাগে অভিলাষী কিম্বা অন্যের বাসনা ও পরামর্শের প্রতি অমনোযোগী হন; নতুবা, অপরিণামদর্শী, বাচাল, কলহপ্রিয়, স্বার্থাভিলাষী এবং জেদে অভিভূত হইয়া পড়েন। এগুলি প্রকৃত গাম্ভীর্য্যের লক্ষণ বা প্রশংসার স্থল নহে। ফরাসি জাতি সভ্যতাতে ইংরাজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে কিন্তু রাজ্য রক্ষা করিতে অপেক্ষাকৃত অপটু। ইংরাজেরা বলেন ফরাসিরা চপলপ্রকৃতি; ফলতঃ তাঁহারা যে রাজকার্য্য নির্ব্বাহকালে পরের বিবেচনা প্রণিধান করিতে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়েন এ কথা আমাদিগেরও মনে হয়। তাঁহাদিগের আচরণ দেখিলে বোধ হয় সকলেই যেন আপনার মনের চিন্তাতেই উন্মত্ত আর কিছুর প্রতিই দৃক্‌পাত নাই। সুতরাং ঐক্যের সম্ভাবনা কি। ছোট মুখে বড় কথা বলিতে পাইলে বলা যায় যে, বাঙ্গালিরা এই বিষয়ে কথঞ্চিৎ ফরাসি জাতির সদৃশ।

হরিহর বাবু শ্যামসুন্দরকে মনে মনে মার্জ্জনা করিয়াও যে তাহার দিকে মুখ ফিরাইলেন না, এটি তাঁহার জেদ। প্রতিজ্ঞাপালন অতি প্রধান ধর্ম্ম কিন্তু তাহার নিমিত্ত দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হওয়া উচিত নহে। শ্যামসুন্দরকে যদি মনে মনে মার্জ্জনা করিয়া থাকেন তবে তাহার মুখ দেখিতে দোষ কি? যদি তখনও তাহার প্রতি আক্রোশ সম্পূর্ণরূপে না গিয়া থাকে, তথাচ ক্রোধশান্তির চেষ্টা করাই ভাল। প্রতিজ্ঞারক্ষা ভ্রমে সঞ্চিত ক্রোধ প্রতিপালন করা সর্ব্বপ্রকারেই ক্ষতিজনক। জেদ স্বভাবতঃ গুণও নহে দোষও নহে। ইহাতে যেমন সৎকর্ম্ম তেমনি কুকর্ম্ম বৃদ্ধিরও ক্ষমতা জন্মে। যে ব্যক্তি প্রশংসনীয় কার্য্যে জেদ করেন তিনিই প্রশংসনীয় কিন্তু কুকর্ম্মে জেদ অজ্ঞানকৃত হইলেও অন্ততঃ অনিন্দনীয় এইপর্য্যন্ত বলা যায়। কিন্তু তাহতেত ক্ষতির কিছুই লাঘব হয় না। তরবারি দ্বারা শত্রু মিত্র উভয়েই বিনষ্ট হইতে পারে কিন্তু তাহাতে তরবারের কোন মহত্ত্ব দৃষ্ট হয় না। আওরঙ্গজেব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ফিরোজ শা কোমল প্রকৃতি ছিলেন; লোকে আওরঙ্গজেবেরই প্রশংসা করে। আজি কালি

বিস্‌মার্কের নামে কজন বাহবা না দিয়া থাকিতে পারেন? এক সময়ে প্রথম নেপোলিয়ানও এইরূপে জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তাঁহার প্রাধান্য কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে? তেজ দেখিলেই আমরা স্বভাবতঃ চমৎকৃত হইয়া থাকি। ইহা পতঙ্গপ্রকৃতি। রাশভারি লোকের জেদ কিছুই নয়; পরোপকারই তাঁহাদের মহত্ত্বের প্রকৃত লক্ষণ।

রাশভারি লোক কর্তৃত্ব ভালবাসে। সেই উদ্দেশ্যেই হউক বা চরিত্রগত গুণ হইতেই হউক পরোপকার করা ইহাঁদিগের একটি বিশেষ লক্ষণ। আমরা যেমন দূরদর্শিতা ও সর্ব্বদর্শিতার অল্পতা হেতুক আপনাদিগের গাম্ভীর্য্যের স্থল সংকীর্ণ করিয়া লইয়াছি, পরোপকার এবং তাহার আনুষঙ্গিক কর্তৃত্বপ্রিয়তা বিষয়েও আমাদিগের দৃষ্টি ও প্রয়াস তদনুরূপ। জমীদার প্রজাগণের উপরে কর্তৃত্ব করিতে ভাল বাসেন। হাকিমেরা আমলা উকীল ও আহেলা মামলার উপর কর্তৃত্বাকাঙ্ক্ষা করেন। হেডমাষ্টার, হেডকেরাণী অধীন কর্ম্মচারিগণের উপর ধুমধাম করেন। এবং সংসর্গগুণে ভারতকলঙ্কিত ইংরাজ কালমুখ দেখিলেই কর্তৃত্ব করিতে ইচ্ছা করেন। এবং হরিহর বাবুর ন্যায় রাশভারি লোকেরা যাহার পরিচয় পান তাহাকেই আজ্ঞাবহ করিব মনে করেন। আজ্ঞা নানাবিধ। তন্মধ্যে শুভঙ্করের আজ্ঞাই সর্ব্বপ্রধান। এতাদৃশ আজ্ঞা দানেচ্ছা বড় একটা দেখা যায় না।

যেমন লক্ষ্মীর অনেক প্রকার বরযাত্রী থাকে, উন্নতির পক্ষে কৃত্রিমতাও সেইরূপ একটি সহচর। উন্নতির সৌন্দর্য্য আছে। যেমন কদাকার ব্যক্তি সৌন্দর্য্যের গুণে মোহিত হইয়া কৃত্রিম রূপ ধারণ করিতে চেষ্টা করে। তেমনি সভ্য সমাজে স্বার্থপর ব্যক্তিগণ পরের নিকট চিত্ত-সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিবার জন্য কৃত্রিম দয়া অভ্যাস করে। এই কৃত্রিমতা লোকের ক্ষতিজনক না হইলে, শুদ্ধ ইহার স্বার্থপরতার জন্য কেহ বড় বিরক্ত হয় না। রাশভারি লোকেরা আপনাদিগের মনোগত ভাব পরিষ্কার করিয়া না বুঝিলেও এই নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে; লোকের প্রতি আন্তরিক দয়া থাকুক বা না থাকুক দয়ার মাহাত্ম্য জানিয়া পরোপকারে প্রবৃত্ত হয়। প্রশংসাকাঙ্ক্ষীরাও ঠিক্ এই প্রণালীতে কার্য্য করিয়া থাকে। তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে একজন প্রশংসা এবং আর একজন কর্তৃত্ব অভিলাষ করে। আর আশাভঙ্গ হইলে নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসাভিলাষী স্ত্রীলোকের ন্যায় অভিমান করে ও কর্তৃত্বাভিলাষী বৈরনির্য্যাতনে সচেষ্ট হয়। অভিমান, যে মনে করে তাহারই পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক, অন্যের পক্ষে উপহাসস্থল। বৈরনির্য্যাতন অপেক্ষাকৃত গুরুতর দোষ। কিন্তু কর্তৃত্বাভিলাষী এবং রাশভারি লোকেরই সম্মান সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ পুরুষের চক্ষে অভিমান অপেক্ষা বৈরনির্য্যাতনই ভাল লাগে। কর্তৃত্বাভিলাষ এবং প্রশংসাভি-

লাষ উভয়ই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি। কিন্তু প্রথমটি বাহুল্য পরিমাণে স্বার্থপর; অনেকে এই কথার স্মৃতি অভাবে পৌরুষ বলিয়া ইহার গৌরব করেন। রাশভারি লোকের দয়া সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয় নহে। কেন না স্বার্থপর হইলেও ইহা অনেকস্থলে বিশুদ্ধরূপে পরের হিতজনক হয়। লোকে এই স্থূল কথাটি বিলক্ষণ বুঝিয়াছে এবং তৎকারণে রাশভারি লোকের আজ্ঞাপালন করিয়া থাকে। নতুবা কর্ত্তৃত্বাভিলাষিগণের উদ্দেশ্য দেখিয়া যদি সকলেই তাহাদিগের প্রতি বিমুখ হইত তাহা হইলে এই শ্রেণীস্থ লোকের জীবন ও কার্য্যক্ষমতা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ব্যর্থ হইত এবং আজি পর্য্যন্ত জগতের যত উন্নতি হইয়াছে তাহার অনেকাংশ অনায়ত্ত হইয়া থাকিত। ফলতঃ রাশভারি লোকেরা যে সকল মঙ্গল ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন তজ্জন্য উপকৃত ব্যক্তিদিগের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য কিন্তু কর্ত্তৃত্বাভিলাষীদিগের চরিত্র অনুকরণ করা উচিত নহে।

যেমন কর্ত্তৃত্বাভিলাষের প্রকাশ্য ফল মাঙ্গলিক হইলেও উৎপত্তি নিন্দনীয়, আত্মাবহন প্রকৃতির আদি এবং অন্তও তদনুরূপ। আত্মাবহন অজ্ঞতা এবং তেজক্ষীণতা হইতে উৎপন্ন হয়। অজ্ঞতার অনেক দোষ এবং তেজকে যত্নপূর্ব্বক সৎপথে পরিবর্দ্ধিত করাই আবশ্যক। কর্ত্তৃত্বাভিলাষীরা যেমন ছাগলের নিকটে শার্দ্দূলের ন্যায় আচরণ করে তেমনি সিংহের সমীপে শৃগালবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে। এই ধর্ম্ম বাঙ্গালি জাতিতে প্রকৃষ্টরূপে লক্ষিত হয়। আমাদিগের জ্ঞান ও দৃষ্টি যেমন, উচ্চাভিলাষও তদ্রূপ। উভয়ই "বিঘত প্রমাণ।" যে উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া বিশ্বামিত্র ব্রহ্মণ্যলাভ করিয়াছিলেন এবং ব্যাস শিবের সমতুল্য হইতে প্রয়াস করিয়াছিলেন তাহাকে আমরা বামনের চন্দ্রস্পর্শ আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ বলিয়া উপহাস, বা উপেক্ষা করিয়া থাকি এবং যে প্রতিজ্ঞার প্রভাবে পাণ্ডবগণ অর্জ্জুনের যুদ্ধবিদ্যাবৃদ্ধির প্রতীক্ষাতে এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন তাহার প্রতি আমরা মনোযোগ করি না কিন্তু ভীম যে বীভৎসের একশেষ করিয়া দুঃশাসনের রক্তপান করেন তাহাই আমাদিগের নিকটে প্রতিজ্ঞাপালনের দৃষ্টান্ত হইয়াছে। এই সংস্কার প্রযুক্তই হরিহর বাবু শ্যামসুন্দরের মুখ দেখিব না স্থির করিয়াছিলেন। বাঙ্গালিরা তর্কের বলে শ্বেতবর্ণকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারিলে, বিচারকের চক্ষে ধূলি নিঃক্ষেপ করিতে পারিলে এবং মনিবকে আপন মতে ঘুরাইতে পারিলে উচ্চাভিলাষ সর্ব্বোতোভাবে চরিতার্থ হইল বলিয়া বোধ করেন। এইরূপ অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত সৎপ্রকৃতি ব্যক্তিরাও জ্ঞানপূর্ব্বক কুতর্ক করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন না; এবং অনেকে মিথ্যাকথন পর্য্যন্তও স্বীকার করিয়া থাকেন। যাহাদিগের প্রসন্নতা ব্যতীত কার্য্যসিদ্ধি হয় না তাহাদিগের সমীপে

এইরূপ আচরণ আর যাহাদিগের প্রতি ভয় মৈত্র উভয়ই প্রদর্শিত হইতে পারে সেখানে কাল্পনিক ব্যবহার। ইহাই কর্ত্তৃত্বাভিলাষী বাঙ্গালির বীজমন্ত্র। ইহারা সময়ে২ অন্তরাত্মার নিকট সহস্র ধিক্কার সহ্য করিয়াও হীনবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের তোষামোদে প্রবৃত্ত হন! এই তাঁহাদিগের কর্ত্তৃত্বের পরাকাষ্ঠা। ফলতঃ যে কর্ত্তৃত্বে আপনার নিকটেই নতশির হইয়া থাকিতে হয় তাহার গৌরব কি?

রাশভারি লোকের - গুণ এই যে পরের মঙ্গল চিন্তা করিয়া থাকেন; চাপল্য বশতঃ কোন বিষয়ে উপেক্ষা করেন না। ইহারা বহুলোকের ভারবহন করেন। তাঁহাদিগের মনে যাহাই থাকুক কার্য্যে অনেকের হিতসাধন হয়। ভারবহনের মর্ম্ম—জবাবদিহি। যেসকল বিষয়ের ভার বহন করিতে হয় তাহার জবাবদিহি করা আবশ্যক। জবাবদিহি যে, কোন নির্দ্দিষ্ট লোকের নিকটেই করিতে হয় এমত নহে। আপনার মনে২ জবাব দিহি করার ন্যায় কঠিন কার্য্য নাই। জবাব দিহি প্রকৃত ভারিত্বের লক্ষণ কিন্তু সকল রাশভারি লোক যথাযোগ্য মতে জবাব দিহি করেন না। অনেকে কেবল কর্ত্তৃত্বাভিলাষী, স্বার্থপর এবং অতিশয় জেদপ্রিয়, তাঁহারা ইষ্টলাভের জন্য সকল কুকর্ম্মই করিতে পারেন। এতদ্দেশে রাশ ভারি লোকের দোষগুণের বিষয় প্রকৃত বিচার হয়না বলিয়াই তাঁহাদিগের এত সম্মান আর আড়ম্বর।

সাহসাঙ্ক চরিত।

সংস্কৃত ভাষায় দুই খানি কান্যকুব্জাধিপতি সাহসাঙ্ক নৃপতির জীবন বৃত্তান্ত ঘটিত গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। ইহার মধ্যে প্রথম খানি সাহসাঙ্ক চরিত ও শেষোক্ত খানি নব সাহসাঙ্ক চরিত নামে খ্যাত। সুবিখ্যাত কোষকার মহেশ্বর সাহসাঙ্ক চরিত রচয়িতা। এই গ্রন্থ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে কিন্তু বিশ্ব প্রকাশ নিঘণ্টুর প্রারম্ভে মহেশ্বর অন্যান্য কোষকারের বিষয় লিখিয়া আপন পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহেশ্বর লিখিয়াছেন যে, তিনি গাধিপুরেশ্বর সাহসাঙ্কের চিকিৎসক চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের বংশধর এবং তাঁহার পরিচয় অনুসারে ১০৩৩ শকে বর্ত্তমান ছিলেন: সুতরাং সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ উইলসন সাহেব যে তাঁহার ১১১১ খৃষ্টাব্দ সময় নিরূপণ করিয়াছেন তাহা ভ্রমপূর্ণ বোধ হইতেছে না। বিশ্বকোষের ৯ এবং ১০ শ্লোকে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, মহেশ্বর কৃষ্ণের পৌত্র। সাহসাঙ্কের অপর এক নাম বিক্রমাদিত্য, তিনি মহেশ্বরের মতে গাধিপুরাধিপতি। কেহ২ গাধিপুর গাজি-

পুরের সংস্কৃত নাম মনে করিয়া থাকেন কিন্তু সেটী তাঁহাদিগের ভ্রম। উহা কান্যকুব্জের অপর নাম মাত্র।* উইল্‌সন সাহেব বলেন যে হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামনির "নানার্থভাগ" বিশ্বকোষ হইতে সঙ্কলিত কিন্তু এ কথায় আমরা অনুমোদন করি না। সে যাহা হউক বিশ্বকোষ হইতে আমাদিগের মত পরিপোষক কবির জীবন বৃত্ত সম্বন্ধীয় বিবরণ ও গ্রন্থ প্রণয়নের অবতরণিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল॥

যথা

শ্রীসাহসাঙ্ক নৃপতেরনবদ্য বিদ্য বৈদ্যা-
অন্তরঙ্গ পদপদ্ধতিমেব বিভ্রৎ।
যশ্চংই চারু চরিতো হরিচন্দ্র নামাস্য
ব্যাখ্যায়া চরকতন্ত্র মলং চকার (৫)
আসীদসীম বসুধাধিপ বন্দনীয় স্তস্যান্বয়ে
সকল বৈদ্যকুলাবতংসঃ।
শক্রস্য দস্র ইব গাধিপুরাধিপস্য শ্রীকৃষ্ণ
ইত্য মল কীর্ত্তি-লতা-বিতানঃ (৬)
সংকল্প সংমিলদনল্প বিকল্প জল্প কল্পানলা-
কুলিত বাদিসহস্র সিন্ধুঃ।
তর্কত্রয় ত্রিনয়ন গণয়ন্তদীয়ো দামোদরঃ
সমস্তবস্তিষজাং বরেণ্যঃ (৭)
তস্মা ভবৎস্মুকুন্দারবাচো বাচস্পতিঃ
শ্রীললনা বিলাসী। সদ্বৈদ্য বিদ্যানলিনী
দিনেশঃ কৃষ্ণস্ততঃ
সৎকুমুদাকরেন্দুঃ।৮।
যস্তাত্মজঃ সকল বৈদ্যকতন্ত্র রত্ন রত্নাকর
শ্রীয়মবাপ্যচ কেশবোভূৎ।
কীর্ত্তির্নিকেতন মনিন্দ্যপদ প্রমাণ বাক্য
প্রপঞ্চ রচনা চতুরানন শ্রী।৯।
কৃষ্ণস্য তস্যাচ সুতঃ স্মিতপুণ্ডরীকদণ্ডাতপ
ত্রপ ভাগযশঃ পতাকঃ।
শ্রীব্রহ্মাইত্ব বিকল্পাম্বুমুখারবিন্দ সোল্লাস
ভাসিত রসার্দ্র সরস্বতীকঃ।১০।
তস্যাত্মজঃ সরস কৈরবকান্তকীর্ত্তিঃ
শ্রীমন্মহেশ্বর ইতি প্রথিতঃ কবীন্দ্রঃ।
অশেষ বাঙ্ময় মহার্ণব পার দৃশ্বাশব্দা-
গমাম্বুরুহষণ্ড রবির্বভূব।১১।
যঃ সাহসাঙ্ক চরিতাদি মহাপ্রবন্ধ নির্ম্মাণ
নৈপুণ্য গুণ পৌরবশ্রীঃ।
যো বৈদ্যকত্রয় সরোজ সরোজবন্ধু র্বন্ধুঃ
সতাং চ কবি কৈরব কাননেন্দুঃ।১২।
সেয়ং কৃতিস্তস্য মহেশ্বরস্য বৈদগ্ধসিন্ধোঃ
পুরুষোত্তমানাং।
দেদীপ্যতাং হৃৎকমলেষু নিত্য সাকল্প
সাকল্পিত কৌস্তভশ্রীঃ।১৩।
লব্ধৈঃ কথঞ্চিদভিজাত সুবর্ণকারলীলেন
কোষ শত বারিধি শব্দবর্য্যৈঃ।
বিশ্বপ্রকাশ ইতি কাঞ্চন বন্ধ শোভাং
বিভ্রন্ময়াত্র ঘটিতো মুখখণ্ড এষঃ।১৪
ফণীশ্বরোদীরিত শব্দকোষরত্নাকরা-
লোড়ন লালিতানাং।
সেব্যঃ কথং নৈষ সুবর্ণ শৈলো বিশ্ব
প্রকাশো বিবুধাধিপানাং।১৫।
ভোগীন্দ্র কাত্যায়ন সাহসাঙ্ক বাচস্পতি
ব্যাড়িপুরঃ সরাণাম্।

* প্রসিদ্ধ কোষকার হেমচন্দ্র "কান্যকুব্জং গাধিপুরং" ইত্যাদি ক্রমে কান্যকুব্জ নগরের পর্য্যায়ে 'গাধিপুর' শব্দ বলিয়াছেন। এইরূপ অন্যান্য কোষ এবং মহাভারতাদি গ্রন্থেও কথিত আছে।

সবিশ্বরূপামর মঙ্গলানাং শুভাঙ্ক বোপা-
লিত ভাগুবীণাং ।১৬।
কোষাবকাশ প্রকট প্রভাবসংভাবিতা-
নর্ঘগুণঃ স এষঃ।
সংপাদয়ন্তে স্যাতি বাঞ্ছিতার্থান্ কথং
ন চিন্তামণিতাং কবীনাং।১৭।
আমিত্র শৈল চরমাচল মেখলাদ্রি
কৈলাস ভূমিবয়াদয়দিহাস্তিকিঞ্চিৎ।
একত্র সংভৃত মগোবরশব্দ বস্তু মালো-
ক্যতাং তদখিলং সুধিয়ঃ কবীন্দ্রাঃ-
১৮। ইত্যাদি

অর্থাৎ যিনি সাহসাঙ্ক নৃপতির নিকট বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মনোহর চরিত্রে অবস্থান করত সদ্ব্যাখ্যা দ্বারা চরক শাস্ত্রকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহার নাম হরিচন্দ্র। (হরিচন্দ্রকৃত চরক টীকা এক্ষণে আর পাওয়া যায় না।) এই হরিচন্দ্রের বংশে বহুল বসুধাপতিমান্য, বৈদ্যকুলোদ্ভব, নির্ম্মলকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ নামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও ইন্দ্রের অশ্বিনীকুমারের ন্যায় গাধিপুরাধিপতির বৈদ্য ছিলেন। (৫,৬) এই শ্রীকৃষ্ণ হইতে সমস্ত ভিষগ্‌গণের পূজ্য দামোদর জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর মানসিক শক্তি সমুদ্ভূত বহুবিধ জল্প রূপ অনলে বাদীরূপ সমুদ্র পরিতপ্ত হইয়াছিল। এবং ত্রিবিধ তর্ক শাস্ত্রে ত্রিনয়ন অর্থাৎ শিবতুল্য ছিলেন।[৭]। ইহাঁর পুত্রের নাম বাচস্পতি। বাচস্পতি অতি স্ত্রী বিলাসী ছিলেন এবং বৈদ্য বিদ্যারূপ পদ্মকুলের দিবাকর ছিলেন। এই বাচস্পতি হইতে সাধুজনরূপ কুমুদের চন্দ্রস্বরূপ হইয়া কৃষ্ণ' উৎপন্ন হন। [৮] ইহাঁর ভ্রাতৃপুত্র কেশব। কেশবও বৈদ্যক শাস্ত্রের পারদৃশ্বা ছিলেন। অপিচ শব্দ, বাক্য, প্রমাণ ও রচনা বিষয়ে সুচতুর ছিলেন। [৯] তাদৃশ কৃষ্ণের পুত্র শ্রীব্রহ্ম। ইনিও সর্ব্বগুণসম্পন্ন। [১০] এই শ্রীব্রহ্মের আত্মজ মহেশ্বর। ইনি চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল কীর্ত্তিলাভ করেন এবং ইনি কবিগণের শ্রেষ্ঠ। বাক্যরূপ অপার সমুদ্রের পারগমনকারী, শব্দশাস্ত্ররূপ পদ্মবনের সূর্য্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। [১১] ইনি সাহসাঙ্ক চরিত প্রভৃতি মহা প্রবন্ধ নির্ম্মাণে নিপুণতা প্রকাশ করিয়া, গুণ গৌরবে শ্রী সম্পন্ন, বৈদ্যক শাস্ত্ররূপ পদ্মের সূর্য্য, সাধুজনের বন্ধু, কবি, এবং কবিত্বরূপ কৈরব বনের চন্দ্রস্বরূপ বলিয়া প্রথিত। [১২] এতাদৃশ মহেশ্বরের কৃত এই গ্রন্থ উত্তম পুরুষদিগের হৃদয়ে আকল্প পর্য্যন্ত নিত্য নিত্য শ্রীপুরুষোত্তমের কৌস্তভ ধারণের শোভালাভ করুক। [১৩] [১৪] ফণিপতি কর্তৃক উদীরিত শব্দকোষ সমুদ্র আলোড়ন করিতে করিতে যাঁহারা লালায়িত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট কেন না এই সুবর্ণ সুমেরুতুল্য বিশ্বপ্রকাশ সমাদৃত হইবে? [১৫]।

ভোগীন্দ্র অর্থাৎ ফণিপতি, কাত্যায়ন, সাহসাঙ্ক,* বাচস্পতি, ব্যাড়ি, বিশ্বরূপ,

* সাহসাঙ্ক কৃত শব্দ গ্রন্থ যাহা আছে তাহা আমরা দেখিতে পাই নাই, কিন্তু শব্দ শাস্ত্রের টীকাকারেরা স্থানে স্থানে

অমর, মঙ্গল, শুভাঙ্ক, বোপালিত, ভাগুরী, এবং আদি প্রভৃতিরা কি কাঞ্চন শৈলের সেবায় পরাঙ্মুখ হইবে? দেবতারা কি এই কাঞ্চন শৈলের (সুমেরুর) সেবা করেননা? —ইত্যাদি ইত্যাদি—(১৬) [১৭] [১৮]

আদিপুরুষ
হরিচন্দ্র
|
শ্রীকৃষ্ণ
|
দামোদর
|
বাচস্পতি
|
কৃষ্ণ — (অনির্দ্দিষ্ট নামা)
শ্রীব্রহ্ম — কেশব
মহেশ্বর

অপিচ, রায় মুকুট মণি খ্যাত বৃহস্পতি ৪৫৩২ কলিগতাব্দে অর্থাৎ ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে অমরকোষের প্রসিদ্ধ টীকা পদচন্দ্রিকা রচনা করেন এবং মেদিনীকর তাঁহার পরে স্বীয় কোষ রচনা করিয়াছেন, ইহাঁরা উভয়েই বিশ্বপ্রকাশের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তথাহি মেদিনী—

হারাবল্যভিধাং ত্রিকাণ্ড শেষঞ্চ রত্ন
মালঞ্চ।
অপি বহু দোষং বিশ্বপ্রকাশ কোষঞ্চ
সুবিচার্য্য। ইত্যাদি—

কোলাচল মল্লিনাথ সূরি বিশ্বকোষের প্রমাণ স্বীয় টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। রায় মুকুট, মেদিনীকর, এবং হেমাচার্য্য সকলেই মহেশ্বরাচার্য্যের পরে বর্ত্তমান ছিলেন। এক্ষণে প্রকৃত কথার অনুসরণ করা যাউক। মহেশ্বরের সাহসাঙ্ক চরিত রচনার পরে নৈষধ কর্ত্তা শ্রীহর্ষ নবসাহসাঙ্ক চরিত রচনা করেন।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে রাজশেখরের প্রবন্ধ চিন্তামণির প্রমাণানুসারে শ্রীহর্ষ দেব ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে জয়ন্ত চন্দ্রের সভাসদ ছিলেন। এই প্রমাণ বিদ্বৎশার্দ্দূল বুলার মহোদয় গ্রাহ্য করিয়াছেন, সুতরাং আমরাও তাহা রাজশেখরের শ্রীহর্ষ প্রবন্ধ পাঠে প্রামাণিক বোধ করিতেছি। পুনরায় রাজ শেখর সূরি হরিহর প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, হরিহর শ্রীহর্ষ বংশধর। তিনি শ্রীহর্ষের নৈষধ চরিত প্রথম প্রচারিত খণ্ড ১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটে লইয়া গিয়া ঢোল্‌কার রাণা বিরাধবলের মন্ত্রী বস্তুপালকে প্রতিলিপি প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষের সাহসাঙ্ক চরিতের পূর্ব্বে "নব" শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে তিনি নূতন রাজা সাহসাঙ্কের চরিতবর্ণনা করিয়াছেন সুতরাং এখানি মহেশ্বরের গ্রন্থ হইতে পৃথক্ নৃপতির চরিত্র বর্ণন বিষয়ক গ্রন্থ এজন্য ইহার নাম নব সাহসাঙ্ক চরিত যথা—

দ্বাবিংশো নবসাহসাঙ্ক চরিতে চম্পূকৃতোয়ং মহাকাব্যে
তস্য কৃতৌ নলীয় চরিতে
সর্গোনিসর্গোজ্জ্বলঃ।

"ইতি সাহসাঙ্ক দেবঃ" এই বলিয়া উক্ত ব্যক্তির নাম গ্রহণ করিয়াছেন। এবং "দেবঃ" এই বিশেষণ দ্বারা বোধ হয় সাহসাঙ্ক ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ছিলেন।

ইহাতে টীকাকার নারায়ণ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

নবো যঃ সাহসাঙ্ক নাম রাজা তস্য চরিতে বিষয়ে চম্পূং
গদ্য পদ্য ময়ীং কথাং করোতীতিকৃৎ তস্ত বিনির্ম্মিত
বতঃ সোপি গ্রন্থো তেন কৃত ইতিসূচ্যতে।

অর্থাৎ—

যিনি অভিনব সাহসাঙ্ক রাজার চরিত্র লইয়া চম্পূ অর্থাৎ গদ্য পদ্যময় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এই নলচরিত্র বর্ণাত্মক মহাকাব্যের দ্বাবিংশ সর্গ তৎকর্ত্তৃক সমাপ্ত হইল। *নলচরিত বর্ণনাত্মক মহাকাব্যের রচয়িতা এস্থলে এই অর্থের সূচনা করিলেন যে, নবসাহসাঙ্ক চরিত গ্রন্থও তাহা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

এই প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক, নূতন সাহসাঙ্ক নৃপতির চরিত্র বর্ণন গ্রন্থ; এজন্য শ্রীহর্ষ ইহার নাম নব সাহসাঙ্ক চরিত রাখিয়াছেন।

শ্রীরামদাস সেন।

ক্লিও পেট্রা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

"এক দিন নিজ কক্ষে বসিয়াছি আমি—
মদালসে! শ্লথ দেহ, নিশি জাগরণে
অবশ পড়িয়া আছি কোমল 'ছোফায়।'
কখন পড়িতে ছিনু; কভু অন্য মনে
গাইতেছিলাম গীত গুণ্ গুণ্ স্বরে,—
প্রেম ময়,—নব রাগে, নব অনুরাগে,
নিরখি অসাবধানে শায়িত শরীর,
প্রতিকূল দেয়ালের দীর্ঘ-আরসীতে।
শিথিল হৃদয় যন্ত্রে, বালা চারমিয়ন!
মধুরে বাজিতেছিল আনন্দ সঙ্গীত;
আবার অজ্ঞাতে সখি! না জানি কেমনে
বিষাদ ভাঙ্গিতেছিল সে লয় মধুর।
কখন হাসিতেছিনু,—না জানি কারণ;
আবার অজ্ঞাতে অশ্রু নয়নে কখন
হঠাৎ আসিতেছিল, না জানি কেমনে।
একটি মানব ছায়া, এমন সময়ে,
পতিত হইল সখি! কক্ষ গালিচায়;
পলকে ফিরাতে নেত্র, দেখিলাম কক্ষে
প্রাণেশ আমার। কিন্তু সেই মুর্ত্তি!—যেই
মূর্ত্তি, অন্য দিন কক্ষে প্রবেশিতে মম,
বিকাসিত প্রেমানন্দ, ললাটে, নয়নে;
হাসি রূপে সমুজ্জ্বল করিত অধীর;
নিঃসারিত সম্ভাষিতে,—'কই গো কোথায়
প্রাচীনা নীলজ(১) চারু ফণিনী আমার?'
সেই মূর্ত্তি—আজি দেখি গাম্ভীর্য্য আঁধার,
কাঁপিল হৃদয় মম।—'ক্লিওপেট্রা! এই
দুঃসময় যোজিতেছে জলধর রূপে,
চারিদিকে এণ্টনির অদৃষ্ট আকাশ;
যদি এ সময়ে, নাহি উড়াই তাহারে,

(১) নীলজ—নীলনদী জাত।

হইবে অসাধ্য পরে। রোম হতে আজি
কুসম্বাদ;—আন্তরিক বিগ্রহ কৃপাণে
'ইতালি' কণ্টকাকীর্ণ! কৃপাণ ফলকে
প্রতিবিম্বে রবিকর নির্ভয়ে দিবসে,
উপহাসি এণ্টনির বিলাস জীবন।
প্রেয়সি! বিদায় তবে কিছু দিন তরে
দেও যাই; কটাক্ষে সে কৃপাণ সকল
ছিন্ন শস্য রাশি মত, আসি শোয়াইয়া
আমি ডুবাইয়া নেত্র নিমিষে, পম্পির
জল যুদ্ধ সাধ, সেই সমুদ্রের জলে,—
পিতার অন্তিম শয্যা প্রদানি পুত্রেরে।
দেও অনুমতি তবে। ঈর্ষার অনল
জলে থাকে যদি তব রমণী হৃদয়ে,
নিবাও তাহাবে, শুন দ্বিতীয় সংবাদ—
মরেছে ফুলভিয়া আমা—'

মরেছে!—
'ফুলভিয়া।'

কি মরেছেফুলভিয়া! "হাঁমরেছেফুলভিয়া।'
দংশেছিল এণ্টনির বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ
যেই পলে,সেই পলে, 'মরেছে ফুলভিয়া—"
এ সংবাদে, চারমিয়ন! অমৃত ঢালিল।
এই মুক্তা হার নাথ! পরাইয়া গলে,
বলিলেন,—'এই হারে যত মুক্তা প্রিয়ে!
ইতালির রণজয় করিতে প্রচার,
তত রাজ্যে সাজাইব মুকুট তোমার
কল্যানি! অন্যথা এই তরবারি মম,
বিসর্জ্জি আসিব ওই ভূমধ্য-সাগরে।
প্রেয়সি! বিদায় দেও যাইব এখন।
মিশরে থাকিবে তুমি, কিন্তু ছায়া তব
যেতেছি লইয়া মম ছায়াতে মিশায়ে;
বিনিময়ে চিত্ত মম যাইব রাখিয়া
তব সহচর সদা,—'

"ধরিয়া গলায়,
উন্মত্তার প্রায় সখি! কত কাঁদিলাম,
কত বলিলাম—'নাথ! নাহি চাহি আমি
রাজ্য ধন, মুহূর্ত্তের ভালবাসা তব,
শত শত রাজ্যে কিম্বা সমস্ত ধরায়,
নাহি পাবে ক্লিওপেট্রা। পৃথিবী কি ছার!
স্বর্গ তুচ্ছ তার কাছে, প্রাণেশ! তোমার
প্রণয় রাজ্যের রাণী যেই সুভাগিনী।'
কত কাঁদিলাম, সখি! কত বলিলাম,
কত শুনিলাম, কিন্তু বিফল সকল;—
রণে মত্ত কেশরীরে, কেমনে সজনি!
রমণী বীতংসে বল, রাখিবে বাঁধিয়া?
ফুটিল অধরে উষ্ণ কোমল চুম্বন
বিদ্যুতের মত,—সখি! নাহি জানি আর।"
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, পুনঃ বিধুমুখি—
(হায়! সেই বিধু আজি নিবিড় জলদে
আচ্ছাদিত)—আরম্ভিল,—"পাইলাম জ্ঞান
যবে ওলো চারমিয়ন! নাহি পাইলাম
আর হৃদয় আমার। নাহি দেখিলাম
চাহি আকাশের পানে—রবি,শশী, তারা;
ধরাতল মরুভূমি; নাহি তাহে আর
সুশোভার চিহ্ন মাত্র। শব্দবহ হায়!
নিঃশব্দ আমার কাণে। কেবল সজনি!
দেখিলাম কি আকাশ, কিম্বা ধরাতল
এণ্টনিতে পরিপূর্ণ! শুধু সমীরণ
বহিছে এণ্টনি স্বর! দেখিতে, শুনিতে,
কিম্বা ভাবিতে,—এণ্টনি! ক্লিওপেট্রা কর্ণে,
কণ্ঠে, নয়নে, হৃদয়ে—এণ্টনি কেবল?
আহার, পানীয়, নিদ্রা, শয়ন, স্বপন—

সকলি---এণ্টনি! সখি! কি বলিব আর,
হইল জীবন মম অবিকল ওই
আফ্রিকার মরুভূমি, প্রত্যেক বালুকা
কণা—একটি এণ্টনি! দিবা, নিশি, পক্ষ,
মাস, কিছুই আমার নাহি ছিল জ্ঞান।
গণিতাম কাল আমি বৎসরে কেবল।
অনন্ত ভুজঙ্গ সম কাল বিষধর
দাঁড়াইয়া এক স্থানে, হতো হেন জ্ঞান,
দংশিছে আমারে যেন অনন্ত ফণায়।
প্রভাতে উঠিলে রবি, ভাবিতাম মনে,
জিনিতে মিশর ওই আসিছে এণ্টনি,
রণবেশে! রবি অস্তে, সায়াহ্নে আবার
ভাবিতাম বীরশ্রেষ্ঠ চলি গেল রোমে।
হাসিমুখে শশধর ভাসিতে গগনে
ভাবিতাম আসিতেছে এণ্টনি আবার,
প্রণয় পীযূসে হায়! যুড়াতে আমায়।
অস্ত গেলে নিশানাথ, প্রাণনাথ গেল
ছাড়ি ভাবিতাম মনে।"

"এইরূপে সখি!
গেল যুগ, গেল বর্ষ, কিম্বা দিন, মাস,
নাহি জানি। একদিন তাপিত হৃদয়
যুড়াইতে জ্যোৎস্নায়, শুয়েছি নিশীথে
সুকোমল কৌচ অঙ্কে, ছাদের উপরে।
সেই দিন দূত মুখে, নব পরিণয়
এণ্টনির নারী-রত্ন অগস্তার(১) সনে
শুনিয়াছিলাম,—তরুভ্রষ্ট হায়! যেই
বিশুষ্ক বল্লরী, কেন, রে দারুণ বিধি!
হেন বজ্রাঘাত পুনঃ তাহার উপরে!
শুয়েছি; উপরে নীল চিত্রিত আকাশ
প্রসারিত,—নাক্ষত্রিক চারু রঙ্গভূমি!
মধ্যস্থলে শশধর হাসিয়া হাসিয়া,
রূপের গৌরবে যেন চলিয়া চলিয়া
করিতেছে অভিনয়। নক্ষত্র সকল
নীরবে, অচলভাবে করিছে দর্শন
সেই সুশীতল রূপ। কেহ বা আনন্দে
জ্বলিতেছে; অভিমানে নিবিতেছে কেহ;
কেহ রূপে বিমোহিত পড়িছে খসিয়া।
ছুটিছে জীমূতবৃন্দ উন্মত্তের প্রায়
আলিঙ্গিতে সেইরূপ; উথলিছে সিন্ধু;
রূপ মুগ্ধ—অধিক কি ঘুরিছে ধরণী।
এই অভিনয় সখি দেখিতে দেখিতে
কতই নিদ্রিত ভাব উঠিল জাগিয়া
হৃদয়ের! সময়ের তামস গহ্বরে,
এই চন্দ্রালোকে, অঙ্কে অঙ্কে দেখিলাম
বিগত জীবন। কভু ভাবিলাম মনে,
আমি চন্দ্র, মেঘবৃন্দ বীরেন্দ্র সকল,
নক্ষত্র মানব চয়; আমি শশধর,—
সিন্ধু বীরের অন্তর। আবার কখন
ভাবিলাম আমি চন্দ্র, ধরণী এণ্টনি।
ভাবিতেছিলাম পুন, এই চন্দ্রালোকে
নব-প্রণয়িনী পাশে, নব অনুরাগে,
বসিয়া সুদূর রোমে প্রাণেশ আমার,
ভুলেছে কি ক্লিওপেট্রা? ভাবিছে কি মনে—
"কোথায় নীলজ চারু ফণিনী আমার?
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ? কিম্বা অগস্তার
নবীন প্রণয় রাজ্যে এবে এণ্টনির
হয়েছে কি অধিকৃত সমস্ত হৃদয়?
করেছে কি ক্লিওপেট্রা চির-নির্ব্বাসিত?—
নবীনা সপত্নী নামে, ওলো চারমিয়ন!
জ্বলিয়া উঠিল তীব্র ঈর্ষার অনল
রমণী হৃদয়ে, যেন বিশুষ্ক কাননে

(১) অগস্তা—এণ্টনির দ্বিতীয় পত্নী।

অকস্মাৎ প্রবেশিল ভীম দাবানল।
রমণীর অভিমানে রমণীহৃদয়
ভরিল। আরক্ত নেত্রে ছুটিল অনল।
যেই মানসিক বৃত্তি, প্রণয়ের তরে
ধরার কলঙ্ক রাশি ঠেলেছিল পায়ে,
আজি অপমানে পুনঃ সেই বৃত্তিচয়
হলো খড়্গ-হস্ত সেই প্রণয়-ঘাতকে!
সুষুপ্ত ভুজঙ্গ যেন, দুষ্ট প্রহারীকে,
বিস্তারিয়া ফণা ক্রোধে ছুটিল দংশিতে।
'কি! মিশরের ঈশ্বরী!—টলেমি দুহিতা!
ক্লিওপেট্রা আমি!—রূপ বিশ্ববিমোহিনী!
যে রূপের তেজে সেই ভুবন বিজয়ী
সিজারের তরবারি পড়িল খসিয়া!
সামান্য গুঞ্জিকা তরে, সেরূপ রতন
এণ্টনি ঠেলিল পায়ে!—তীরের মতন
বসিনু শয্যায়; কিন্তু দুর্ব্বল শরীর
দুরূহ যন্ত্রণা, চিন্তা, সহিতে না পারি,
ভুজঙ্গে দংশিত যেন পড়িল ঢলিয়া
শয্যার উপরে পুনঃ। মধুরে তখন
বহিল শীতল নীল-নীরজ অনিল;
কোমল পরশে ধীরে হইল সঞ্চার
অর্দ্ধ নিদ্রা, অৰ্দ্ধ মূৰ্চ্ছা, ক্লান্ত কলেবরে।"
"দেখিনু স্বপন! সখি! কি যে দেখিলাম
এখনো স্মরিতে কেশ হয় কণ্টকিত।
দেখিনু শার্দ্দূল এক—ভীষণ আকৃতি!
নিবিড় অরণ্যে মম ধাইছে পশ্চাতে,
বিস্তারিয়া মুখ। ত্রাহি ত্রাহি বলি আমি
চাহিনু আকাশ পানে। দেখিলাম সখি!
অপূর্ব্ব তপন এবে উদিত গগনে
উজ্জলিয়া দশ দিক্ করে আকর্ষিয়া
সেই মার্ত্তণ্ড আমারে তুলিল আকাশে;
সখি! আমি-শোভিলাম শশধর রূপে
বামে সবিতার। হায়! এমন সময়ে
অকস্মাৎ রাহু আসি গ্রাসিল তাহারে।
হইয়া আশ্রয় হীনা আমি অভাগিনী
পড়িতেছিলাম বেগে, অৰ্দ্ধ পথে সখি!
বীর-সূর্য্য অন্য জন হৃদয় পাতিয়া
লইল আমারে। আমি আনন্দে মাতিয়া
পরাইনু প্রেম হার গলায় তাহার,
কিন্তু কি কুক্ষণে হায়! বলিতে না পারি!
সে হার পরশে বীর হৃদয় তাহার,
—ফাটিত যে উরস্ত্রাণ রণ রঙ্গে মাতি,—
হইল বিলাসে যেন নারী সুকুমার!
শাবসন হতে অসি পড়িল খসিয়া,
—অরাতি মস্তকে ভিন্ন নামে নাহি যাহা,—
কুসুম শয্যায়! শেষে মাথার মুকুট
পড়িল খসিয়া ওই ভূমধ্য সাগরে,
অস্তগামী রবি যেন! কি বলিব আর,
যেই বক্ষে অরাতির অসংখ্য কৃপাণ
গিয়াছে ভাঙ্গিয়া যেন প্রচণ্ড শিলায়
স্ফটিকের দণ্ড, কিম্বা মত্ত গজ দন্ত
হায় রে! যেমতি চন্দ্র-পর্ব্বত প্রস্তরে;
মম প্রেম হার তীক্ষ্ণ ছুরিকার মত,
সেই বক্ষে প্রিয় সখি! পশিল আমূল!
তখন সে হার ধরি ভুজঙ্গের বেশ
ছুটিল পশ্চাতে মম। সভয়ে তখন
ডাকিতেছি—'কোথা নাথ! এমন সময়ে,
কোথা নাথ!—'
'প্রিয়ে! এই চরণে তোমার।—'
যে সঙ্গীতে এই ধ্বনি পশিল শ্রবণে,
সে সঙ্গীত ক্লিওপেট্রা শুনিবে না আর।
ভাঙ্গিল স্বপন সখি, ফুটিল চুম্বন

বিশুষ্ক অধরে মম; মেলিয়া নয়ন
দেখিলাম প্রাণনাথ! হৃদয়ে আমার!
অভিমানে বলিলাম—'সে কি নাথ! ছাড়ি
রোম রাজ্য, ছাড়ি নব প্রণয়িনী, কেন
এখানে আপনি? কিম্বা এ আপনি নন;
এই ছায়া আপনার, আসিয়াছে বুঝি
বিরহ আতপ তাপে যুড়াতে আমায়।—'
'নিমজ্জিত হক্ রোম টাইবরের জলে,
রাজ্য; প্রণয়িনী সহ, এই রাজ্য মম,—'
(বলিলা হৃদয়ে ধরি হৃদয় আমার,)
'প্রণয়িনী ক্লিওপেট্রা—ইহ জীবনের
সুখ এই,—' পুনঃ নাথ চুম্বিলা অধর;
'জীবন তোমার প্রেম, বিরহ মরণ।'"
"দূরে গেল অভিমান; রমণীর প্রেম
স্রোতে অভিমান, সখি! বালির বন্ধন।
বলিলাম—'সত্য নাথ! এই হৃদয়ের
তুমি অধীশ্বর, কিন্তু বলিব কেমনে
এই ক্ষুদ্র-রাজ্য তব? অনন্ত জলধি
জলে যেই শশধর করে ক্রীড়া, নাথ!
ক্ষুদ্র সরসীর নীরে মিটিবে কেমনে
ক্রীড়া সাধ, প্রাণেশ্বর! সেই শশাঙ্কের?
প্রণয় বারিদ তুমি! তুমি যদি তবে
রাখ সসলিলা এই সরসী তোমার,
যোগাবে অনন্ত বারি, এই প্রেমাধিনী।'"
"মৈশরী হৃদয়াকাশে প্রণয়ের সখি
প্রকাশিল যদি পুনঃ, মিশরে আবার
ছুটিল দ্বিগুণ বেগে আমোদ জোয়ার।
কত রাজ্য সিংহাসন, আসিল ভাসিয়া
ক্লিওপেট্রা পদতলে বলিব কেমনে।
সমস্ত পূরব রাজ্য মিলি এক তানে,
'পূরব রাজ্যের রাণী, মিশর ঈশ্বরী!—'
গাইল আনন্দ স্বরে। হায়! সেই ধ্বনি
জাগাইল সুপ্ত সিংহ—কনিষ্ঠ সিজার—(১)
কুক্ষণেৎ কুগ্রহ সখি হইল তখন
ক্লিওপেট্রা, এণ্টনির অদৃষ্টে সঞ্চার।
শুনিনু গর্জ্জন তার সহস্র কামানে,
মিশরে বসিয়া সখি, ছুটিল হর্য্যক্ষ
অসংখ্য অর্ণব পোতে, গ্রাসিতে মিশরে,
শতধা বিদারি ভীম ভূমধ্য সাগর,
সহোদরা অপমান প্রতি বিধানিতে।(২)
নির্ভয় হৃদয়ে সখি! সাজিল এণ্টনি,
হেলায় খেলিতে যেন বালকের সনে।
বলিলা আমারে নাথ! হাসিয়া হাসিয়া
'মিশরে বসিয়া প্রিয়ে! দেখ মুহূর্ত্তেকে
বালকের ক্রীড়া সাধ আসি মিটাইয়া।'
ধৈর্য্য না মানিল মনে; ভাবিলাম যদি
পাপিষ্ঠা সপত্নী আসি প্রাণেশে আমার
লয়ে যায় এ কৌশলে। বলিলাম—'নাথ!
বহু দিন সাধ মম করিতে দর্শন
অর্ণব আহব, প্রভু পূরাও সে সাধ;
তুমি যদি না পূরাবে, কে পূরাবে আর
বীরেন্দ্র!—'হাসিয়া নাথ বলিলা আমারে,—
'সাজ তবে, বীরেন্দ্রাণি! বালকের রণে
মহারথী ক্লিওপেট্রা, সারথী এণ্টনি!'
আপনি প্রাণেশ, রণবেশে সাজাইলা
আমাকে, সজনি! সুখে সাজাইতে হায়!
কত যে কি সুখ নাথ দেখিলা নয়নে,
চুম্বিলা অধরে, সখি! পরশিলা করে,
বলিব কেমনে? অঙ্কে অঙ্কে বিরাজিয়া

(১) কনিষ্ঠসিজার—Augustus Cæsar.
(২) অগস্তা—অগস্তস সিজারের কনিষ্ঠা ছিলেন।

স্ফুট নলিনীর, অলির কি সুখ, পদ্ম
বুঝিবে কেমনে ? আমি আপনি সজনি !
বীরবেশে প্রেমাবেশে হইনু বিভোর।
ফুরাইলে বেশ, নাথ হাসিয়া আদরে,
সমর্পিয়া করে চারু কুসুমের হার,
বলিলা—'কিকাজ প্রিয়ে! অস্ত্রেতে তোমার,
বিনা রণে, এই অস্ত্রে,জিনিবে সংসার।'"
"অসংখ্য অর্ণব যান, সৈন্য অস্ত্র ভবে
প্রায় নিমজ্জিত কায়, বিশাল ধবল
পক্ষে বন্দী করি দেব প্রভঞ্জনে দর্পে,
বিক্রমে ফেনিয়া সিন্ধু, চালিল সাঁতারি
যেন প্রমত্ত বারণ। চলিলাম আমি
নির্ভয়ে, কেশরী যেই হরিণীরে সখি!
দিয়াছে অভয়, তার কি ভয় জগতে ?
বীর প্রণয়িনী আমি, বীরের সঙ্গিনী,
ডরিব কাহারে ? কিন্তু অবলা মনের
না জানি কি গতি; যত আশ্বাসিয়া মন
করি ভাসমান, তত ভাবি আশঙ্কায়
হইতেছে ভারি। তত কাল রঙ্গে, মম
চকিত কল্পনা হায়! অজ্ঞাতে কেমনে
চিত্রিতেছে ভবিষ্যৎ। যদিও না জানি,—
পর চিত্ত অন্ধকার!—বুঝিনু তথাপি
ভাবি অমঙ্গল ছায়া পড়েছে হৃদয়ে
এণ্টনির। লুকাইতে সে করাল ছায়া
রমণীর কাছে, নাথ! হয়েছে মগন
সঙ্গীতে, সুরায়,—"
"দ্রুত ভাঙ্গিল স্বপন,
সর্ব্বনাশ!!—এ কি দেখি সম্মুখে আমার!
অসীম বারিদ পুঞ্জ, ভীম কলেবর!—
পড়েছে খসিয়া ও কি জলধি হৃদয়ে ?
খেলিছে বিদ্যুৎ ও কি জীমূত ঘর্ষণে ?
ও কি শব্দ ভয়ঙ্কর ?—জীমূত গর্জ্জন ?
সকলই ভ্রম!—সখি! শুকাইল মুখ,
বিপক্ষ তরণী ব্যূহ সজ্জিত সমরে!
বিদ্যুৎ,—কামান অগ্নি; দুর্জ্জয় কামান
মুহুর্মুহু মেঘমন্দ্রে গর্জ্জিছে ভীষণ!
যেই দৃশ্য—নেত্রে কর্ণে, চিত্তে ভয়ঙ্কর!—
দেখিলাম চারমিয়ন! বলিব কেমনে
কামিনী কোমল কণ্ঠে ? শুনিবে তোমরা
নারী কোমল হৃদয়ে ? দেখে থাক যদি
প্রতিকূল প্রভঞ্জনে প্রাবৃট্ অম্ভোদ
আঘাতিতে পরস্পরে, বিলোড়ি গগন,
ছিন্ন নক্ষত্র মণ্ডল; বুঝিবে কেমনে
প্রতিকূল তরী ব্যূহ পশিল সংগ্রামে।
মুহূর্ত্তেকে ধূমপুঞ্জে ঢাকিল জলধি
আঁধারিয়া দশ দিশ; কিন্তু না পারিল
সংহারক রণমূর্ত্তি লুকাতে আঁধারে।
সেই অন্ধকারে সখি অঙ্গ মিশাইয়া
তরীর উপরে তরী ঝাঁপ দিল রোষে।
গর্জ্জিল কামান,—ঝাঁপ দিল শত সূর্য্য
ফেনিল সাগরে, তরী বৃন্দ বিদারিয়া
নিমজ্জিয়া জলে, নব রক্তে কলঙ্কিয়া
সুনীল সলিলে। হায়! সখি! তুচ্ছ নর,
আপনি জলধি,—সেই ভীষণ নির্ঘাত,
তীব্র অনল বর্ষণ, না পারি সহিতে,
করিতেছে ছটফট উত্তাল তরঙ্গে,
ফেনিয়া ফেনিয়া, ঘন ঘন নিশ্বাসিয়া
পড়িতেছে আছাড়িয়া কূলের উপরে।
তরণীর প্রতিঘাত কামান গর্জ্জন,
দহ্যমান তরণীর, অনল হুঙ্কার,
বন্দুকের অগ্নিবৃষ্টি, অস্ত্রঝনৎকার,
জেতার বিজয় ধ্বনি, মৃতের চীৎকার,

ভীষণ তরঙ্গ ভঙ্গ, সিন্ধু আস্ফালন
ভয়ঙ্কর ! নিরখিয়া উড়িল পরাণ।
অবলা হৃদয় ভয়ে হইল অচল;
বলিলাম কর্ণধারে—'ফিরাও তরণী,
বাঁচাও পরাণ।' আজ্ঞামাত্র সংখ্যাতীত
ক্ষেপণী ক্ষেপণে, বেগে চলিল তরণী
মিশর উদ্দেশে হায়! মন্দুরার মুখে
ছুটিল তুরঙ্গ যেন। কিছুক্ষণ পরে
সভয়ে ফিরায়ে আঁখি দেখিতে পশ্চাতে
দেখিলাম ভাঙ্গিয়াছে কপাল আমার।
না দেখি তরণী মম, রণে ভঙ্গ দিয়া
উন্মত্তের প্রায় ওই আসিছে এণ্টনি!
আকাশ ভাঙ্গিয়া হায়! পড়িল মস্তকে
অকস্মাৎ! ভাবিলাম মনে, এ সময়ে
নাথের সহিত যদি হয় দরশন,
অনুতাপে নাহি জানি কোন অপমান
করিবে আমার; হায়! কেন আসিলাম,
আমি কেন মজিলাম! নাহি ডুবিলাম
কেন জলধির তলে? নাহি মরিলাম
সেই বিষম সংগ্রামে, নাথের সম্মুখে?
কেন আসিলাম আমি।—কেন মজিলাম!"

"অনাহারে, অনিদ্রায়, মুমূর্ষুর মত,
অবতীর্ণ হইলাম মিশরের তীরে
বহু দিনে। এই রণে গিয়াছিনু সখি!
এণ্টনির সোহাগিনী, পৃথিবীর রাণী;
আসিলাম ভিখারিণী ডুবায়ে এণ্টনি।
চলিলাম গৃহ মুখে, বিসর্জ্জন করি
মাথার মুকুট, ভাবি রোম সিংহাসন,
এণ্টনির প্রেম,—হায়! মৈশরী জীবন,—
ভূমধ্য সাগরে;—এই জীবনের মত
বিসর্জ্জিয়া যত আশা ব্যোম নিকেতন।
চলিলাম গৃহে;—কোন মতে, কোন পথে
নাহি ছিল জ্ঞান। নিল উড়াইয়া যেন
মানসিক ঝটিকায়। প্রবেশি প্রাসাদে
দেখিলাম অন্ধকার! নাহি সে মিশর
রাজ্য নাহি রাজধানী, দেখিনু কেবল
অন্ধ কার!—মরুভূমি! সমস্ত ভূতল
হইতেছে তরঙ্গিত ভীম ভূকম্পনে।
সেই অন্ধকারে, সেই মরুভূমি মাঝে
দেখিনু কেবল—মম সমাধি ভবন!
চলিলাম সেইদিকে, উন্মাদিনী আমি।
বলিলাম—তোমারে কি?—না হয় স্মরণ,
চারমিয়ন্!—বলিলাম—আসিলে এণ্টনি,
অনুতাপে ক্লিওপেট্রা ত্যাজিল জীবন,—
বলিও প্রাণেশে মম, বলিও তাঁহারে,—
'মৈশরীর শেষ কথা—ক্ষমিও এণ্টনি!'
সমাধির দ্বারে সখি! পড়িল অর্গল।"

"আসিল এণ্টনি; সখি! নাথের সে মূর্ত্তি
স্মরিলে এখনো মম বিদরে হৃদয়!
প্রসারিত নেত্রদ্বয়—উন্মত্ত, উজ্জ্বল!
প্রশস্ত ললাট—যেন ধবল প্রস্তর,—
নাহি রক্ত চিহ্ন মাত্র! বিষাদ লিখেছে
রেখা কপোলে, কপালে, উপহাসি যেন
বর্দ্ধক্যে! চিত্রেছে শুক্লে মস্তক সুন্দর!
এত রূপান্তর সখি! এই কয় দিনে
গিয়াছে নাথের যেন কতই বৎসর!
শুনিলা সখীর মুখে, স্তম্ভিতের মত,—
'অনুতাপে ক্লিওপেট্রা, ত্যাজিল জীবন,
মৈশরীর শেষ কথা—ক্ষমিও এণ্টনি।'
'ক্ষমিলাম'—বলি নাথ হৃদয় চাপিয়া
দুই হাতে, প্রবেশিল রাজ হর্ম্ম্যে বেগে,—
বিদ্যুতের গতি! হেন কালে চারিদিকে

উঠিল নগরে সখি! ভীম কোলাহল।
ভূমধ্য সাগর যেন তীর অতিক্রমি
প্লাবিল মিশর! ত্রস্তে বাতায়ন পথে
দেখিলাম—নহে সিন্ধু—সৈন্য সিজারের,
লুঠিতেছে হতভাগ্য—নগর আমার।
অপূর্ব্ব সিজার গতি! চক্ষুর নিমিষে
ঘেরিল সমস্ত পুরী,—সমাধি আমার;
পড়িনু ব্যাধের জালে আমি কুরঙ্গিণী!
কিন্তু ও কি, সহচরি! সমাধির তলে!
ওই শয্যার উপরে! মুমূর্ষু এণ্টনি!!
চাহিলাম ঝাঁপ দিতে শয্যার উপরে,
তুমি ধরিলে অমনি। তুলিলাম নাথে
সমাধি উপরে;—হায়! সমাধি উপরে!
এই ছিল লেখা সখি কপালে আমার,
কে জানিত! প্রাণ নাথ বলিলা আমারে
সেই স্বর, প্রিয় সখি! অস্ফুট দুর্ব্বল!—
'মৈশরি! ভবের লীলা ফুরাইল আজি
এণ্টনির; পৃথিবীতে, প্রেয়সি! আমার
আর নাহি প্রয়োজন! ফুরাইল কাল,
আমি যাই অস্তাচলে। এই অস্ত্রলিখা
প্রিয়ে হৃদয়ে আমার,—নহে শত্রুদত্ত;
হেন সাধ্য কার? নাহি এই ভূমণ্ডলে
এণ্টনি বিজয়ী,—বিনা ক্লিওপেট্রা! আজি
এণ্টনির করে প্রিয়ে! আহত এণ্টনি।
আসিয়াছি,—শেষ সুরা পাত্র করি পান
তব সনে, প্রণয়িনি!—লইতে বিদায়;
দেও, প্রিয়তমে! যাই—বিদায় চুম্বন।'"
"সুরা করিলাম পান, চুম্বিনু চুম্বন।
শুনিনু অস্ফুট স্বরে, জন্মের মতন—
'ক্লিওপেট্রা!—প্রণ—য়ি—নি!——'"
"'প্রাণনাথ! আমি
ক্লিওপেট্রা অভাগিনী!'—বলি উচ্চৈঃস্বরে,
আঁটিয়া হৃদেশে সখি! ধরিনু হৃদয়ে
দেখিলাম ক্রমে ক্রমে যুগল নয়ন—
জ্যোতিতে যাহার রোম আছিল উজ্জ্বল,
অসংখ্য সমর ক্ষেত্রে, কিরণ যাহার
ছিল বিভাসিত যেন মধ্যাহ্ন তপন;
খেলিত বিদ্যুৎ মত সৈন্যের হৃদয়ে
উত্তেজিয়া রণরঙ্গে;—নিবিল ক্রমশঃ।
মানব গৌরব রবি হলো অস্তমিত।
'প্রাণেশ্বর!—প্রাণনাথ!—এণ্টনি আমার!'
ডাকিলাম বারম্বার উন্মাদিনী প্রায়;
'প্রাণেশ্বর!—প্রাণনাথ!—এণ্টনিআমার!'
শুনিলাম উত্তরিল, সমাধি ভবন।
প্রাণে—শ্বর!—প্রাণ!———"
আহা! সহিল না আর;
অবশ মস্তক ভার গ্রীবা দুঃখিনীর
পড়িল ভাঙ্গিয়া, বামা পড়িল ভূতলে;—
ব্যাধ শরে বিদ্ধ যেন বন কপোতিনী!
অতি ত্রস্তে সখীদ্বয় ধরাধরি করি,
তুলিল শয্যায় শ্বেত প্রস্তর পুতুলী;
উরবাস, কটিবন্ধ, করিয়া মোচন,
শীতল তুষার বারি, উরসে, বদনে,
বরষিল, কিন্তু নাহি পাইল চেতন
অভাগিনী! তবু নাহি মেলিল নয়ন।
সহচরীদ্বয় দুঃখে বসিয়া নিকটে
কাঁদিতেছে ভর্ত্রী-শোকে, হৃদয় বিকল।
অকস্মাৎ তীরবেগে, বসিয়া শয্যায়,—
মুষ্টি-বদ্ধ করদ্বয়,—বিস্তৃত নয়ন,—
তীব্র জ্যোতি পরিপূর্ণ! চাহি শূন্য পানে
উন্মত্ত, বিকৃত কণ্ঠে, বলিতে লাগিল।
"পরিণয়!—পরিণয়!—তুচ্ছ পরিণয়

যদি না থাকে প্রণয়। প্রণয় বিহনে
পরিণয়!—পরিমল হীন পুষ্প! মণি
হীন ফণী—আজীবন অনন্ত দংশক।
মধুহীন মধু চক্র!—মক্ষিকাপূরিত।
হেন পরিণয় বলে, ওই দেখ সখি
এণ্টনির পাশে বসি, অগস্তা, সিল্‌ভিয়া,
আমায় কুলটা বলি করে উপহাস।
কি কুলটা—ক্লিওপেট্রা! প্রণয়ের তরে
বিসর্জ্জিয়া কুল আমি পেয়েছিনু যারে,
কুল তুচ্ছ—প্রাণ দিয়া—তোরা অভাগিনী
না পাইয়া তারে, আজি তোরা গরবিণী,
পোড়া পরিণয় বলে! পরিণয় বলে
জীব লোকে তোরা নাহি পাইলি যাহারে,
দেখিব অমর লোকে, পরিণয় বলে
তারে রাখিবি কেমনে।" উন্মাদিনী হায়!
ছুটিল তাড়িত বেগে, সহচরীদ্বয়,
না পারিল প্রাণপণে রাখিতে ধরিয়া
প্রবেশিয়া কক্ষান্তরে, দ্রুত হস্তে বামা,
একটী স্বর্ণ কৌটা খুলিল যেমতি,
ক্ষুদ্র বিষধর এক ফণা বিস্তারিয়া,
বসাইল বিষদন্ত কোমল হৃদয়ে,—
রূপে মুগ্ধ ফণী যেন করিল চুম্বন!
সখীদ্বয় উচ্চৈঃস্বরে করিল চীৎকার,
ভূতলে ঢলিয়া আহা! পড়িল মৈশরী।
"এই বেশে চারমিয়ন! ভেটিয়া ছিলাম
নাথে চিদনস তীরে, এই বেশে আজি
চলিলাম প্রাণ নাথ ভেটিতে আবার—"
বলিতে বলিতে বিষে, কালিমা সঞ্চার,
করিল অতুল রূপে, যেইরূপে হায়!
সমস্ত রোমান রাজ্য—প্রাচীনা পৃথিবী—
ছিল বিমোহিত; সেইরূপে জলে, স্থলে,
হলো প্রজ্বলিত কত সমর অনল,
কতই বিপ্লবে রোম হলো বিপ্লাবিত;
নিবিল সে রূপ আজি,—মরিল মৈশরী,
সমর্পিয়া কালে পূর্ণ যৌবন রতন,
অপূর্ব্ব রমণী কীর্ত্তি—রূপে, গুণে, দোষে!
রাখি ভূমণ্ডলে হায়! রাখি প্রতিবিম্ব
অসংখ্য প্রস্তরে, পটে, কাব্যে, ইতিহাসে।

শৈশব সহচরী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বাখ্যান।

বহুকাল পূর্ব্বে সুবর্ণপুরে রামভদ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক জন অতিদরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ধনীদিগের গৃহে নিমন্ত্রণ খাইয়া রামভদ্র আপনার উদর পূরণ করিতেন। তাঁহার পরিবারের মধ্যে এক মাত্র নবমবর্ষীয়া ভগিনী ছিল। তাঁহার ভগিনী চন্দ্রাবলী অসামান্য রূপবতী ছিল। পূর্ব্বাঞ্চলের কোন অশীতিবর্ষবয়স্ক ধনাঢ্য ভূস্বামী তাঁহার পাণিগ্রহণ করাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে রামভদ্রের দরিদ্রতা ঘুচিল। প্রাচীন ভূস্বামী কিঞ্চিৎকাল পরে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। চন্দ্রাবলীর সন্তান হইল না দেখিয়া তিনি আপন মৃত্যুর

কিছুকাল পূর্ব্বে চন্দ্রাবলীর ইচ্ছানুসারে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্বর্ণ এবং রৌপ্যরাশি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যু হইলে চন্দ্রাবলী আপন ভ্রাতা রামভদ্রকে তাঁহার আলয়ে বাস করাইলেন এবং তিনিও কিছুদিন পরে রামভদ্রকে স্বামীর চিরসঞ্চিত ধনরাশি উপঢৌকন দিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। রামভদ্র, ভগিনীর বিয়োগের দুঃখেই হউক, আর "যঃপলায়তি স জীবতি" ভাবিয়াই হউক, তৎক্ষণাৎ ভগিনীপতির বাটী পরিত্যাগ করিয়া ভাগীরথীতীরে, নিজ গ্রামে আসিয়া বাস করিলেন। সম্ভবাতিরিক্ত ব্যয় ভূষণ করিলে পাছে বিপদ্গ্রস্ত হয়েন, এই আশঙ্কায় রামভদ্র অপর্য্যাপ্ত ধনের অধিপতি হইয়াও অতি সাবধানে কালযাপন করিতেন। তাঁহার পরলোক গমন হইলে তাঁহার পুত্রদ্বয় কমলাকান্ত ও লক্ষ্মীকান্ত তাদৃশ সাবধানের আবশ্যকতা বিবেচনা করিলেন না; তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া ভূসম্পত্তি ক্রয় করিলেন এবং আপনাদিগের আবাস জন্য পৃথক্২ অতিবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন ও পৈতৃক ধনরাশির উপযুক্ত ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

এই প্রকারে লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দুই পৃথক্২ অতি বিস্তৃত জমিদারীর মূলভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের পরে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত দুই সহোদরের বংশ উহা অবিবাদে ভোগদখল করিয়াছিল। তৎপরে যখন রমাকান্ত এবং তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই জমিদারীর অধিপতি হইলেন, তখন এই বহুকালের সম্পত্তিতে কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটিল, তদ্বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইতেছে—

রমাকান্ত কিছু সাবধান-ব্যয়ী হওয়াতে তারাকান্ত অপেক্ষা অধিক ধনী হইয়া উঠিলেন। এমন কি যখন তরফ সুবর্ণপুর নীলামের ইস্তাহার হইল, তখন তারাকান্তের নিতান্ত ইচ্ছা উহা ক্রয় করিয়া বাস ভূমির অধিপতি হয়েন। কিন্তু নিজের তত সঙ্গতি না থাকাতে রমাকান্তের নিকট একখানি তালুক বন্ধক রাখিয়া খত লিখিয়া দিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়া উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিলেন। কালে এই খতই দুই বংশের মধ্যে অনর্থেরমূল হইল।

এপর্য্যন্ত দুই বংশে সম্প্রীতি ছিল, সম্প্রতি অল্প কারণে অপ্রীতি ঘটিল। একদিবস রমাকান্তের একজন চাকরাণী খিড়কীর পুষ্করিণীতে বাসন মাজিতে গিয়া তারাকান্তের একজন খাসপরিচারিকার পরিষ্কার গাত্রে অসাবধানে জল দিয়াছিল। খাস পরিচারিকার উহাতে অপমান বোধ হওয়াতে তৎক্ষণাৎ উভয়ে তুমুল বাগ্যুদ্ধ আরম্ভ হইল, ও সেই যুদ্ধ দুই বাড়ীর দুই গৃহিণী পর্য্যন্ত পৌছিল; সুতরাং সেই সূত্রে রমাকান্ত ও তারাকান্তের বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল।

প্রথমে গালিগালাজ পরে আলাপ ও নিমন্ত্রণ বন্ধ। তৎপরে ছোট২ মোকদ্দামা, প্রজা ধরিয়া টানা টানি, শেষ লাঠালাঠির

উপক্রম। শেষে তারাকান্ত জেলার সদর আদালতে আরজি দাখিল করিলেন, যে আমি রমাকান্তের ঋণ টাকা দিয়া পরিশোধ করিয়াছি। রমাকান্ত বন্ধকি সম্পত্তিতে দখল দেয় না, অতএব দখল পাওয়ার প্রার্থনা। দাবির প্রমাণ স্বরূপ তারাকান্ত কয়েক খণ্ড রসীদ দাখিল করিলেন। রমাকান্ত বলিলেন, রসীদ জাল। মোকর্দ্দামা ক্রমে ক্রমে প্রিবি-কৌন্সেল পর্য্যন্ত গিয়াছিল। তিন আদালতে রমাকান্ত জয়ী হইলেন এবং তিন আদালতের খরচা পাইলেন। তারাকান্ত ক্রমে ঋণগ্রস্ত হইয়া একে একে সকল বিষয় খোয়াইলেন, শেষে অর্থহীন ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া মনোদুঃখে উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে তিনি পুত্রের মুখাবলোকন করিতে পাইলেন না; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রমণীকান্ত অতি কিশোর বয়সে রামহরি মুখোর ভ্রাতৃকন্যা কুমুদিনীকে বিধবা করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন; কনিষ্ঠ রতিকান্ত বাণিজ্যার্থে দেশান্তরে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতেও তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরমকালে যত্ন এবং সেবার্থ ক্ষোভ ছিল না; তাঁহার পুত্রবধূ কুমুদিনী আপনার শরীর পতন করিয়াও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিতেন। তারাকান্ত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গঙ্গালাভ করিলেন।

পিতার মৃত্যুসম্বাদ পাইয়া রতিকান্ত দেশে আসিলেন; পরে পিতার শ্রাদ্ধাদি সমাপনানন্তর আপনার স্ত্রী ও ভ্রাতৃজায়া কুমুদিনীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। গৃহস্থ অন্যান্য সকলের মধ্যে কাহাকে শ্বশুরবাড়ী কাহাকে বাপের বাড়ী কাহাকেও অন্য কোথাও পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার অতি বৃহৎ অট্টালিকার দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন, কেহ তাহা জানিতে পারিল না। এদিকে রমাকান্ত, তারাকান্তের সমুদায় ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া অতি প্রবল জমীদার হইলেন এবং কিছু দিন পরে তাঁহার একমাত্র পুত্র রজনীকান্তের বিবাহ দিলেন; বিবাহ রাত্রি হইতে রজনী নিরুদ্দেশ হওয়াতে রমাকান্ত পুত্রের বিরহে রোগগ্রস্ত হইয়া অতি অল্পকালেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

যাহা সচরাচর ঘটে না।

রমাকান্তের শ্রাদ্ধের তিথি উপস্থিত, তাঁহার কন্যারা মহাসমারোহপূর্ব্বক আয়োজন করিয়াছেন, এক জন জ্ঞাতি শ্রাদ্ধ করিবে, সভা সুসজ্জিত হইয়াছে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা বসিয়াছেন, শ্রাদ্ধাধিকারীর আসন প্রস্তুত। পুরোহিত পুষ্পাদি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, জ্ঞাতি অতি গম্ভীরভাবে যজ্ঞোপবীত মার্জ্জনা করিতে করিতে আসনের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। এমত সময় হঠাৎ একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল, জ্ঞাতি

পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, স্বয়ং রজনীকান্ত আসন গ্রহণ করিতেছেন। আহ্লাদে আত্মীয়েরা চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন; রজনীকান্ত রীতিমত শ্রাদ্ধাদি করিলেন। শ্রাদ্ধান্তে পরিবারস্থ সকলকে ডাকিয়া একত্রিত করিলেন। সকলে সমবেত হইলে বলিলেন,"তোমরা সকলেই জান যে, এই বিষয় আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ কৃত। পিতা কোন উইল করিতে পারেন নাই।" রজনীর ভগিনীপতি দেবনাথ মুখো বলিলেন, "তাঁহার উইল করিবার আবশ্যক কি? তিনি সকলকে আপনার নিকট রাখিয়া গিয়াছেন,তাহাই সকলের পক্ষে উইল। তাহাতেই সকলের মঙ্গল করা হইয়াছে।"

রজনীকান্ত বলিলেন, "মুখোপাধ্যায় মহাশয়,আপনার কথা অমৃততুল্য; এক্ষণে শ্রবণ করুন। পিতা উইল করিয়া যান নাই, কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার উপদেশ ছিল, যে আমি তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার আশ্রিত অনুগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আমার ইচ্ছানুরূপ তাঁহার সঞ্চিত অর্থ বিতরণ করিতে পারিব।"

দেবনাথ মুখো বলিলেন, "দেবতারা মেঘকে বৃষ্টি করিতে বলিয়া থাকেন।"

রজনী বলিলেন, "দেবতারা কথন কথন অনাবৃষ্টিও ঘটাইয়া থাকেন। এক্ষণে আপনারা সকলে জানেন আমি কিছু কৃপণ।"

দেবনাথ মৃদু মৃদু বলিলেন, "সূর্য্যদেব অন্ধকারের কর্ত্তা।"

এবার রজনী উত্তর না করিয়া কহিলেন, "আমি স্বেচ্ছাক্রমে যাহাকে যাহা দিতেছি তাহা শ্রবণ কর। আমার মধ্যমা ভগিনী শৈলবতী কোথায়?" একজন স্ত্রীলোক কহিল, "তিনি আসেন নাই। কাঁদিতেছেন।"

রজনীকান্ত বলিলেন, "মেজদিদিকে পনর হাজার টাকা দিলাম। তৃতীয়া ভগিনী শৈলবালা কোথায়?" শৈলবালা প্রসন্নমুখে অগ্রবর্ত্তিনী হইল। রজনী বলিলেন, "তোমাকে দশ হাজার টাকা দিলাম।"

শৈলবালার প্রফুল্ল মুখ ম্লান হইল—বলিল, "কেন রজনী, মেজদিদিকে পনর হাজার, আমাকে দশ হাজার?"

রজনী কহিলেন, "মেজদিদি তোমা হইতে পাঁচবৎসরের বড় এই জন্য।"

শৈলবালা "আমি টাকা চাহি না" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কক্ষের বাহিরে গেল।

রজনী অম্লান বদনে বলিলেন, "সেজ দিদি টাকা লইলেন না—আমি তাঁহার টাকাও মেজদিদিকে দিলাম।" দেবনাথ মুখো বলিলেন, "তিনি রাগ করিয়া গিয়াছেন এখনি আবার আসিবেন। আপনার উপর রাগ করিবেন না ত'কাহার উপর রাগ করিবেন।" সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া রজনীকান্ত পিসী, মাসী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী, কুটুম্ব, ভৃত্য প্রভৃতিকে পিতৃসঞ্চিতার্থ বিতরণ করিলেন। কিন্তু রজনীকান্ত দেবনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশ-

য়ের কোন কথা উল্লেখ করিলেন না। দেখিয়া দেবনাথ বলিলেন,

"তোমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্গে গিয়াছেন তাঁহার অংশ আমি পাইতে পারি।"

রজনী বলিলেন, "আপনি যখন তাঁহার কাছে যাইবেন তখন আপনার হস্তে তাঁহার টাকা প্রেরণ করিব।"

দেবনাথ কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তবে আমার নিজাংশ?"

রজনী উত্তর করিলেন, "আপনাকে এক টাকা দিলাম।"

দেবনাথ প্রথমে মনে করিলেন রহস্য, কিন্তু যখন রজনী গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া যান তখন বুঝিলেন রহস্য নহে। তখন বলিলেন, "এক টাকাই আমার এক লক্ষ।"

দশম পরিচ্ছেদ।

যাহা সচরাচর ঘটে।

রাত্রি ঘনান্ধকার, অমাবস্যা। নিশীথ কালে, সমীরণ গভীর গর্জ্জন করিতেছে। তৎকর্ত্তৃক তাড়িতা হইয়া সুবর্ণপুর গ্রামের প্রান্ত বাহিনী জাহ্নবী কল কল করিতেছে। তটোপরি এক উচ্চ দেবমন্দির। গ্রামের প্রান্তভাগে বসতি নাই; কেবল সেই কল কলনাদিনী বহুজলপূর্ণা নদী, আর সেই তুঙ্গ-শিখরশালী মন্দির। নিকটে নিবিড় বন—ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ তরু, লতা, কণ্টকাদিতে দুর্ভেদ্য বন। মন্দির ভগ্ন, প্রাচীন, জনসমাগমচিহ্নশূন্য। মন্দির মধ্যে করাল মূর্ত্তি দেবী, কালী—সেই ভৌতিক রাজ্যের যোগ্য অধিষ্ঠাত্রী। সপ্তহস্তপরিমিতা, পাষাণময়ী, ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, সেই অন্ধকার স্থানে অন্ধকার করিয়া, মহাকাল হৃদয়োপরি বিরাজ করিতেছেন। দিবসে এক বৃদ্ধ বারেক মাত্র আসিয়া সামান্য প্রকারে পূজা করিয়া যাইত। রাত্রে কেহ তথা আসিত না। নিকটে শ্মশান, তথায় শবদাহ হইত। গ্রাম্য লোকে দিবসেও সেখানে আসিতে সাহস করিত না।

সেই ভয়ঙ্কর মন্দির মধ্যে রাত্রে কখন গ্রাম্য লোক দূর হইতে আলো দেখিতে পাইত। সেই আলোক দেবযোনি কর্ত্তৃক জালিত বলিয়া গ্রামবাসীদিগের বিশ্বাস ছিল। কখন কখন তথা হইতে শঙ্খধ্বনিও হইত।

অদ্য আমাবস্যার রাত্রি; এই গভীর অন্ধকারনিশীথে একজন দুঃসাহসিক গ্রামবাসী, সেই মন্দিরাভিমুখে আসিতেছিল। একবার সাহস করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, আবার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে ছিল। কখন চলিতে ছিল, কখন দাঁড়াইয়া দূরলক্ষ্য নভঃস্থ মন্দিরচূড়া নিরীক্ষণ করিতেছিল। এমত সময়ে মন্দির মধ্যে আলো জ্বলিতেছে, অকস্মাৎ তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তখন আরও সন্দিগ্ধচিত্তে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা গম্ভীর শঙ্খনাদে সেই কানন কম্পিত হইল। শুনিবামাত্র পথিক নিঃসঙ্কোচিতচিত্তে মন্দিরাভিমুখে চলিল।

মন্দিরে আসিয়া, মুক্ত পথে প্রবেশ করিয়া, ভক্তিভাবে দেবীকে প্রণাম করিল। দেখিল এক ব্রাহ্মণ রাশীকৃত জবাপুষ্প, বিল্লপত্র, রক্ত চন্দনাদির দ্বারা দেবীর পূজা করিতেছে। সদ্যশ্ছিন্ন ছাগমুণ্ড, এবং ছাগদেহ তথায় পড়িয়া রহিয়াছে। রক্তে মন্দির প্লাবিত হইতেছে।

যতক্ষণ পূজা সমাপন না হইল, ততক্ষণ আগন্তুক নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। পূজা সমাপনান্তে পূজক জিজ্ঞাসা করিল, "এখনও ত স্থিরপ্রতিজ্ঞ?"

আগন্তুক বলিল, "আমার প্রতিজ্ঞা স্থিরই আছে।"

পূজক কহিল, "তবে দেবীর পদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর।"

তখন আগন্তুক কালী প্রতিমার চরণে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, "মা জগদম্বে, আমি তোমার চরণস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন রজনীকান্ত বাঁড়ুয্যের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান থাকিবে, ততদিন আমি কায়মনোবাক্যে তাহার শত্রু। যাহাতে তাহার সর্ব্বশ্বান্ত হয়, তাহা আমি করিব।"

পূজক তখন গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, "আমার প্রতিজ্ঞা শুন। আমি জীবিত থাকিতে যে আমার পিতৃসম্পত্তি ভোগ করিবে, আমি তাহার চিরশত্রু। তাহার সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল আমি কায়মনোবাক্যে সাধিব। যদি তাহাতে অযত্ন করি তবে যেন হে জগদম্বে, আমি তোমার কোপে পতিত হই।"

তখন উভয়ে দেবীকে প্রণাম করিয়া প্রতিমাতলে উপবেশন করিল।

ইহাদিগের মধ্যে যে প্রথম হইতে মন্দিরে থাকিয়া পূজা করিতেছিল, সেই রতিকান্ত বাঁড়ুয্যে। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাহার নিরুদ্দেশের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি পরে আসিয়াছিল, সে রজনীর ভগিনীপতি দেবনাথ মুখোপাধ্যায়। রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "রজনী এখন আমার সন্ধান করিতেছে কেন, কিছু জান?"

দেবনাথ। কেহ কিছু বুঝিতে পারিতেছে না।

রতি। দেখ, আমরা যে অভিপ্রায়ে এই গুরুতর শপথ করিলাম, তাহাতে যদি পরস্পরকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করি, তবে আমাদিগের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

দেবনাথ। আমি এই দেবীর মন্দিরে বসিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে অবিশ্বাস করিতেছি না। আমি বাস্তবিক জানি না। তুমি মনে করিতেছ, যে একত্রে বাস করি, সর্ব্বদা কাছে থাকি, এ সকল কথা আমার জানিবার সম্ভাবনা, কিন্তু তাহা নহে। রজনীকান্ত সহজ লোক নহে। তাহার চরিত্রের মধ্যে কেহ কিছুমাত্র প্রবেশ করিতে পারে না।

রতি। তোমার যদি ভয় হয়, তবে তুমি আমাকে ত্যাগ করিতে পার।

দেবনাথ। আমি কালীর পদস্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছি ভয় হইলেও

আমি তোমার ক্রীতদাস। বিশেষ আমরা যে জয়ী হইব, তাহার এক বিশেষ লক্ষণ দেখিতেছি। আমাদের একজন প্রধান সহায় জুটিয়াছে।

রতি। কে?

দেব। রজনীর তৃতীয়া ভগিনী শৈলবালা। পিতৃধনে রজনী তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছে।

রতি। তাহাকে বিশ্বাস করিও না। হাজার হউক সে ভগিনী।

দেব। তুমি তাঁহাকে চেন না। সেও একটি রত্ন। সে যে আমার সহিত এক পরামর্শী, তাহার প্রমাণ স্বরূপ তোমাকে একটি সম্বাদ দিতেছি। আগামী কল্য রজনী কলিকাতায় যাইবে।

রতি। সেটা কি এমন বিশেষ সম্বাদ, তাত বুঝিলাম না।

দেব। বিশেষ সম্বাদ এই যে, রজনীর সঙ্গে অনেক নগদ টাকা যাবে।

রতি। কেন?

দেব। কেন? তুমি আজ দুই দিনের জন্য সন্ন্যাসী হইয়া কি সব ভুলিয়া গেলে! ঘরে নগদ টাকা ধরে না সুতরাং কলিকাতার ব্যাঙ্কে অথবা অন্য কোন স্থানে উহা রাখিতে যাইতেছে।

রতি। এ সম্বাদ ভাল বটে, কোন্ পথ দিয়া যাইবে?

দেব। কলিকাতায় যাইবার নৌকাপথ ভিন্ন কি আর কোন পথ আছে? কিন্তু রজনী প্রথমতঃ পাল্কীতে শ্রীধরপুর পর্য্যন্ত যাইবে, তথায় মামার বাটীতে একদিবস থাকিয়া নৌকা পথে যাইবে।

রতি। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিলাম, এক্ষণে কার্য্যে চলিলাম।

এই কথার পরে উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া স্বস্ব স্থানাভিমুখে চলিলেন। গভীর নিশীথে অমাবস্যার অন্ধকারে দেবনাথ শ্যালকগৃহে ফিরিয়া চলিলেন; কিন্তু তিনি যে ভয়ঙ্কর শপথ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল; অন্ধকারে প্রতি পদে তাঁহার ভয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পথপার্শ্বে নদীগর্ভে প্রেতভূমি। তৎপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন যেন কত প্রেতমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া বাহু তুলিয়া তাঁহাকে বলিতেছে "কি ভয়ানক শপথ!" পরিষ্কার নৈশাকাশপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, লক্ষ লক্ষ তারা তাঁহার দুর্লঙ্ঘ্য ভীষণ শপথের সাক্ষ্য দিতেছে; উজ্জ্বল নিষ্ঠুর কটাক্ষে তাঁহাকে বলিতেছে "আমরা সাক্ষ্য আছি।" দেবনাথ তখন আপনার অভিসন্ধি মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন। ভাবিলেন, "রজনীর আমি সর্ব্বনাশ করিব, কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। কিন্তু কেন? আমি রজনীর আশ্রিত, তাহার গৃহে থাকি, তাহার অন্ন খাই। তাহার পিতার অন্নে আমার শরীর। রজনীকান্ত কি আমার কোন অপকার করিয়াছে? কিছু না। তবে কেন? তবে আমাকে কিছু দেয় নাই; দেয় নাই, ইহা নিতান্ত বৈরিতার

কাজ করিয়াছে। টাকাগুলি পাইয়া এই সময়ে আমার মনের মানস সিদ্ধ করিতাম। টাকা না দিয়া রজনী আমার ইহজন্মের সুখ নষ্ট করিয়াছে। আমি তাহাকে না নষ্ট করিব কেন? কিন্তু টাকা কার? রজনীকান্তের। তবে আমার ক্ষতি কি? ক্ষতি এই, আমি রজনীকান্তকে দেখিতে পারি না; পিছনে কে?"

"পিছনে কে?" এই কথাটি দেবনাথ পরিস্ফুট স্বরে বলিলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, অন্ধকারে কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু যতক্ষণ পথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন, ততক্ষণ মধ্যে মধ্যে তাঁহার এইরূপ ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল। পরিশেষে রজনীকান্তের অট্টালিকা-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকারে সিঁড়িতে উঠিতেছিলেন এমত সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহাকে বলিল "মুখোপাধ্যায় মহাশয় এত রাত্রে একটা আলো লইলে ভাল হইত, অন্ধকারে সিঁড়িতে পা বাঁধিয়া পড়িয়া যাইবেন।"

দেবনাথ চমকিয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "কে, রজনী বাবু!"

রজনী বলিলেন, "আপনারই ভৃত্য।"

দেব। এত রাত্রে কোথায় গিয়াছিলেন?

রজনী। কোথায় যাইব? আপনার বাড়ীতেই আছি। আপনি কোথায় গিয়াছিলেন?

দেব। নিমন্ত্রণে।

দেবনাথ কম্পিত কলেবরে শয়্যাগৃহে গমন করিলেন। রজনীও আপন শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

অষ্টম প্রস্তাব।

সামরিক ব্যাপার।

সাগরগর্ভে মহার্হ রত্নসঞ্চার, এবং ঘোর নির্জ্জন অরণ্যে বিকসিত কুসুম গন্ধ প্রবাহ, লোক সমাগম তাহাতে আকর্ষিত না হইলেও, নিত্য নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। পদে পদে পরপদে দলিত দীর্ঘদিন পরাধীনা ভারতে এককালে বল, বীর্য্য, শৌর্য্য, সাহস, বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশলাদির বরপুত্রগণের আবির্ভাব, এবং তাহাদের গৌরবের উচ্চ নিশান গগনস্পর্শী হইয়া উর্দ্ডীয়মান হইত কি না, তাহাতে কি সন্দেহ হয়? রাম, লক্ষ্মণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, সর্ব্বজিৎ অর্জ্জুন, আসমুদ্র করগ্রাহী রাজরাজেশ্বর দুর্য্যোধন, জরাসন্ধ, বস্তুদেব ইত্যাদি

নাম মহাকবিগণ তাঁহাদের গীতিযোগ্য বলিয়া গান করিয়াছেন, এবং অলৌকিক ও অদ্ভুত কার্য্যকলাপহেতু অলৌকিক জীব অংশে তাঁহাদের জন্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীনগণ ভক্তিভাবে সেই সকল শুনিয়া অখণ্ডনীয় সত্য জ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরাও সেই সকল শুনিতেছি কিন্তু পূর্ব্বকালের বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন তুমি বিশ্বাস কর না, আমি করি, এইরূপ। তোমার প্রমাণ, খৃঃ পূঃ ৪০০৪ সঙ্গে মিস খায় না বা তদ্রূপ সারবান্ যুক্তি, আমারও প্রমাণ খৃঃ পূঃ ৪০০৪ মানিনা বা তদ্রূপ; সুতরাং বিশ্বাস করা না করার প্রমাণ উভয় পক্ষেই দৃঢ়তায় সমান। এ বিবাদ স্থলে কাজেই স্বীকার করিতে হয় যে, প্রাচীনা ভারতের গৌরব স্থলে আলেকজণ্ডার, সিজর, হানিবল বা নেপোলিয়নের ন্যায় যোদ্ধা; গ্রিসীয় কডরস বা হেলবিটির উইঙ্কিলরিডের ন্যায় স্বদেশ হিতৈষিতায় আত্ম বা আত্মতুল্য প্রাণঘাতী; অথবা মারাথন বা থার্ম্মপিলির ন্যায় তীর্থক্ষেত্র, ঐতিহাসিক সন্দেহবিহীন হইয়া এবং সর্ব্ববাদিসম্মত ভাবে উল্লেখ করিবার নাই। প্রাচীনা ভারতের ঐতিহাসিক বিষয়ের অধিকাংশই কালগর্ভে নিহিত হইয়াছে। বর্ণজ্ঞানশূন্য নবমাংসভোজী আজ্‌টেক জাতিও ইতিবৃত্ত রক্ষণের মর্ম্ম বুঝিয়াছিল, কিন্তু কি দুর্ভাগ্য যে আর্য্যসন্তানেরা উচ্চ বিদ্যাবিশারদ হইয়াও তাহার মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হয়েন নাই! যাহা হউক, সে সকল তৎকারণ বশতঃ যদিও কালগর্ভে নিহিত হউক এবং নাম বিশেষের উল্লেখ নাই পাওয়া যাউক, কিন্তু যদি সে সময়ের লোকচরিত্র এবং সমাজচিত্র জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই সেই লুপ্ত বিষয়ের আভাস উপলব্ধ করিতে অল্পক্ষণই লাগিয়া থাকে। লোকচরিত্র সমূহের সঙ্ঘটনে সমাজচিত্র। যে সমাজের বিবরণ আলোচনায় দেখা যায় যে, বিদ্যা-বুদ্ধি, বল, বীর্য্য, বীরত্ব ইত্যাদি তাহার প্রতিপর্ব্বে প্রতিফলিত, সে সমাজের লোক চরিত্রও সুতরাং বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, বীর্য্য, বীরত্ব ইত্যাদিদ্বারা নির্ম্মিত। প্রাচীনা ভারতের লোকচরিত্র ও সমাজ চিত্র তদ্রূপ। অতএব লোকস্মৃতি কাল সমীপে দুর্দ্দমনীয় হইলে, নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে নাম বিশেষের যে উল্লেখ পাওয়া যাইত না, ইহা কখনই হইতে পারে না। ভারতের ঐতিহাসিক তত্ত্বের যখনই কিঞ্চিৎ টুকরা উদ্ধার হয়, তখনই দেখিতে পাই যে তাহা কোন না কোন মহাপুরুষের নামে ধ্বনিত। ফলতঃ যে জাতি স্মৃতিবহির্ভূত সময়ে উত্তর কুরুবর্ষ পরিত্যাগাবধি, ডাহিরের পরাজয় বা দাসানুদাস কুতবুদ্দিনের ভারতে আগমন পর্য্যন্ত, পরাধীনতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না, যাহার বংশাবলী অদ্ভুত বীরত্বে জগজ্জেতা আলেকজণ্ডারকেও স্তম্ভিত করিয়াছিল, যাহার বংশাবলী রোম সম্রাট্ আগষ্টসের সহ সখিত্বনিবন্ধন তাঁহার

সভায় দূত প্রেরণ দ্বারা রাজতত্ব মীমাংসা করিতেন, যাহার বংশাবলী গ্রীকভূমি পরাজয়ার্থ পারস্যরাজের সৈন্যমধ্যে গণনীয় পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহার বংশাবলী জ্যোতিষ এবং অঙ্কশাস্ত্রে জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং যাহার বংশাবলী ভূমণ্ডলের অর্দ্ধ খণ্ডেরও ধর্ম্মদাতা, সেই জাতি যে প্রাচীনকালে কোন গৌরবযুক্ত নামের কাঙ্গাল ছিল, একথা শুনিব না, এবং শুনিবার যোগ্যও নহে। কিন্তু সেই সকল নাম কালকবলে নিহিত বা উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে;—সেই সকল পূজনীয় নাম সাগরগর্ভস্থিত মহার্হ রত্ন এবং বিজন অরণ্যস্থিত সুবাস কুসুমের সহ সমভাবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

বাল্মীকির সাময়িক সমাজ বীরবীর্য্য সাহস ইত্যাদির দ্বারা প্রতিপর্ব্বে প্রতিফলিত। রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ড বীরত্ব সাহস এবং স্বপক্ষ হিতৈষিতার আভাসে পরিপূর্ণ। যুদ্ধকৌশল এবং স্বপক্ষ রক্ষণচাতুর্য্য নাবাবিধ ও চমৎকার। যুদ্ধপ্রণালী ব্যূহ রচনাপ্রভৃতি, হোমারিক সময়ের তত্তৎ বিষয়ের সহ সমজাতীয়। যুদ্ধস্থলে সেনাপতিই সর্ব্বে সর্ব্বা, তাহাদের হারিজিতের উপর যুদ্ধের ফল প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া থাকে। আনুষঙ্গিক সৈন্যগণ পশুবৎ মরিতেছে ও মারিতেছে। জয়োদ্দেশ্য নগর সকল প্রাকার পরিখায় সমাবৃত, শত্রুগণের পক্ষে সহসা সুগম নহে। দেশরক্ষার্থে যদ্রূপ দুর্গাদি স্থাপিত, রক্ষিত এবং অবরোধকালীন ও অসময়ের নিমিত্ত দুর্গে যেরূপ দ্রব্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত, রাজধর্ম্ম প্রস্তাবে তাহা যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে।

সৈন্য চারিবিধ। হস্তী, অশ্ব, এবং রথে আরোহণ করিয়া যাহারা যুদ্ধ করে, তাহারা এবং পদাতি।(১) অস্ত্র নানাবিধ। শরাসন, চর্ম্ম, শর, খড়্গ, মুদ্গর, পট্টিশ, শূল, পরশু, চক্র, তোমর, শক্তি, পরিঘ, গদা ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত শতঘ্নী নামক অস্ত্রের বহুল উল্লেখ আছে।(২) রামায়ণের প্রথমকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গে, বিশ্বামিত্র যেস্থলে রামকে মন্ত্রপূত বহু অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তথায় অভূতপূর্ব্ব অশ্রুত বহু বিকট নামযুক্ত অস্ত্র সমূহের নামোল্লেখ আছে। উহা কবি কল্পনার পরাকাষ্ঠা। যাহা হউক উপরে যেরূপ অস্ত্র শস্ত্র এবং চতুর্ব্বিধ সৈন্যের বিষয় কথিত হইল, তাহাই প্রামাণিক এবং সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। গ্রীকভূমে ৪৭৯ খৃঃ পূঃ প্লেটিয়ার যুদ্ধে জরকসিসের পক্ষে যতগুলি ভারতীয় সেনা ছিল, তাহারা পদাতি এবং অশ্বারোহী এই দুই অংশে বিভক্ত ছিল। ইহারা কিরূপ ভারতীয় তাহা বলিতে পারি না। ইহাদের বৃত্তান্ত হিরোডোটস তাঁহার পুস্তকে(৩) যদ্রূপ প্রদান করিয়াছেন, উপরি

(১) বেদে দ্বিবিধ সৈন্য দৃষ্টি হয়, রথী ও পদাতি।

(২) বঙ্গদর্শন ২য় সংখ্যা ৪৯৪ পৃষ্ঠা এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রস্তাব দেখ।

(৩) Herodotus Book VII. 65. 86, IX 28 32.

কথিত বৃত্তান্তের সহ তাহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ভারতীয়েরা কখন সমুদ্রযুদ্ধ করিয়াছিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না, বাল্মীকিতে তৎসম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। নদী প্রভৃতিতে নৌযুদ্ধের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। রামায়ণের দ্বিতীয়কাণ্ডে ৮৪ সর্গে রামের অনুসরণে যখন ভরত চিত্রকূট গমন করেন, সেই সময়ে তিনি নিষাদরাজ্যে আগমন করিলে, গুহ তাঁহার দুরভিসন্ধি সন্দেহ করিয়া গমনে বাধা দিবার নিমিত্ত অন্যান্য সৈন্য সমাবেশের আজ্ঞা দিয়া কহিতেছেন।

"নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্ত্তানাং শতং শতম্।

সন্নদ্ধানাং তথা যূনাস্তিষ্ঠন্তিত্যভ্যচোদয়ৎ॥"৮

"অসংখ্য কৈবর্ত্তযুবা কবচাদিধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধ প্রতীক্ষায় পঞ্চশত নৌকায় আরোহণ করিয়া রহুক।" ইহার সাদৃশ্য মেক্সিকোবাসীদিগের তেজকুকো হ্রদের নৌযুদ্ধে দৃষ্ট হয়। এই নৌযুদ্ধের বলে স্পানিয়ার্ডরা একরাত্রে এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েন যে 'আজি পর্য্যন্ত তাহা "মহাকুরাত্র" (Noche Triste) বলিয়া স্মরণ করিয়া থাকেন।

উপরে যত প্রকার অস্ত্রের বিষয় কথিত হইল, তাহার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ অস্ত্রবিশেষে পারদর্শিতালাভ করিয়া খ্যাতিযুক্ত হইতেন। কিন্তু সাধারণতঃ ধনুর্ব্বানেরই যুদ্ধকালীন বহু ব্যবহার লক্ষিত হয়। যোদ্ধারা প্রায় এইরূপ সাজে সজ্জিত হইতেন। শরীর বর্ম্মাবৃত, শিরে শিরস্ত্রাণ, পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তূণ, কটিতে লম্বমান খড়্গ, এবং শরাকর্ষণ নিমিত্ত অঙ্গুলিতে গোধাচর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ। রথের আকার এরূপ একস্থানে দেওয়া আছে।

"তং মেরুশিখরাকারং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্।

হেমচক্রমসম্বাধং বৈদুর্য্যময়কুবরম্॥১৩

মৎস্যৈঃ পুষ্পৈদ্রুমৈঃ শৈলৈশ্চন্দ্রসূর্য্যৈশ্চ কাঞ্চনৈঃ।

মাঙ্গল্যৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈশ্চ তারাভিশ্চ সমাবৃতম্॥১৪

ধ্বজনিস্ত্রিংশ সম্পন্নং কিঙ্কিণীভির্বিভূষিতম্।

সদশ্বযুক্ত——————॥১৫" ৩।২২

উহা মেরু শিখরাকার (তদ্বৎউন্নত) তপ্তকাঞ্চনভূষিত, হেমচক্র ও বৈদুর্য্যময় কূবর সম্বলিত। উহাতে কাঞ্চন নির্ম্মিত নানাবিধ মৎস্য, পুষ্প, বৃক্ষ, পর্ব্বত, চন্দ্র সূর্য্য, মাঙ্গল্য পক্ষী এবং তারাগণে ইতস্ততঃ পরিবৃত। ধ্বজ এবং খড়্গ সম্পন্ন, কিঙ্কিণীজালে বিভূষিত ও উত্তম অশ্বদ্বারা বাহিত।(৪)

রথের সারথ্য সম্ভ্রান্ত বা বন্ধুদ্বারাও সম্পন্ন হইত। জাতীয় ধ্বজ এবং যুদ্ধকালীন ধ্বজবহন যখন বৈদিক সময়েও দৃষ্ট হয়,(৫) তখন যে রামায়ণের সময়েও

(৪) রথের আকারাদি সম্বন্ধে বৈদিক সময়ের বৃত্তান্ত ঋঃ বেঃ ৫ ৬২-৬, ৬-২৯ ২, ৮-৩৩-১১, ১ ৬ ২ ইত্যাদি দেখ।

(৫) "যত্র নরঃ সময়ন্তে কৃতধ্বজঃ" —১০-১০৩ ঋঃ বে।

তাহা ছিল, তাহার জ্ঞাপনার্থে উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। রঘুবংশীয় রাজাদিগের ধ্বজের নাম কোবিদার ধ্বজ। নিষাদরাজ গুহের ধ্বজের নাম স্বস্তিকা। ইত্যাদি।

এই সময়ে মল্লযুদ্ধেরও বিশেষ আড়ম্বর দেখা যায়, সুতরাং যুদ্ধকৌশলের ন্যায় দৈহিক বলেরও বিশেষ আদর। সীতা স্বয়ম্বরে রামের দৈহিকবলপরীক্ষা ধনু উত্তোলন ও ভঙ্গে অভিনীত হইয়াছিল। রাম বালিবধে সমর্থ হইবেন কি না সুগ্রীব তাহা পরীক্ষার্থে ও রামের দৈহিক বল অবধারণার্থে, মৃত দুন্দভির কঙ্কাল দেখাইয়া পদে উত্তোলনপূর্ব্বক নিঃক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বালি দুন্দভির যুদ্ধ মল্লযুদ্ধ, সুগ্রীব বালির যুদ্ধও মল্লযুদ্ধ। ইত্যাদি।(৬) মল্লযুদ্ধ কিরূপ হইত, একস্থান হইতে দেখাইব। বালি ও সুগ্রীবে যুদ্ধ হইতেছে। প্রথমে ক্ষণেক বাগ্‌যুদ্ধ হইল, তৎপরে "বালি সুগ্রীবকে বেগে আক্রমণপূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন পর্ব্বত হইতে জলপ্রপাতের ন্যায় সুগ্রীবের সর্ব্বাঙ্গ হইতে শোণিতপাত হইতে লাগিল। তিনি নির্ভয় হইয়া তৎক্ষণাৎ মহাবেগে এক শাল বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক, যেমন পর্ব্বতের উপর বজ্রনিক্ষেপ করে, সেইরূপ বালির উপর তাহা নিক্ষেপ করিলেন। তখন বালি বৃক্ষপ্রহারে ভগ্ন হইয়া সাগরমধ্যে গুরুভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। উভয়ে ভীমবল ও পরাক্রান্ত, উভয়ের বেগ গরুড়ের তুল্য প্রবল, উভয়ে ভীমমূর্ত্তি ও রণদক্ষ এবং উভয়েই পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণে তৎপর। তৎকালে উঁহারা আকাশের চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন এবং তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, শাখাবহুল বৃক্ষ, শৈলশৃঙ্গ, বজ্রকোটিপ্রখর নখ, মুষ্টি, জানু, পদ, ও হস্তদ্বারা পরস্পরকে বারম্বার প্রহার করিতে লাগিলেন।"(৭)

বৃহৎ যুদ্ধাদির ব্যবস্থা এরূপ। (৮) চতুর্ব্বিধ সৈন্য যথাক্রমে ব্যূহ রচনা করিয়া শিরস্ত্রাণ বর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা শরীর আবরিত

(৬) মহাভারতেও ইহার বহুবিস্তার। আদিপর্ব্বে—
"যদাশ্রৌষং জরাসন্ধং ক্ষত্রমধ্যে জ্বলন্তং, দোর্ভ্যাং হতং ভীমসেনেন।" ইত্যাদি।

(৭) এখানে নিজে অনুবাদের পরিশ্রম বাঁচাইয়া পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক এই অনুবাদ টুকু গ্রহণ করিলাম। ইহা আমার উপরি লাভ।

(৮) এই সংগ্রাম পদ্ধতির সহ নিম্নলিখিত সংগ্রাম পদ্ধতি মিলাইয়া দেখায় আমোদ আছে। গ্রীকদিগের যুদ্ধবৃত্তান্ত সম্বন্ধে গ্রোট এরূপ লেখেন। "The mode of fighting among the Homeric heroes is not less different from the historical times, than the materials of which their arms were composed. In historical Greece, the Hoplites or the heavy-armed infantry, maintained a close order and well-dressed line, charging the enemy with their spears protended at even distance, and coming thus to close conflict without breaking their rank: there were spe

করিয়া যথাযোগ্য অস্ত্রহস্তে দণ্ডায়মান হইল। রণবাদ্য নির্ঘোষে চতুর্দ্দিক্ আন্দোলিত হইল। উভয়দিকে সিংহনাদ ধনুষ্টঙ্কার এবং শঙ্খনাদ হইতে লাগিল, তৎপরে বাগ্-যুদ্ধ। তৎপরে যদৃচ্ছা কি ধর্ম্মযুদ্ধ হইবে তাহা নিরূপণ হইয়া যুদ্ধ

---

cial troops, bowman, slingers, &c. armed with missiles, but the hoplite had no weapon to employ in this manner. The heroes of the Iliad and Odyssey, on the contrary, habitually employ the spear as a missile which they launch with tremendous force: each of them is mounted in his war chariot drawn by two horses and calculated to contain the warrior and his charioteer, in which latter capacity a friend or comrade will sometimes consent to serve. Advancing in his chariot at full speed, in front of his own soldiers, he hurls his spear against the enemy: sometimes indeed he will fight on foot and hand to hand, but the chariot is usually near to receive him if he chooses, or to ensure his retreat. The men of Greeks and Trojans coming forward to the charge, without any regular steps or evenly maintained line, making their attack in the same way by hurling their spears. Each chief wears habitually a long sword and a short dagger, besides his two spears to be launched forward—the spear being also used, if occasion serves, as a weapon or thrust. Every man is protected by shield; helmet, breastplate and greaves, but the armour of the chiefs is greatly superior to that of the common men, while they themselves are more strong and more expert in the use of their weapons. There are a few bowmen, as rare exceptions, but the general equipment and proceeding is as here described"—*Grote's Greece.* Vol. I pp. 494. এক্ষণে দেখিবে যে হোমারের বর্ণিত রণবৃত্তান্ত বাল্মীকির সহ কত সামান্য অন্তর। ফলতঃ জগতের সকল আদিম সভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতির রণপাণ্ডিত্য প্রায় এইরূপ। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর এক অর্দ্ধসভ্য জাতির রণবৃত্তান্তের সহ মিলাইয়া দেখ। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু রাজ্যের আদিম অধিবাসীরা স্পেনিয়ার্ডদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে।—" Many of the Indians were armed with lances handed with copper tempered almost to the hardness of steel, and with huge maces and battle-axes of the same metal. Their defensive armour, also, was in many respects excellent, consisting of stout doublets of quilted cotton, shields covered with skins, and casques richly ornamented with gold and jewels, or sometimes made like those of the Mexicans, in the fantastic shape of the heads of wild animals, garnished with rows of teeth that grinned horribly above the visage of the warrior..........the Spaniards were roused by the hideous clamour of conch, trumpet, and atabal, mingled with the fierce war-cries of the barbarians, as they let off volleys of missiles of every description,.........But others did more serious execution. These were burning arrows, and red-hot stones wrapped in cotton that had been steeped in same bituminous substance, which scattering long trains of light through the air fell on the roofs of the buildings, and speedily set them on fire. &c.—*Prercott conquest of Peru.*

বাজিল। রথীতে রথীতে, পদাতিতে পদাতিতে, অশ্বে অশ্বে, গজে গজে, মল্লে মল্লে যুদ্ধ হইতে লাগিল। ধর্ম্মযুদ্ধ হইলে, যে দুই জনে যুদ্ধ হইতেছে, তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। রণে যে পৃষ্ঠ দিবে, তাহার হারি হইল, তাহার প্রতি আর কেহ আক্রমণ করিবে না। সেনাপতির পরাজয় যতক্ষণ না হইবে, ততক্ষণ যুদ্ধের ফল অনিশ্চিত। যুদ্ধকালীন পূর্ব্বকথিত অস্ত্র সকল যথাযোগ্য ভাবে ব্যবহৃত হইত। যদৃচ্ছা যুদ্ধের নিয়ম নাই, ছলে কৌশলে যে যেরূপে পারিবে সে সেইরূপে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিবে। সমজাতীয় সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ হইলে অস্ত্রব্যবহার সময়ানুসারে যাহার যাহাতে সুবিধা তদনুসারী। উভয়দল অন্তরে থাকিলে শর, শিলা, অগ্নি প্রভৃতি নিক্ষেপ দ্বারা যুদ্ধ, এবং সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া উভয় দলে মিশামিশি হইলে গদা খড়্গ শূল পরশু প্রভৃতি দ্বারা যুদ্ধ হইত। প্রথমে ব্যূহ রচনা দ্বারা সৈন্য সমাবেশ হইত বটে, কিন্তু উভয়দল মিশামিশি হওয়ার পর আর তাহা রক্ষিত হইত না। বিপক্ষ দলের প্রধান চেষ্টা সর্ব্ব প্রথমে ব্যূহভেদ করা। যুদ্ধারম্ভেই যে পক্ষের ব্যূহভেদ হইত, সে যুদ্ধে তাহার আশা বড় অধিক থাকিত না। সেনাপতিরা বিবিধ মণি রত্নাদি বীরসাজসহ ধারণ করিয়া ধ্বজপতাকাশোভিত রথারোহণে সর্ব্বদাই থাকিতেন, এবং তথা হইতে ধনুর্ব্বাণাদির দ্বারা অপর পক্ষের সেনাপতির সহ যুদ্ধ করিতেন। উভয় সেনাপতি কখন কখন ভূতলে নামিয়া মল্লযুদ্ধেও প্রবৃত্ত হইতেন। ইহাদের পার্শ্বে আরও রথ থাকিত, পূর্ব্ব রথ ভগ্ন হইলে অপর রথে আরোহণ করিতেন; এবং সেনাপতি রণক্লান্ত ও মূর্চ্ছিত হইলে, সারথি আপন বিবেচনা অনুসারে পলায়ন দ্বারা রথীর প্রাণ রক্ষা করিতেন। এই দুই কারণেই অনেক সময় রামের সহ যুদ্ধে রাবণের প্রাণ বাঁচিয়াছিল, এবং শেষোক্ত কারণ হেতু সারথি গর্ব্বিত রাবণের নিকট অনেক বার তিরস্কারও সহ্য করিয়াছিল।

রামায়ণের সকল যুদ্ধের বর্ণনা দৃষ্টে উপরে ঐ সারাংশ সম্ভব বোধে সঙ্কলিত হইল, নতুবা রামায়ণের অবিকল বর্ণিত যুদ্ধ অদ্ভুত জিনিস। উহাতে বৃক্ষ পর্ব্বত পর্য্যন্ত অস্ত্রমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। একজন লক্ষ জনের লক্ষ শর নিবারক, লক্ষজনের একজন বিনাশক, কোথাও বা একপক্ষে অসংখ্য সৈন্য, অপর পক্ষে একাকী একটি বীর। এসকল লোকে অসম্ভব, কবিকল্পনায়ও তাহাই, কেবল বাল্মীকির ন্যায় তেজস্বী কবিকল্পনাতেই সম্ভব। বাল্মীকি ঋষি, যুদ্ধ চক্ষে কখন দেখিয়াছিলেন কি না তাহা তিনিই জানেন, বোধ হয় জনশ্রুতি, অথবা কল্পনাই তাঁহার যুদ্ধবর্ণনের মূলমন্ত্র। বাল্মীকিবর্ণিত সংগ্রাম ক্রিয়ার উপর আমি এক বিন্দুও বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহি, কিন্তু তাঁহা কর্ত্তৃক বর্ণিত অস্ত্র শস্ত্র

সাজ ও সেনানিবেশ যাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সম্ভব বোধে বিশ্বাস করিব; যেহেতু সেই সকল বিষয় রণস্থলগামী না হইলেও ঘরে বসিয়া অক্লেশে জ্ঞাত হইতে পারা যায়, এবং সর্ব্বদর্শী, বহুবিদ্যাবিশারদ ও সর্ব্বজনপূজনীয় একজন মহর্ষি যে তাহা জ্ঞাত না হইয়াছেন একথা অসম্ভব। যখন আমরা বাল্মীকির সাময়িক অস্ত্র শস্ত্র সাজ ও সেনানিবেশ একরূপ নিঃসন্দেহ ভাবে জ্ঞাত হইতেছি, এবং যখন দেখিতেছি যে সেই সকল, আদিম সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতিদের তত্তৎ বিষয়ের সহ কিছু কিছু ইতর বিশেষতা ব্যতীত সমজাতীয়, আবার সেই সেই আদিম সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতিদের মধ্যে সমর প্রণালী প্রায়ই একজাতীয়, তখন বাল্মীকির সাময়িক সমরপ্রণালীও যে তদ্বৎ সমজাতিত্ব বিশিষ্ট হইবে তাহাতে বিচিত্র কি?

রাবণ ও রামের নিমিত্ত সুগ্রীবের সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা দৃষ্টে স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, প্রত্যেক রাজেশ্বরের আত্মরাজধানী রক্ষণার্থে যাহা আবশ্যক সেই পরিমাণে বেতনভোগী সৈন্য রক্ষিত হইত। অধীনস্থ সম্ভ্রান্তগণ যাহারা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট সীমায় রাজাকে করমাত্র প্রদান করিয়া একাধিপত্য করিত, তাহাদিগকে রাজার যুদ্ধ সময়ে অধীনস্থ সৈন্যগণ এবং আত্মপ্রদানে রাজাকে সাহায্য করিতে হইত। সম্ভ্রান্তগণ ডাকিবামাত্র ক্ষত্রিয় প্রজাবর্গকে যুদ্ধার্থে আপন আপন অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তদাজ্ঞানুবর্ত্তিতায় উপস্থিত হইতে হইত। অস্ত্র ব্যবহারসময় ব্যতীত তাহারা জীবিকার্থে যদৃচ্ছা আত্মবৃত্তি অথবা শূদ্রের ঊর্দ্ধে অপর যে কোন বৃত্তির অনুসরণ করিত। সৈন্যমধ্যে শক কিরাত যবনাদির উল্লেখ দেখা যায়, এজন্য বোধ হয় তাহারাও নির্দ্ধারিত বেতন বা বৃত্তিভোগে সৈনিক শ্রেণীভুক্ত হইত। যে ব্যক্তি আপন প্রভুর আহ্বান মত অস্ত্রহস্তে আসিতে কোন কারণে সমর্থ না হইত, তাহারা তন্নিমিত্ত ইউরোপীয় ফিউডাল সাময়িক এসকুয়েজ (escuage) নামক করের ন্যায় ক্ষতিপূরক কোন কর দিতে বাধ্য ছিল কি না, তাহা জানি না। সৈন্য সংগ্রহ প্রথা যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে প্রজারা যখন প্রভুর আদেশমত অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ ও যুদ্ধে গমন ব্যতীত অপর সময় যদৃচ্ছা অতিবাহিত করিত, তখন, এমন অবস্থায়, তাহারা দৈহিক বলের পরিচালনা যদিও ঘরে ঘরে করিত, কিন্তু নিত্য নূতন যুদ্ধ কৌশল শিক্ষার সুযোগ অল্পই পাইত; সুতরাং তাহারা যে রণস্থলে পালে পালে নিপাত হইত ও করিত ইহা অসম্ভব নহে। কেবল যাহারা বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ও নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনে পটু, এবং যাহাদের অশিক্ষার সহিত প্রভুত্বহানিরূপ ফল যোজিত, তাহাদিগকে কাজেই নানা রূপ উপায়ে এবং গরজে বহুতর যুদ্ধ-কৌশলী হইতে হইত। এই নিমিত্তই বোধ হয় প্রাচীন সাময়িক যুদ্ধের জয় পরাজয়

তদ্রূপ লোকের একা যুদ্ধে একা জয় পরাজয়ের উপরেই অধিক নির্ভর করিত।

উৎকৃষ্ট কৌশলে এবং উৎকৃষ্ট অস্ত্রে রামের জয়ে এবং তদ্বিপরীতে রাবণের পরাজয়ে আমাদের পক্ষে সুন্দর শিক্ষা দেদীপ্যমান আছে। মানসিক উন্নতির উপর জাতীয় সর্ব্বপ্রকার গৌরব নির্ভর করে। সাহস ও বীরত্ব জনিত গৌরব ইহার বহির্ভূত নহে। সাহস এবং বীরত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য স্বাধীনতা বা জাতীয় স্বভাব ও অবস্থা অনুসারে তদ্বৎ বাঞ্ছনীয় অভাব পরিপূরণ। স্বাধীনতার জন্য অকাতরে রক্তপাত সাধারণতঃ মনুষ্যের দ্বিবিধ অবস্থায় দেখা গিয়া থাকে। এক বনবিহঙ্গ প্রায় স্বচ্ছন্দচারী মানব, যাহার এ জগতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহার উৎকর্ষতা জনিত মমতা স্বাধীনতার মমতাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ। অপর, যাহারা চিত্তের অত্যুৎকর্ষতা লাভ হেতু নিরাপদে তাহার বেগপ্রবাহের জন্য পদে পদে স্বাধীনতার আবশ্যকতা অবলোকন করিয়া থাকে। প্রথমটির সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল পেরু মেক্সিকো প্রভৃতি, দ্বিতীয়টির তদ্রূপ সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল গ্রানেডা হইতে মুসলমান এবং ইউনাইটেড ষ্টেট হইতে ইংরেজ নির্ব্বাসন প্রভৃতি। মধ্যমাবস্থার সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল লক্ষ্মণ সেনের বাঙ্গালা দেশ, অথবা রোম, গ্রীস ও ভারতের অধঃপতন। এই অসামান্য দেশত্রয়ে যখনই অত্যুৎকৃষ্ট মানসিক উৎকর্ষতার হ্রাস হইয়াছে, তখনই তাহারা অধঃপাতে গিয়াছে।

কিন্তু সাহস ও বীরত্বে অভীষ্ট সিদ্ধ কিরূপে হইতে পারে, তাহা বিবেচ্য। অনেকের বিশ্বাস ইহার মূল এক মাত্র দৈহিক বল। একথা অগ্রাহ্য, তবে দৈহিকবল আংশিক বটে, কোন স্থানে তাহাও এত বিলুপ্ত ভাবে থাকে যে তাহা নজরে আসে না। সকলের মূল বাসনা এবং কৌশল। আবার এখানেও অনেকের বিশ্বাস যে বাসনার মূল গায়ের জোর, একথাও শুনিব না। তেজ দ্বারা বাসনার কতক পরিমাণ হয়। কিন্তু তেজ আমরা কাহাদিগেতে দেখিতে পাই? এক জাতির স্বাধীনতায়, অপর চিত্তের উৎকর্ষতায়। কুকি সাঁওতালের যে তেজ আছে, দুর্ভাগ্য বঙ্গসন্তানের তাহা নাই। আবার এক্ষণকার ক্ষীণজীবী বঙ্গসন্তানের যে তেজ লক্ষিত হইতেছে, 'ডাইল রুটি' ভোজী সবলকায় হিন্দুস্থানিতে তাহা লক্ষিত হয় না। পুনশ্চ শুনিতে পাই আমাদিগের স্বর্গীয় বংশরক্ষকেরা তাল মারিয়া বৃহৎ গাছকেও দোদুল্যমান করিতেন, কিন্তু পেয়াদা দেখিলেই গৃহিণীর আঁচল ধরিয়া পিছনে লুকাইতেন; তেজ বিষয়ে তাঁহাদের এবং তাঁহাদের নির্জ্জীব উত্তর পুরুষমধ্যে কত অন্তরতা। ফলতঃ বাসনার মূল পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, অনুন্নত সমাজে পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত স্বাধীনতার ভাব, এবং উন্নত সমাজে মানসিক উৎকর্ষতায় অভাব

বোধ। কিন্তু কৌশলের মূল সর্ব্বসময়েই মানসিক উৎকর্ষতা। এই উৎকর্ষতা যখন যেরূপ পুষ্টতা ধারণ করে, তখন কৌশলও সেই অনুসারে অঙ্গসম্পন্ন হয়। যেখানে বাসনা, কৌশল এবং দৈহিক বলের একত্র সমাবেশ, সেখানকার মঙ্গলের আর কথা কি আছে। যেখানে তদভাবে কেবল কৌশল ও বাসনা প্রবলা সেখানেও জয়শ্রী বিচরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল দৈহিক বল, বা দৈহিক বল ও বাসনা, অথবা দৈহিক বল, বাসনা ও অধম কৌশল এ তিন একত্র হইলেও, প্রবলা বাসনাও উন্নত কৌশলের ফলের নিকট পরাজিত হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ। যখন সপ্ত ঋষি কেবল কয়েকজন মাত্র স্বদলস্থ লোক লইয়া ভারতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন অনার্য্য দস্যুরা এই ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া বাস করিত। আর্য্যগণের তুলনে, তাহারা সংখ্যায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী বালুকাবৎ। বলেও সামান্য ছিল না, সভ্যের অপেক্ষা, আহারপ্রচুর দেশের অসভ্যের গায়ের জোর এবং কষ্টসহিষ্ণুতা অধিক; দ্বিতীয়তঃ গড়ে তাহাদের এবং আর্য্যদের বল তুলনা করিলে, শেষোক্তেরা সিংহের নিকট মশক সদৃশ বোধ হইবে। পুনশ্চ তাহাদের বাসনাও বিপুল ছিল, নতুবা তাহারা এত রক্তপাত করিতে পারিত না। তথাপি আর্য্যদিগের নিকট পরাজিত হইয়া দাসত্ব, অতি অধম দাসত্ব স্বীকার করিতে হইল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, আর্য্যেরা অল্পবল ও অল্পসংখ্যক বটে, কিন্তু ইহাদের বাসনা অনার্য্যদের সঙ্গে সমান দৃঢ়, মানসিক উৎকর্ষতা অত্যন্ত অধিক, সুতরাং ইহার কৌশলী ও কৃত্রিম বলে বলী।

ঐরূপ মেক্সিকো দেখ। যখন কোর্টেস কেবল চারিশত পদাতি ও পনেরটি অশ্ব লইয়া ল্লাসকালায় (Tlascala) উপস্থিত হয়েন, তখন অধিবাসীরা স্বদলের সহস্র সহস্র নিপাত হইলেও, কিরূপ সাহস ও বীরত্ব সহ বারম্বার স্বদেশরক্ষণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাদের অধিনায়ক জিকো-তেঙ্কাতল (Xicotencatl) কতই সাহসিকতা, কতই স্বদেশপ্রিয়তা, কতই যুদ্ধামোদিতা দেখাইয়াছিল। ইহার স্বভাব চরিত্র আলোচনায় এরূপ বোধহয় যে এই দুর্ভাগ্য ইণ্ডিয়ান যদি অনুকূল সময় ও সমাজে পতিত হইত, তাহা হইলে বিখ্যাতনামা নূতন পুরাতন অনেক মহাবীরের যশোরবি মলিন করিয়া ফেলিত, কিন্তু এটিও অরণ্য কুসুম। এততেও কোর্টেসের পক্ষে ৫০ জন মাত্র হত হইল বটে, কিন্তু সমস্ত লাসকালা অর্দ্ধলক্ষের অধিক কোর্টেসকে বলি দিয়া তাহার পদানত হইল। তৎপরে কোর্টেস অবশিষ্ট ৩৬৫ জন লইয়া সদর্পে সমস্ত আনাহুক সাম্রাজ্যের রাজধানী টিনক্টিটলানে উপনীত হইলেন। এই সাম্রাজ্যের দেববৎ পূজিত অদ্বিতীয় অধীশ্বর কোর্টেসের অনুচর বিলাসকেজের ভ্রূকুটীভঙ্গীতে ভয় পাইয়া

স্পেনীয়দিগের মন্দিরে আবদ্ধ হইলেন। যাহার ভ্রূকুটীমাত্রে আমূল আনাহক কম্পিত হইত, যাহার অঙ্গুলি হেলনে পতঙ্গপালের ন্যায় সৈনিক আসিয়া প্রাণদান করিতে সম্মত, সম্রান্তের স্কন্ধ ব্যতীত যাহার যানের অভাব, অল্পক্ষণ পরে তাহারই হাতে কোর্টেস হাতকড়ি লাগাইলেন। ইহার মূল, বাসনা এবং উৎকর্ষতাজনিত কৌশল ও কৃত্রিম বল। স্বদেশরক্ষণে মেক্সিকোবাসীরা যত রক্তপাত করিয়াছে, এক পেরু ভিন্ন কোন ইতিহাসে তাহার তুলনা দেখা যায় না। ঐরূপ জরক্সিসের সঙ্গে গ্রীকজাতির যুদ্ধেও উৎকর্ষতার জয়শ্রী কেমন তেজোদীপ্ত লাবণ্যময়ী। বিপুল বল ও বিপুল দেহ বিশিষ্ট সৈনিক মণ্ডলের অধিনায়ক রুসিয়ারাজ পিটর, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্যেশ্বর এবং ক্ষুদ্রসেনার অধিনায়ক দ্বাদশ চার্লশ কর্ত্তৃক কিরূপ হতশ্রী হইয়াছিলেন! পিটর তখন খেদে বলিয়াছিলেন যে, সুইডরা তাহাদিগেরই সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত এরূপ ভাবে বিপক্ষকে রণকৌশল শিক্ষা দিতেছে। পিটরের ন্যায় ব্যক্তিই কেবল এবাক্যের সত্যতা সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। এ বিষয়ে আর উদাহরণ প্রয়োগ অনাবশ্যক।

আবার দেখ, যে ওয়ালিদ খলিফ আসমুদ্র করগ্রাহী সম্রাট্, উদয়গিরি হইতে অস্তাচল পর্য্যন্ত যাহার রাজত্ব বিস্তার, তিনিও ভারতে সিন্ধু প্রদেশের অংশমাত্র জয় করিয়া রক্ষণে সমর্থ হইলেন না, কিন্তু দাসানুদাস কুতবুদ্দিন স্বচ্ছন্দে ভারত সিংহাসনে আরোহণ করিল। যে রোমরাজ্য বিশ্বব্যাপিনী, কয়েকজন বর্ব্বরে তাহার ধ্বংস করিল। ইহার কারণ কি? পূর্ব্বার্জ্জিত উৎকর্ষ, কৌশল, কৃত্রিমবল সকলই ত ছিল, কিন্তু সে সকল ব্যবহার করিবার লোক ছিল না, পূর্ব্বের ইচ্ছা বিগত হইয়াছে, উৎকর্ষতার মূলভাগ বিলাস এখন সর্ব্বস্বধন, সুতরাং অধঃপতন রাখে কে?

বিজ্ঞানোদ্ভব কৃত্রিমবলের পূর্ব্বে মল্লযুদ্ধ বহুপরিমাণে রণস্থলে অভিনীত হইত। কিন্তু সে দিন ইহকালের মত চলিয়া গিয়াছে। ভারতে মল্লক্রিয়া এখনও প্রচুর আছে, এত আছে যে পৃথিবী হইতে যদি আজি বিজ্ঞান উঠিয়া যায়, তবে কালি আবার ভারত জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান জাতীয় পদবীতে পদার্পণ করে। সেদিন একটি মল্ল যুদ্ধ দেখিলাম, তাহাদের অঙ্গচালনা এবং মল্লক্রিয়া অবশ্যই অপূর্ব্ব, কিন্তু এ মল্লযুদ্ধ এখন আমোদ স্থলীয়। যাহাতে আগে দেশ রক্ষা হইত, যাহাতে আগে জাতীয় ভাগ্য নিরাকৃত হইত, এখন তাহা সাধারণের চিত্তবিনোদনের উপায়। মানসিক উৎকর্ষতা এবং বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এযুগের অধিনায়ক। ভারত সন্তান! শরীর মন সুস্থ রাখিয়া তাঁহার উপাসনা কর, অভীষ্ট লাভ হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাটক পরিচ্ছেদ।

মহাকাব্য প্রভৃতি কেবল শ্রবণ করা যায়, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে শ্রাব্যকাব্য বলে। শ্রাব্যকাব্যের ন্যায়, নাটকের শ্রবণ হয়, অধিকন্তু রঙ্গভূমিতে নট দ্বারা অভিনয়কালে দর্শনও হইয়া থাকে; এবং ইহাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত নাটকের নাম দৃশ্য কাব্য। প্রত্যেক নাটকের প্রারম্ভে সূত্রধার অর্থাৎ প্রধান নট স্বীয় পত্নী অথবা অন্য দুই এক সহচরের সহিত রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রসঙ্গক্রমে নাটকীয় ইতিবৃত্ত অবতীর্ণ করিয়া দেয়। যে যে স্থলে ইতিবৃত্তের স্থূল স্থূল অংশের একপ্রকার শেষ হয়, সেই সেইস্থলে পরিচ্ছেদ কল্পিত হইয়া থাকে। ঐ পরিচ্ছেদের নাম অঙ্ক।

নাটকে এক অবধি দশ পর্য্যন্ত অঙ্ক সংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। নাটক আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক থাকে। আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত একরূপ রচনা দেখা যায় না। ব্যক্তিবিশেষের বক্তব্যভেদে রচনা বিভিন্ন হইয়া থাকে। রাজা, মন্ত্রী, ঋষি, পণ্ডিত, ও নায়ক প্রভৃতি প্রধান পুরুষেরা সচরাচর উত্তম ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকেন। সামান্য স্ত্রী, বালক ও সাধারণ জনগণ গ্রাম্যভাষায় কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকেন। অভিজ্ঞ মহিলাগণ উত্তম ভাষায় আলাপ করেন।

অভিনয় বা রূপক।

কোন বস্তু বা কোন ব্যক্তিবিশেষের অবস্থাদির অনুকরণকে অভিনয় বা রূপক কহা যায়।

অভিনয়াদিতে অন্যের রূপাদির অনুকরণই প্রধান বিষয়, এই হেতু নাটকাদি দৃশ্য কাব্যের নাম রূপক।

অভিনয় চারি প্রকার। আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্বিক।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা রূপককে (অভিনেয় কাব্যকে) দশভাগে বিভক্ত করেন। বঙ্গভাষায় তিনটী মাত্র বিভাগ দেখা যায়। নাটক, প্রহসন ও মাস্ক।

অঙ্কের লক্ষণ।

নাটকের প্রত্যেক পরিচ্ছেদ বা সর্গের নাম অঙ্ক। যে অঙ্কে যাহার প্রসঙ্গ থাকে তাহা প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান করা উচিত। নাটকে কূটার্থ বা অপ্রসিদ্ধ শব্দ ব্যবহার হয় না। অনাবশ্যক কার্য্যের সংশ্রব মাত্রও থাকে না। আবশ্যকীয় বিষয়ের চমৎকারিত্ব থাকিলে বর্ণন বিবিধপ্রকারে বর্ণিত হইতে পারে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে নিন্দনীয় বিষয় নাটকে বর্ণনযোগ্য বলিয়াই কথিত হয় না। কিন্তু বঙ্গভাষায় নাটকে অনেকে সকল শাসন স্বীকার করেন না।

অঙ্গভঙ্গী দ্বারা অবস্থার অনুকরণের নাম আঙ্গিক অভিনয়। বাক্যভঙ্গী দ্বারা অন্যের স্বর ও কথার অনুকরণের নাম

বাচিক, বেশ ভূষাদি দ্বারা অন্যের সাদৃশ্য অনুকরণের নাম বহুরূপী ও স্তম্ভ স্বেদাদি সত্ত্বগুণসম্ভূত অভিনয়ের নাম সাত্ত্বিক অভিনয় কহা যায়।

নাটকের নায়ক ও নায়িকা ধীরোদাত্ত ধীরোদ্ধত ধীরললিত ও ধীরপ্রশান্ত এই চারিপ্রকারের যে কোন একপ্রকারের হইতে পারে। আদ্য অথবা বীররস নায়ক অথবা নায়িকার প্রধান আশ্রয়। আনুষঙ্গিক অন্যান্য রসেরও উদ্বোধ ও অপগম হইতে পারে। কিন্তু পরিণামে কোন কার্য্যব্যপদেশে অদ্ভুত রসের আবির্ভাব দ্বারা অভিনয় সমাপন করিতে পারিলে নাটকের চমৎকারিত্ব জন্মে।

এক অঙ্কের মধ্যে প্রসঙ্গতঃ অন্য বিষয় বর্ণন করিতে হইলে গর্ভাঙ্করূপে পৃথক্ সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদ কল্পনা করিতে হয়।

নাটকে কোন বিষয় অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণন যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্ক অপেক্ষা পরবর্ত্তী অঙ্কগুলি ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত।

বাঙ্গালা নাটকে পূর্ব্বরঙ্গাদি নাই। কোন কোন সংস্কৃতানুযায়ী নাটকে উহা আছে। তদনুসারে পূর্ব্বরঙ্গাদির স্থূল স্থূল বিষয়গুলি সামান্যতঃ বলা গেল।

পূর্ব্বরঙ্গ।

রঙ্গভঙ্গী (রঙ্গ তামাসা) দেখাইবার পূর্ব্বে নট বা নটী যে মঙ্গলাচরণ (গৌর চন্দ্রিকা) করে, তাহার নাম পূর্ব্বরঙ্গ।

নান্দী।

পূর্ব্বরঙ্গের পর নট বা নটী স্বস্তিবাচনে অথবা দেবাদির স্তুতিগানে অলঙ্কৃত যে মঙ্গলাচরণ করে তাহার নাম নান্দী। কোন কোন নাটকে কেবল পূর্ব্বরঙ্গ থাকে, কোন টীতে দুইটিই দেখা যায়। *

নান্দীর উদাহরণ।

শিশুশশী শোভে ভালে, বপু বিভূষিত কালে
গলে কালকূটের কালিমা।
রজত ভূধর শোভা, ভক্তজন মনোলোভা,
এরূপের দিতে নাহি সীমা॥
বাম উরুপরে বসি, অকলঙ্ক উমাশশী,
পুলকে প্রফুল্ল কলেবর।
নিতান্ত কিঙ্কর জনে, কৃপাবিন্দু বিতরণে,
ত্রাণ কর ওহে গঙ্গাধর॥
কুলময়ী কুলারাধ্যা, কুলভক্তজনবাধ্যা,
জগদাদ্যা কুলকুণ্ডলিনী।
অমূল কল্পিত কুল, সমূলে করি নির্ম্মূল,
সত্যকুল বুদ্ধি বিধায়িনী॥
কুলকাণ্ডে মনোমত, নিদ্রা যাও আর কত,
জাগো মা গো জগৎ সংসারে।
তোমা বিনা গতি নাই, কুলকাণ্ডে ডাকি তাই
পড়ে আমি অকূল পাথারে॥

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব।

নান্দীর পরেই সূত্রধারের কথা প্রসঙ্গে স্থাপয়িতা আসিয়া নাটকীয় ইতিবৃত্ত এক প্রকার অবতারণা করিয়া দেন।

প্রস্তাবনা।

নটী, বিদূষক, অথবা পারিপার্শ্বিক যথায় সূত্রধারের সহিত মিলিত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত বিষয়ের কথোপকথন করে তথায়ই প্রস্তাবনা কহা যায়। সূত্রধারের সহচরের নাম পারিপার্শ্বিক।

প্রস্তাবনা পাঁচ প্রকার। যথা—উদ্ঘাত্যক, কথোদ্ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্ত্তক ও অবলগিত।

উদ্ঘাত্যক।

যেখানে ব্যক্তিবিশেষের কথার অভিধেয়কে অপরবিধ অভিপ্রায় গ্রহণপূর্ব্বক রঙ্গভূমিতে পাত্রপ্রবিষ্ট হয় তথায় উদ্ঘাত্যক প্রস্তাবনা কহা যায়।

মুদ্রা রাক্ষস—"প্রিয়ে সেই দুরাত্মা ক্রূরগ্রহ সম্পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রকে বলপূর্ব্বক অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে।"

সূত্রধারের এই অর্দ্ধোক্তি মাত্র শুনিয়া নেপথ্য হইতে চাণক্য কহিলেন,

"আঃ আমি জীবিত থাকিতে ক্রূর আগ্রহবিশিষ্ট কোন্ দুরাত্মা সার্ব্বভৌম চন্দ্রগুপ্তকে অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে।"

এখানে অন্য ব্যক্তির প্রক্রান্তবিষয়ের অর্দ্ধোক্তির অভিধেয় তাৎপর্য্যবশতঃ অর্থান্তরে পরিণত করিয়া পাত্রপ্রবেশ হইয়াছে, এনিমিত্ত এইখানে উদ্ঘাত্যক কহা যায়।

কথোদ্ঘাত।

সূত্রধারের কথা শুনিয়া অথবা তদীয় কথার তাৎপর্য্য অবধারণপূর্ব্বক পাত্র প্রবিষ্ট হইলে কথোদ্ঘাত নামে প্রস্তাবনা কহা যায়। যথা রত্নাবলীতে—

"বিধাতা যদি অনুকূল হন তবে কি দ্বীপান্তরিত কি সাগরের প্রান্তস্থিত অথবা কি দিগন্তরগত প্রিয় বস্তু তাহার সহিত অনায়াসেই মিলন হইতে পারে। তদ্বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধকতা জন্মে না।"

সূত্রধারের এই বাক্য শুনিয়া নেপথ্য হইতে যৌগন্ধরায়ণ সূত্রধারের বাক্যের সাধুবাদ দিয়া কহিলেন,

"সকলি সত্য! নতুবা দেখ কোথায় বা সিংহলেশ্বরের দুহিতা কোথায় বা তাহার যানভঙ্গ এবং কোথায় বা তাহার কৌশাম্বীয়দিগের সহিত মিলন এবং এখানে আনয়ন ইত্যাদি।"

বেণীসংহারেও দেখ।

"পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত আনন্দলাভ করুন। যেহেতু শত্রুদমন দ্বারা এক্ষণে তাঁহাদিগের বৈরনির্যাতনরূপ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। এবং যাঁহাদিগের রুধিরে পৃথিবী প্লাবিত হইয়াছে সেই ক্ষত বিক্ষত শরীর কৌরবগণও সভৃত্য সুস্থ হউন।"

সূত্রধারের এই বাক্য পাঠ করিয়া নেপথ্য হইতে ভীমসেন কহিলেন,

"রে পাপিষ্ঠ দুরাত্মন্ আর তোর বৃথা মাঙ্গলপাঠের আবশ্যকতা নাই। এখনও আমি ভীমসেন জীবিত থাকিতে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ সুস্থ থাকিবে?"

এই কথা বলিয়া সূত্রধার প্রস্থান করিলে ভীমসেনের প্রবেশ সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগাতিশয়।

যেখানে এরূপ প্রয়োগে অপরবিধ প্রয়োগের অবতারণা অনুসারে পাত্র প্রবেশ সুসম্পন্ন হয় তথায় প্রয়োগাতিশয় কহা যায়। যথা—

যথা কুন্দমালা নাটকে

নেপথ্যে—"আর্য্যা এইস্থানে আগমন করিতে পারেন।"

সূত্রধার এই কথা শুনিয়া কহিল,

"এ আবার কোন্ ব্যক্তি আর্য্যাকে আহ্বান করিয়া আমার সহায়তা করিতেছেন।"

চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া

"আঃ কি কষ্ট কি কষ্ট! সীতাদেবী অনেকদিন লঙ্কেশ্বর ভবনে বাস করিয়াছিলেন এই লোকাপবাদ ভয়াকুল রামকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিতা জনকনন্দিনীকে লক্ষ্মণ নিতান্ত গর্ভমন্থরা জানিয়াও জনপদ হইতে বনগমন জন্য এই যে আনয়ন করিতেছেন।"

এখানে সূত্রধারের নৃত্যপ্রয়োগ বিষয়ে স্বীয় ভার্য্যার আহ্বানের ইচ্ছাটী লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সীতাদেবীর বনগমনাহ্বানরূপ প্রয়োগ বিশেষ সূচনা করিয়া আপন প্রয়োগের আতিশয্য সম্পাদন করিল।

প্রবর্ত্তক।

যেখানে বর্ত্তমানকাল আশ্রয়পূর্ব্বক সূত্রধার পাত্রপ্রবেশ সম্পন্ন করিয়া দেয় তথায় প্রবর্ত্তক কহে। অধিকাংশ নাটকেই এইরূপ প্রস্তাবনা দেখা যায়।

অবলপিত।

যেখানে সদৃশ কার্য্য বা সদৃশ বস্তুর কথন বা স্মৃতিহেতু পাত্র প্রবিষ্ট হয় তথায় অবলপিত প্রস্তাবনা কহা যায়। যথা—শকুন্তলায়

"রাজা দুষ্মন্ত যে প্রকার বেগবান্ মৃগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন আমি সেই প্রকার তোমার গীতবাগে বিমোহিত হইয়া সমাক্রান্ত হইয়াছি।"

এই কথা শ্রবণ দ্বারাই দুষ্মন্তের প্রবেশ সম্পন্ন হয়।

সর্ব্বপ্রকার প্রস্তাবনাতেই সূত্রধার প্রস্তাবনা সম্পাদন করিয়াই রঙ্গভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

প্রহসন—হাস্যরসোদ্দীপক নাটককে প্রহসন কহা যায়।

নাটকাত্মক আখ্যায়িকা—নভেলে প্রস্তাবনা, নান্দী, পূর্ব্বরঙ্গ, বিদূষক, নট, নটী প্রভৃতি নাম নাই। প্রসঙ্গতঃ যাহার আবশ্যক তাহার নামই স্পষ্টরূপে লেখা থাকে।

কোন কোন নাটকে যেমন গ্রন্থকারের নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক সভার ও দেশের বিষয়াদি বর্ণিত থাকে ইহাতে গ্রন্থকারের নাম না থাকুক কিন্তু সেইপ্রকার বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে তাৎকালিক ইতিবৃত্ত ও সমাজাদির বিবরণ ও আচার ব্যবহারাদির কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত হয়।

নাটক ও নাটকাত্মক আখ্যায়িকার ভাষা।

ভদ্র লোকের কথাবার্ত্তা ভদ্ররীতিতে ও সাধুভাষায় সম্পন্ন হয়। গ্রাম্য লোকের ভাষা সামান্য ও চলিত কথাবার্ত্তায় হইয়া থাকে।

বিদূষক প্রায় আমোদ প্রমোদ প্রিয় ও ভোজনপটুরূপে বর্ণিত হয়।

সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকেরা নীচ পদবীস্থ ও দাসীদিগের প্রতি ওলো হাঁালো ওরে প্রভৃতি বাক্যে সম্বোধন করিয়া থাকেন।

সম্মানযোগ্য স্ত্রীজনদিগকে লোকে দেবী বলিয়া সম্বোধন করেন।

সমযোগ্যা কামিনী গণের মধ্যে পরস্পর সখী বা প্রিয়সখী বলা রীতি।

কথাবর্ত্তা

স্বগত—অন্যের অগোচরে আপনি একাকী প্রকাশ্যে যে কথা কহে তাহার নাম স্বগত।

জনান্তিক—একজনের অন্তরালে অপর ব্যক্তির সহিত কথোপকথনের নাম জনান্তিক।

আকাশবাণী—দেববাণী অর্থাৎ যে কথা অপর ব্যক্তি শুনিতে পায় না কিন্তু যাহার উদ্দেশে কথিত হয় সে ব্যক্তি শুনিতে পায়।

বাঙ্গালার পূর্ব্ব কথা।

উপক্রমণিকা।

বাঙ্গালা অধঃপাতে গিয়াছে, এ কথায় সকলে বিশ্বাস করুন বা না করুন, আমরা বিশ্বাস করি এবং এক গলা গঙ্গাজলে দণ্ডায়মান হইয়া শপথ করিয়া তাহা বলিতে পারি। বাঙ্গালার যে কোন আশাই একেবারে নাই, এরূপ কঠোর কথা আমরা হৃদয়ে স্থানদান করিতে পারি না; অথচ নবযুবকগণের যেরূপ রীতি নীতি হইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালার যে কিছু ভরসা আছে, এমন কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তবে একেবারে হতাশও নহি।

কিঞ্চিৎ আশা আছে বলিয়াই, বাঙ্গালার দুর্দ্দশার কারণানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি হয়। যখন স্বয়ং শতপীড়নে পীড়িত হইয়া, এবং শত সহস্র স্বদেশীয়কে নিষ্পেষিত দেখিয়া মনে হয়, যে "এযন্ত্রণা আর কতকাল ভুগিতে হইবে? কি প্রায়শ্চিত্ত করিলে এ নরক হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিব?" তখনই সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, "কতকাল এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি? এবং না জানি কত পাপই করিয়াছি?"

পাপের স্বরূপ নির্ব্বিশেষ উপলব্ধি করিতে না পারিলে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। প্রথমে জানিতে হইবে, বাঙ্গালা কি কি পাপ করিয়াছে, তবে ইহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

সংসারের নিয়মই এই, আপনার জন্য আপনাকে ভুগিতে হয়, আর পরের জন্য আপনাকে ভুগিতে হয়। জাতিসাধারণের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। কোন এক জাতির শুভাশুভ যে কেবল সেই জাতির চরিত্রের উপর নির্ভর করে এমন নহে,